বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারাত

(আহকাম-আরকান সহ হজ ভ্রমণের অপরিহার্য্য গ্রন্থ)

এস. এম. আখতার হোসেন এম. এ.

প্রাপ্তিস্থান
বাণী মনযিল/বাণী প্রকাশ
এ ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদিনা শরীফ যিয়ারাত

পূর্বাভাষ

ইসলামের গুরুত্ব, প্রসার এবং অধুনা সৌদি আরব ও তার সমাজ সভ্যতা

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আরব উপদ্বীপের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রবর্তিত ও অনুশাসিত নীতিই হল ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীর যে ভূভাগে ও যে প্রেক্ষিতে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই ভূভাগ সম্পর্কে এই বইএর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন আল্লাহর দূত ও নবী তেমনি আবার অন্য সব মানুষের মতই একজন রক্তমাংসের মানুষ। পবিত্র কোরআনেই বলা হয়েছে যে "বল হে মোহাম্মাদ! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।" এই মানুষ মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম শুধু ধর্মীয় রূপ রেখায় সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সামাজিক বিধি বিধান কর্মপদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবের বিস্তৃতিই বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও যদি এই বৈপ্লবিক নীতিসমূহের বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করা যায় দেখা যাবে এই নীতিসমূহ স্বীয় বৈশিষ্ট্যেই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া যে কেউ নিরপেক্ষ বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃত বৈপ্লবিক নীতির উৎকর্ষ দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

এক সময় সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্মীয় দর্শন ছাড়াও মানবীয় নীতিগুলির দ্বারাই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়ে নিজের জায়গা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই ইসলাম বলতে কেবল মাত্র তার ধর্মীয় দর্শনকেই কল্পনা করে সংকীর্ণ জালে জড়িয়ে যান। ফলে ইসলামের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আর বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতায় ডুবে যান। তাঁদের এই অজ্ঞতা হাস্যকর বলে মনে হয়।

সেই যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত দুটি দেশ রোম এবং সিরিয়া মুষ্টিমেয় একদল আরব বেদুঈনের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করে পরাজয় বরণে বাধ্য হয় শুধু তার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলেই। মাত্র পঞ্চাশ

বছরে সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে মানুষ মোহাম্মাদ (সাঃ) এর মানবিক আবেদন আর শান্তির বাণী দ্বারাই ভারতের সীমানা থেকে অতলান্তিক সাগর পার পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী বিপ্লব সাফল্যলাভ করে চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছ'শ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমিরুল মুমেনিনগণ পৃথিবীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। অগাষ্টাসের রোম আর আলেকজাণ্ডারের রাজ্যও সে তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। যে পারস্য সাম্রাজ্য রোমের বিরুদ্ধে হাজার বছর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েও টিকে ছিল সেই বিশাল সাম্রাজ্য মাত্র দশ বছরে ইসলামের বৈপ্লবিক নীতির কাছে পরাভূত হয়ে নিজ অস্তিত্ব মুছে ফেলতে বাধ্য হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ইসলামী রাষ্ট্রে তখনও কোন সুগঠিত সেনাবাহিনীর অস্তিত্বের সন্ধান পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেননি। এইভাবে মাত্র ক'বছরেই আমিরুল মুমেনিনগণ শুধুমাত্র চরিত্রমাধুর্য আল্লাহভীরুতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভরশীল হয়েই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিতে পরিণত হন। পারস্য, সিরিয়া, মিশর তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ সহ ভারতের কিছু অংশও তাঁদের অধিকারে আসে। সারা পৃথিবী ব্যাপী একের পর এক দেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হতে থাকে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশের নাগরিকই ইসলামী বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের ইসলামী দর্শনের নিকট সমর্পণ করেন। এইভাবে অষ্টম শতাব্দী শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলমানগণ আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়ার বন্দর দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিতে অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

কিভাবে এত অল্প সময়ে ইসলামী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব দেশের পর দেশে বিস্তার লাভ করল তার সন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণও বিস্মিত হয়েছেন। বর্তমান যুগের বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিতগণ ইসলামের শুরু থেকে এর বিজয় শান্ত ও সহিষ্ণু জনসাধারণের উপর গোঁড়ামির জয় এই অজ্ঞ ও ঘৃণিত অভিমত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইসলামের জন্মভূমি আরবভূমিও একসময়ে এসে নানান দুর্নীতিতে কলুষিত হচ্ছিল। সে বিষয়ে বইয়েব মধ্যে বহু স্থানেই আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু আরবভূমির উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে যে অবস্থায় পৌঁছেছে এখানে তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়াই আমার এই অবতরণিকার উদ্দেশ্য।

ইসলামের বিস্তৃতি

মহানবীর জীবদ্দশায় মদিনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর হযরত আবুবকর থেকে হযরত আলী পর্যন্ত সকল খলিফার সময় কালে মদিনা ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্র। দুর্বার গতিতে ইসলামের বৈপ্লবিক প্রসার ঘটল ইরাক, ইরান, সিরিয়া, জেরুজালেম, মিশর, পারস্য, স্পেন সর্বত্র। হযরত ওমরের সময় বাইশ লক্ষ একাত্তর হাজার ত্রিশলক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ড আরব খলিফাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর হযরত ওসমানের সময় আফগানিস্থান ও আফ্রিকার ত্রিপোলি পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত হয়। তখনও ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় দফতর তথা রাজধানী মদিনা। এই চারজন খলিফা ৩২ বছর রাজত্ব করেন। এরপর উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণ একশত বছর রাজত্ব করেন। তখন রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দামেস্ক শহরে। এঁদের সময়ে মরক্কো, আলজিরিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্সেও ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ পৌঁছায় এবং সিসিলি, সাইরাকিউজ ও সাইপ্রাসও আরব সাম্রাজ্যের অধীনে আসে এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে জনজীবনে নেমে আসে শান্তি ও সমৃদ্ধি। এই সময়ে ভারতের সিন্ধু প্রদেশেও আরব প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

এরপর আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রায় পাঁচশত বছর ইসলামী সাম্রাজ্য শাসন করেন। আব্বাসীয়গণের সময় সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাগদাদ। এই সময় এশিয়ার চেঙ্গিস হালাকুর বংশধরগণও ইসলাম গ্রহণ করেন। তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ গড়ে তোলেন। এঁরা ইউরোপের বলকান অঞ্চলও মুসলিম অধিকারে নিয়ে আসেন। তুরস্কেও ওসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে তিনটি মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়ে যায়।

আরব দেশ চিরস্বাধীন দেশ। স্বাধীনতাপ্রিয়তা অতিথিপরায়ণতা ও কাব্যপ্রিয়তা এদেশের নাগরিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে আরব দেশ বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। ১৯ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এডেনে ব্রিটেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এডেন ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়েছে। তবুও সকল যুগেই হজকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মুসলমান জনগণের বাৎসরিক মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে মক্কা শহর ও আরাফা প্রান্তর।

অধুনা সৌদি আরব

দীর্ঘ শাসনকালে পরবর্তী আমিরুল মুমেনিন তথা খলিফাগণ ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগের বৈপ্লবিক নীতিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে অসচেতন হয়ে পড়েন। ফলে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সর্বত্রই শিথিলতা আসতে থাকে। কালক্রমে খলিফা তথা আমিরুল মুমেনিনগণ রাজবংশে রূপান্তরিত হয়ে চরম বিলাসবহুল জীবন, শোষণ ও অনাচারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। যে সমাজ একদিন ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছত্রছায়ায় কলুষমুক্ত হয়েছিল তা আবার নানা অনাচারে ভরে উঠতে থাকে। শরীয়ত বিরোধী বহু কাজকর্ম ধর্মীয় বিধানে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। হযরত মোহাম্মাদ (সা·)-এর সময় থেকে চার খলিফার সময়কাল পর্যন্ত যে বিশুদ্ধ ইসলামী দর্শন, আচার আচরণ ছিল তা নানাভাবে বিঘ্নিত হতে শুরু করে। তেরো শতকের শেষ ভাগ থেকে চৌদ্দ শতকের প্রথম ভাগে ইমাম আবু হাম্বল-এর বিশুদ্ধ নীতির সমর্থক ইরান, তাইমিয়া ইসলামী শরীয়তে অনুপ্রবেশকারী বেদআত কাজ সমূহ উচ্ছেদের জন্য কঠোর সংগ্রাম শুরু করলেন। ফলে হাদিস কোরআন নির্দেশিত আদর্শ দ্বারা আরব ভূ-ভাগের সর্বত্রই এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম বিস্তার লাভ করে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আরবের ডাইনা অঞ্চলের তামিম গোত্রের বনু লেনান বংশের মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব আন্দোলন ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সামাজিক অনাচার অবিচারের মূলোচ্ছেদ করে ধর্মীয় আচার আচরণে অনুপ্রবিষ্ট সমস্ত রকম বেদআত উচ্ছেদই এই সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকে সমগ্র আরবে আরবী জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌র সময়ের অনুকরণে আব্দল ওহাব সবরকম অনাচার ও পৌত্তলিকতার প্রভাবমুক্ত ধর্মীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে খাঁটি তৌহিদবাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হন। ইনি গ্রীকদর্শন ও সুফীতত্ত্বেরও উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

তাঁর সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় শাসক তাঁকে বহিষ্কার করলেন। তিনি সপরিবারে দারিয়াপল্লীতে বসবাস শুরু করেন। দারিয়ার আমীর ইবনে সউদ তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে স্বাগত জানান। ক্রমশঃ এই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ১৭৪৭ সালে রিয়াদের শেখের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষ দীর্ঘদিন চলতে থাকে।

ইবনে সউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজও পিতার পথ অনুসরণ করেন এবং রিয়াদ অধিকার করেন। এবার আব্দুল ওহাব মক্কাশরীফের সমর্থন লাভ করেন। ফলে সমগ্র আরব বেদুইন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের পতাকাতলে হাজির হন। এইভাবে সমগ্র নেজদ ভূখণ্ডই আব্দুল আজীজের দখলে চলে আসে। এই সময় মক্কা শহর সহ সমগ্র আরবভূমি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সৌদি বাহিনী ১৮০৪ সালে মদিনা এবং ১৮০৬ সালে জেদ্দা তুর্কীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। মাত্র ক'বছরেই সমগ্র আরব ভূখণ্ডই সৌদি বাহিনীর দখলে যায়। ইতিমধ্যে ওহাবীগণ কারবালা দখল করার পর মক্কা, মদিনার মসজিদের মিনারগুলো ভেঙ্গে ফেলে। ফলে সমগ্র মুসলমান জগৎ ওহাবীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ১৮১২-২৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের সাহায্যে মিশরীয় বাহিনী মক্কা মদিনা দখল করে নেয়। সউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে বন্দী করে তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ওবাহীগণ সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও তাঁদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তা নির্বাপিত হয়নি। ১৯০৪ সালে আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুর রহমান পুনরায় সমগ্র নেজদ পুনঃ দখল করেন। এই আব্দুল আজিজই ১৯২৪ সালে মক্কা, পরের বছর মদিনা ও জেদ্দা অধিকার করে সৌদী আরব নামে আরবী জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। একটি বিষয় স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে ওহাবী বলে কোন ইসলামী মজহাব বা তরীকা নেই। ভারতীয় উপ-মহাদেশের আলেম সম্প্রদায়ই এই সংস্কার আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন আখ্যা দেন। ইমাম হাম্বলের নীতির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওহাব সাহেব নেতৃত্ব দান করেন তাই একে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়। ওহাব সাহেবের নিজস্ব কোন মতবাদ ছিল না। এই সংস্কার আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল ধর্ম কোন বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত নয়, পীর প্রথা বা পীরেদের কবরের কাছে প্রার্থনা, ফুল দেওয়া, ধূপ জ্বালানো, প্রদীপ জ্বালানো পৌত্তলিকতার নামান্তর সুতরাং নিষিদ্ধ। হাম্বেলীদের এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইবনে সউদ 'কবরপূজা' কঠোর হাতে দমন করেন।

বর্তমান সৌদী সরকারও ইমাম আবু হাম্বল-এর অনুসারী। তাই মক্কা ও মদিনা শরীফে হাম্বেলী প্রভাব দেখা যায়। জোরে 'আমীন' বলার রীতিও এজন্যই এখানে প্রচলিত।

আরবের বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা

আজও ইবনে সউদের বংশধরগণ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এদেশের মূল সংবিধান হলো কোরআন। তবে কোরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আইনও সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। বাদশাহর মন্ত্রীসভা ও পরামর্শদাতা সভাও আছে। বিভিন্ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও আছেন। বাদশাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও কোরআনের অনুশাসন মেনে চলতে তিনি বাধ্য। দেশে কোরআনের পরিপন্থী কোন আইন রচনা করার ক্ষমতা বাদশাহর নেই। তেমন কিছু করলে যে কোন নাগরিকেরই বাদশাহর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার ক্ষমতা আছে। নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই কিন্তু কোরআনের আইনের শাসনের মধ্যে জনমত পরিচালিত হয়। সমগ্র দেশে কোথাও মানুষের মনে ক্ষোভ নেই। জনগণ বাদশাহী শাসনাধীন আরবে সুখী, তাঁর মন্ত্রীসভার কর্মসূচীতে আস্থাশীল ও উন্নয়ন কর্মসূচীতে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। বিশ্বের সকল দেশেই এই সরকারের দূতাবাস আছে। সৌদী আরব বর্তমানে সুদৃঢ় অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌদী আরব উদারভাবে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশে আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রেখেছে। ইয়াসের আরাফাতের প্যালেষ্টিনীয় মুক্তিবাহিনীকে অব্যাহতভাবে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। সৌদী আরবের রাজতন্ত্র অন্যান্য দেশে প্রচলিত রাজতন্ত্র থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যধর্মী। ইসলামী শরীয়ত মানুষকে যে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে সৌদি রাজতন্ত্রের তা হরণ করার ক্ষমতা নেই।

দেশের জন সমাজ ঃ

বর্তমান সৌদী আরবেব জনসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী। অধিকাংশ মানুষই কৃষিনির্ভর। কিছু আছেন পশুপালক। বর্তমানে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশী। দুর্বার গতিতে উন্নয়নের কাজ চলছে সারা দেশে। পাহাড় কেটে একের পর এক শহর তৈরী হচ্ছে। ফ্লাইওভার ও টানেল করে সমগ্র দেশে রাস্তার যোগাযোগ তৈরী হচ্ছে। সর্বত্র টেলিফোন বুথ তৈরী হয়েছে। যে কেউ রাস্তার ধারের টেলিফোন বুথ থেকেই পৃথিবীর সব দেশে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। সুদূর গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মরুভূমির বুক চিরে পানি পৌঁছেছে দেশের সর্বত্র।

দেশে ধনী দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মানুষ আছে। শিক্ষিতের হার আজও যথেষ্ট কম। তবে আত্মোন্নতির প্রচণ্ড উন্মাদনা রয়েছে। প্রত্যেক গ্রামেই মাদ্রাসা (স্কুল) হয়েছে। শহরে সবরকম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছে। দেশে এখনও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। পৃথিবীর সব দেশের নাগরিককেই এখানে বসবাস করতে দেখা যায়। দেশের রাস্তাঘাট, অফিস, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত কর্মীগণ বেশীর ভাগই বাংলাদেশী। বহু বিদেশী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, রাজমিস্ত্রী এ দেশের উন্নয়নের কর্মসূচীতে যুক্ত। দেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রধান খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্পূর্ণ ফ্রি।

অর্থনীতি ঃ

বিশ্বের ধনশালী দেশগুলির তুলনায় সৌদি আরবের অর্থনীতি অনেক বেশী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তৈল সমৃদ্ধিই এর মূল কারণ। বর্তমান বিশ্বের মোট সঞ্চিত তেলের এক চতুর্থাংশ থেকে এত তৃতীয়াংশ ভাণ্ডারই সৌদি আরবের। সৌদি ট্রেজারিতে প্রতিদিন প্রায় দশ কোটি ডলার জমা হয়। বর্তমানে এদেশে বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণ ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বচ্ছল অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে সৌদি সরকার অসংখ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। বিদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও শহরগুলিকে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন করে তোলা হচ্ছে। দেশের মানুষ ক্রমশঃ বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। জেদ্দা সমুদ্র বন্দর এলাকায় দ্রুত শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে। এখানে শিল্প এলাকায় পৃথিবীর নামী দামী কোম্পানী কল কারখানা গড়ে তুলেছেন, মক্কা, মদিনা, মীনা প্রভৃতি তীর্থ ক্ষেত্রগুলিকেও সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত করা হয়েছে। মরুভূমির বুক চিরে পানির অফুরন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। তৈরী হয়েছে মলমূত্র ত্যাগের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা। দেশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক শহরকেই বিমানপথে যোগাযোগের উপযোগী করা হয়েছে। বর্তমানে আরবে এত বেশী গম উৎপন্ন হয় যে সারাদেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানী করতে পারে।

শিক্ষা ঃ

বর্তমান সরকার শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে বিশেষ যত্নবান। নারী-পুরুষের শিক্ষা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আরবের মেয়েরা মুখ, হাত খোলা বোরখা পরেন। শহরের জনবহুল রাস্তায়ও হেঁটে স্কুল কলেজ যাতায়াত করেন। ধনশালীগণ গাড়িতে যাতায়াত করেন। কোন বিদেশী ছাত্রকে এদেশের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম। প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় প্রয়োজন মেটায় সরকার। বইপত্র সরকারই বিনামূল্যে সরবরাহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে তাদের ভারতীয় টাকার অংকে প্রায় ১২০০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে প্রায় ১৬০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীর বেতন ফ্রি। ভারত, পাকিস্থান, ইউরোপ, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত।

আরবদেশের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন ছাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্জনে রত। রাজপরিবারের অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। পোশাকপরিচ্ছদ আচার আচরণে পাশ্চাত্ত্য ছাপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে সমাজেও এখন যথেষ্ট পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইসলাম প্রচারের যুগে দেখা যায় আরবীয়রা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও কঠোর পরিশ্রমী ছিল কিন্তু বর্তমান সময় আরবরা বেশ অলস ও বিলাসিতায় ভাসমান। আরবীয়রা অত্যধিক ধূমপায়ী। সৌখিন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে লম্বা নলের গড়গড়া হুঁকোর প্রচলন আছে। মক্কা মদিনায় কোন সিনেমাহল নেই। নাচগানের প্রচলন নেই। তবে বাড়িতে বসে টিভি, ভি, সি, আর ও ভিডিও দেখার প্রবণতা আছে। সমগ্র দেশে কোন ধর্মীয় কুসংস্কার নেই। বিয়েতে মোহরানার টাকা কন্যাকে অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে হয়। যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাকে শালীনতাসম্পন্ন পোশাকে স্কুল, কলেজ, হাটবাজারে দেখা যায়। অফিস, ব্যাঙ্ক, হাসপাতালেও যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা কর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু উত্তেজক কোন রকম পোশাকে সজ্জিত হলে কিংবা উন্মুক্ত মস্তকে পথে ঘাটে চলা ফেরা করলে সরকারী পুলিশই তাঁদের বন্দী করে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

সমগ্র আরবে এক বিবাহ প্রথাই প্রচলিত। কোন হেরেম প্রথা অর্থাৎ শয়ে শয়ে স্ত্রী রাখার যে গুজব প্রচলিত আছে—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও শত্রুদের রটনা ছাড়া কিছু নয়। এসব এখানে কঠিন আইনের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছে হলেই বিয়ে করা বা তালাক দেওয়ার প্রথা আরবে প্রচলিত নেই। এসব ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ইসলামী বিধি বিধান মানা বাধ্যতা মূলক। পরিচ্ছন্নতা আরবীয়দের জীবনের অঙ্গ। আতিথেয়তায় এঁরা অতুলনীয়। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ হলেই সালাম বিনিময়ের পর কুশল বিনিময়ও সামাজিক রীতি। প্রীতি বিনিময়ে চুম্বন প্রথাও প্রচলিত।

সমগ্র দেশে কঠিন আইনের শাসন প্রচলিত। যে কোন অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার ও বিষয় নিষ্পত্তি ঘটে। ওদেশে আজও নীচ থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সর্বত্রই কাজি বিচার পরিচালনা করেন। বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও ন্যায়ভিত্তিক। নির্দোষ মানুষ অব্যাহতি পান। ইসলামী বিধানের মর্যাদা এদেশে অনন্য। জনগণ সরকার, বাদশাহ সকলেই এ ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সজাগ। সমগ্র বিচার ব্যবস্থা কোরআনের নির্দেশকে ভিত্তি করে রচিত। ঘুষ দিয়ে শরীয়ত আইন লঙ্ঘন এদেশে সম্ভব নয়।

মদ, জুয়া, ব্যাভিচার, চুরি সৌদি আরবে নিষিদ্ধ। খুন ও ব্যাভিচারের শাস্তি মৃত্যু। এদেশে বিচার দীর্ঘদিন চলে না। সঙ্গে সঙ্গেই বিচার নিষ্পত্তি হয়। কোটি কোটি মামলা জমে থাকে না। ব্যাভিচার করলে প্রকাশ্য রাজপথে প্রাণদণ্ড দেওয়ার প্রথা আছে। আইনের দৃষ্টিতে সাধারণ নাগরিক ও বাদশাহ কারও কোন পার্থক্য নেই। মাত্র কবছর আগেই বাদশাহ খালেদের বড়ভাইপোর নাতনীকে ও তার পুরুষ সঙ্গীকে জেনার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আইনের এই কঠোরতার জন্য এ ধরনের অপরাধ কদাচিৎই ঘটে। চুরির ঘটনাও নেই বললেই চলে। যদিও বা কখনও তা ঘটে তা বিদেশীদের মধ্যে বিদেশীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। সারাদেশে ঘুরলে একজনও হাতকাটা চোরের দেখা পাওয়া মুশকিল। ওদেশে মনিহারি দ্রব্যের মত দোকানে সোনার অলংকার সাজানো থাকে। রাস্তায় গাড়ীর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোর ঘটনাও বিরল। গাড়ি এ্যাকসিডেণ্ট হলে মোটা টাকার জরিমানা দিতে হয়। তারপরও যাকে এ্যাকসিডেণ্ট করা হয়েছে তার কাছে অপরাধীর ক্ষমা ভিক্ষা ও ক্ষমা লাভ বাধ্যতামূলক। ইউ, এন, ও, ও ইউনেস্কোর

পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে কম অপরাধ সংঘটিত হয় সৌদি আরবে।

সৌদি আরবে বহিরাগতদের সহজে নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। কোন বিদেশী সেখানে আজীবন থাকলেও সম্পত্তির মালিক হতে পারে না।

সৌদি আরবে কোন পীরপ্রথা প্রচলিত নেই। মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয় না, নামাযে মোনাজাত হয় না। মসজিদে নাবাবী, মক্কা শরীফের মসজিদ সহ দেশের সব মসজিদে মহিলাগণ পুরুষদের সঙ্গে জামাতে নামায পড়ার অধিকারিণী। ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ পালনে এদেশের অধিবাসীগণ আন্তরিক যত্নবান। নামায, রোযা যাকাত পালন সম্পর্কে এঁরা অত্যন্ত শক্ত। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান রয়েছে। প্রত্যেকে ফরজ নামায আদায় করে। এদেশে টুপি দাড়ির বিশেষ প্রচলন নেই। তবে কারও কারও দাড়িও আছে। অনেকে বাদশাহর অনুকরণে একটু দাড়ি রাখেন। তাই বলে মুত্তাকী বা সুন্নতের অনুসারী লোক নেই তা নয়।

সৌদি ভূমিতে পৌঁছে প্রত্যেক হজ যাত্রীর মনে রাখা দরকার তিনি এখানে এসেছেন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদাত সম্পন্ন করতে। যে এবাদাতের মধ্যে সামাজিক, মানবিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা ও অভ্যাসই মূখ্য। বিশ্বাস আর বিবেকের অজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীন চিন্তার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে হজের মত একটি গুরুত্বপুর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব থেকেই সংগ্রহ করতে হবে নীতিনিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবেই হবে ইসলামের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হজের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। এইভাবে হজে মাবরুর অর্জনে এই গ্রন্থ সহায়ক হলে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। সুপরামর্শের জন্য যে কেউ সরাসরি নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগও করতে পারেন।

১৫ই মে ১৯৫৭

আখতার হোসেন

নারকেলডাঙ্গা গভঃ হাউসিং এষ্টেট
ব্লক—কে, ফ্ল্যাট—৭
৪৯নং নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা—১১

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوۡلِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیۡنَ

বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাতীর্থ হজ্জ

হজ্জ : (হাজ্জ) হজ আরবী শব্দ। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। ইসলামী শরীয়তের বিধানে —নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে পবিত্র কাআবা গৃহ প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করা, সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত পথটি সাতবার যাওয়া আসা করা, মীনায় যাওয়া ও অবস্থান করা, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা, মুজদালেফার মাঠে রাত্রি যাপন করা, জুমারায় কাঁকর নিক্ষেপ ও মীনায় কোরবাণী করা ইত্যাদি কাজগুলি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যেভাবে সম্পন্ন করেছেন সেভাবে করা হ'ল ইসলামী শরীয়তের বিধানে হজ।

ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। বোখারী ও মুসলেম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে—হযরত আবদুল্লাহ এবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন :

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন আরাধ্য (উপাস্য) নেই, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।

২। সালাত প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ ইসলামের বিধানমত দিনে পাঁচ বার এবং জুমআ ও দুই ঈদের সালাত (নামায) পড়া।

৩। যাকাত প্রদান করা অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট হারে সম্পদকর দরিদ্রদের প্রদান করা।

৪। রমজান মাসে রোজা পালন করা অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিধানমত রমজান মাসে উপবাস ব্রত পালন করা।

৫। পবিত্র কাআবা ঘরে হজ করা।

ইসলাম ধর্মের এই পাঁচটি বিধানের তিনটি আপামর মুসলিম জনসাধারণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং শেষের দুটি কেবলমাত্র সমর্থ ও আর্থিক সংগতিসম্পন্ন লোকের জন্য সুনির্দিষ্ট পালনীয় কর্তব্য। হজ ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ।

হজ মুসলমানের জীবনের শ্রেষ্ঠ আরাধনা ও আমল বা সৎকার্যাভ্যাসের শেষ ধাপ। এটিই ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা ও শক্তিশালী ভিত্তি। পবিত্র কোরআনের সুরা আল মায়দার তৃতীয় আয়াতের মধ্যে হজের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন: "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (দ্বীন) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) মনোনীত করলাম।" (৫ : ৩)

সকল প্রশংসা বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলার যিনি একত্ববাদের অঙ্গীকারকে তাঁর দাসদের (বান্দাদের) জন্য দুর্গ ও সতর্কতামূলক ঘাঁটিস্বরূপ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আদিম গৃহ পবিত্র কাআবাকে বিশ্বমানবমণ্ডলীর জন্য আশ্রয় ও নিরাপদস্থল করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর গৃহ কাআবা দর্শন ও প্রদক্ষিণ করাকে মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ প্রাপ্তিরূপে নির্দ্ধারণ করেছেন। এর দ্বারা মানবের পাপমোচনের এক সর্বোচ্চ সম্মানীয় ব্যবস্থা করেছেন। পরকালে মানবাত্মার শাস্তির সর্ববৃহৎ প্রতিবন্ধক হিসাবে নির্দ্ধারণ করেছেন পবিত্র কাআবা ঘর অবলোকন ও প্রদক্ষিণকে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন: "আমার ইচ্ছা হয় যে কিছু লোককে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে পাঠাই, এবং তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখুন ঐ সব লোকেদের যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করে না, তাঁরা তাদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিন। কারণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাঁরা আল্লাহ্‌র ঘরের হজ করে না, তাঁরা মুসলমান নয়, কিছুতেই মুসলমান নয়।—(মোহাদ্দেস সাইদ ইবনে মনসুর)।

ইসলাম ধর্মের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি হজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ থেকে বিরত থাকল সে ইহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে মারা গেলেও কিছু যায় আসে না।"

ইসলাম ধর্মের মহান কর্ণধার হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন হজ

ফরজ বা অবশ্যপালনীয় হলে তোমরা তা পালনের জন্য তাড়াতাড়ি কর কারণ তোমরা জান না যে কার ভাগ্যে কি আছে!" তিনি আরও বলেছেন:

"হে মানব সমাজ! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ বা অবশ্য পালনীয় করেছেন, তোমরা হজ্জ পালন কর।"— মুসলেম শরীফ।

পবিত্র কোরআনের সুরা আল ইমরানের ৯৭ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

"ওতে অনেক সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যেমন ইব্রাহিমের দাঁড়ানর স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ জগতের উপর নির্ভরশীল নন।" আল্লাহ্ তাআলা আরও নির্দেশ দিয়েছেন "মানুষের মধ্যে হজ্জ ঘোষণা করে দাও ওরা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে বা দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, ওরা আসবে দূর দুরান্ত পথ অতিক্রম করে। (কোরআন ৩২ : ২৭)

আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর কাআবা ঘরের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে আদেশ করলেন:

"আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র রেখো যারা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে, এবং সালাতে (নামাজে) দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে।" (কোরআন ২২ : ২৬)

হজ্জের উদ্দেশ্য ঃ ক্ষণস্থায়ী মোহময় জীবনের যাবতীয় পার্থিব ভোগ বিলাস, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, আভিজাত্য গৌরব, পদমর্যাদার গর্ব বিসর্জন দিয়ে, গৃহসম্পদ, স্ত্রীপুত্র-কন্যা আত্মীয় পরিজনের যাবতীয় মায়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করে হৃদয়ের যাবতীয় কলুষ কালিমা ধুয়ে মুছে নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নির্মল মুক্ত মন নিয়ে পবিত্র কোরআনের বিধান মত বিশ্বস্রষ্টার স্বাধীন গৃহের পবিত্রতাকে হৃদয়ে সদাজাগরুক রেখে, শরীয়তের নির্দেশকে অমোঘ জেনে মানবতার আধারে হৃদয় ভরে নিয়ে একাগ্র চিত্তে হৃদয়ের মুক্তচিন্তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে আল্লাহ্র সমীপে হাজির হওয়াই এই পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ১৯৭ আয়াতে বলেছেন:
"হজ্জ হয় কয়েকটি সুপরিচিত মাসে; সে জন্য যে এই সময় হজ্জ করার সঙ্কল্প করে তার জন্য হজ্জকালে স্ত্রীসঙ্গ, গালাগালি আর ঝগড়া নিষিদ্ধ। আর যা ভালো তোমরা কর আল্লাহ্ তা জানেন। আর হজ্জের জন্য পাথেয় ব্যবস্থা

করো—নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে সীমা রক্ষা করা। আর হে জ্ঞানীগণ! (তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে) আল্লাহ্‌র প্রতি সাবধান হও।"

আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন:

"হজ্জ মাত্র একবার ফরজ। অতএব যদি কেউ একাধিক বার হজ্জ করে তবে তা নফল (অতিরিক্ত) হবে।

হজ্জ ফরজ বা অবশ্য পালনীয় হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে:

(১) বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, (২) মুসলমান হওয়া, (৩) জ্ঞানবান হওয়া (৪) স্বাধীন হওয়া এবং (৫) সক্ষম হওয়া ও সময়মত হজ্জ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জের সিদ্ধান্ত

পরম করুণাময় আল্লাহ্ কেবলমাত্র তাদের জন্য হজ্জ ফরজ (বাধ্যতামূলক পালনীয়) করেছেন, যাঁরা ধনী, বয়োপ্রাপ্ত, জ্ঞানী মুসলমান এবং দুর্গম পথে ভ্রমণে সক্ষম। করুণাময়, কৃপাময় আল্লাহ্ হজ্জ ফরজ হওয়ার মত সক্ষমতা যাঁদের দিয়েছেন তাঁরা ধন্য। মহিমাময় আল্লাহ্ তাঁর যে প্রিয় বান্দাকে এহেন নিয়ামত অর্জন করার ক্ষমতা দান করেছেন তিনি ইহ ও পরকালে মুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ারের অধিকারী হয়েছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতের নবম বছরের শেষ দিকে সঙ্গতি সম্পন্ন সক্ষম ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হয়েছিল। অসার পার্থিব সুখভোগ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী শান্তিলাভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই এবাদাতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানুষের যৌবনকালই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। কারও উপর হজ্জ ফরজ হলে তা পালনে তাড়াতাড়ি করার জন্য বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানে।

যে কারও উপর হজ্জ ফরজ হলে তাঁর তা পালনে তৎপর হওয়া একান্ত কর্তব্য। শরীর বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়ার আগেই জীবনের এই শ্রেষ্ঠ এবাদাত পালনের কাজ শেষ করা দরকার। হজ্জের সিদ্ধান্ত নিলেই আমাদের দেশ থেকে ইচ্ছেমত হজ্জে যাওয়া যায় না। হজ্জের মনস্থ করলে দুভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রথমতঃ হজ্জে যাওয়ার জন্য সরকারী অনুমোদন সংগ্রহ

করা। দ্বিতীয়তঃ হজের জন্য নিজেকে আল্লাহ্‌র পথে সমর্পণ করার অনুশীলন করা। আমি পর্যায়ক্রমে বিষয়টিকে দুভাগ করে আলোচনা করছি। (ক) প্রাথমিক করণীয় (খ) হজের অনুশীলন।

১. প্রাথমিক করণীয়

প্রয়োজনীয় অর্থের আয়োজনঃ ভারতীয় হজ্জ যাত্রীরা দুভাবে হজ্জ তীর্থে যেতে পারেন—(ক) সমুদ্র পথে ও (খ) বিমান পথে। জলজাহাজ কেবলমাত্র বোম্বাই-এর সামুদ্রিক বন্দর থেকে ছাড়ে। আর বিমান দিল্লীর পালাম এবং বোম্বাই সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর থেকে ছাড়ে।

জলজাহাজে ভ্রমণের ভাড়া বোম্বাই থেকে জেদ্দা যাতায়াত বাবদ প্রথম শ্রেণীতে সাত হাজার টাকার কাছাকাছি লাগে। বাঙ্ক শ্রেণীতে লাগে তিন হাজার টাকার মত। বিমানে বয়স্কদের দিল্লী-জেদ্দা যাতায়াত ভাড়া আট হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী এবং বোম্বাই-জেদ্দা যাতায়াত ভাড়া আট হাজার টাকার সামান্য কম। দুবছরের কম বয়সের শিশুদের বিমান ভাড়া লাগে দিল্লী থেকে আটশত টাকার সামান্য বেশী এবং বোম্বাই থেকে আটশত টাকার সামান্য কম। প্রতি বছরই ভাড়ার অল্পবিস্তর হেরফের হয় তাই সঠিক ভাড়া উল্লেখ করা হলো না। এছাড়া সৌদি আরবের খরচ বাবদ ভারত সরকার যে বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করেন তার জন্য ভারতীয় টাকার পরিমাণ ১০ হাজার টাকার সামান্য বেশী। এছাড়া বোম্বাই বা দিল্লী যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি আছে।

একজন বয়স্ক লোকের বর্তমানে হজ সমাধা করতে মোটামুটি যা খরচ হয় তা হলো : জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত ও বিদেশী মুদ্রাসহ প্রায় ২১ হাজার আর বাঙ্ক শ্রেণীতে ১৭ হাজারের টাকার কাছাকাছি। বিমানে ২২ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বোম্বাই বা দিল্লী যাতায়াত থাকা খাওয়ার খরচ সহ কিছু জিনিসপত্রের মূল্য। এসবের জন্যেও প্রায় হাজার খানেক টাকা লেগে যাবে। যাঁরা হজের সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের এই পরিমাণ বৈধ অর্থ অবশ্যই সংগ্রহ করে নিজ নামে কোন ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে জমা রাখা বাঞ্ছনীয়। অবৈধ অর্থে হজ্জ হয় না, কেবলমাত্র ভ্রমণ হতে পারে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াতে

নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমরা (হজের জন্য) পাথেয় ব্যবস্থা করো। আত্ম-সংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।" ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার সংযমই শ্রেষ্ঠ সংযম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। হাদিস শরীফে আছে অনেকে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে হজের জন্য রওনা হত অথচ সেখানে গিয়ে ভিক্ষা করত সে প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) অনেক উচ্চ পর্যায়ের গুণ। কিন্তু কোনভাবেই এটা মুখে দাবি করার বিষয় নয়। বরং যার অন্তর নিজ অর্জিত অর্থের চেয়ে আল্লাহ্‌র উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল তাদের জন্যই এ নির্ভরতা নির্ধারিত। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময়কার দুএকটি ঘটনা উল্লেখ প্রয়োজন। তখন নবম হিজরী। হযরত জানতে পারলেন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছেন। রোম সম্রাটদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল আরব দেশ জয় করা। কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের সব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। তাই নূতন করে হেরাক্লিয়াস আরব জয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। বিশেষতঃ মুতা অভিযানের বিফলতা তাঁর এই সংকল্পকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সিরিয়া প্রদেশ তখনও রোম সাম্রাজ্যভুক্ত তাই সিরিয়া থেকে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করল তারা। রোম সম্রাট ছিলেন বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। তিনি সৈন্যদের একবছরের বেতন অগ্রিম হিসাবে দিয়ে তাদের উৎসাহী করে তুললেন। এই সময় লাখম, জুজাম, গাসান প্রভৃতি গোত্রগুলিও এদের সঙ্গে যোগ দেয়। হযরত আরও জানতে পারলেন বাইজেনটাইন বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করেছে এবং তাদের সেনাবাহিনীর একটি দল ইতিমধ্যেই বেলাকেতে এসে পৌঁছেছে।

এই প্রথম হযরত মুসলমানদের আদেশ দিলেন—"তৈরী হও সিরিয়া আক্রমণ করতে হবে।" ইতিপূর্বে কোন মুসলমান বাহিনী প্রথমে আক্রমণের জন্য তৈরী হননি। সবসময় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরী হয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ মাত্রই হাজার হাজার মুসলমান যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় চল্লিশ হাজার মানুষ সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। এরকম বাহিনী রাখার মত আর্থিক সংগতি তখনও মুসলমানদের তৈরী হয়নি। তাই প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ যথাসর্বস্ব নিয়ে হাজির হলেন হযরতের সামনে। দান করার অসীম আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসছেন ভক্তকুল। হযরত ওমর সমগ্র সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে

দিলেন। হযরত ওসমান দিলেন এক সহস্র উট, সত্তরটি অশ্ব আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। হযরত আবুবকর তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে দিলেন। তখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পরিবারের জন্য কি রেখেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর নবীকে।" এই সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল একটি লোক একটা ডিমের মত স্বর্ণখণ্ড নিয়ে হাজির হলেন দান করতে। তা হযরতের সামনে রাখতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার তাঁর সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে রাখল। এইভাবে চতুর্থবার রাখতেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিরক্ত হয়ে সেই স্বর্ণখণ্ড তুলে এত জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যে তা যদি তাঁর গায়ে লাগত তাহলে তিনি আহত হতেন। সেই সময় হযরত ঘোষণা করলেনঃ "কোন কোন লোক প্রথমে সব কিছু সাদকা করে দেয় কিন্তু পরে লোকের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়।" এখানে স্পষ্ট হচ্ছে যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা হৃদয়ের ব্যাপকতার প্রকাশ। হযরত সেই ভাবাবেগ বুঝেই ঐ দান গ্রহণ করেননি। তাবরাণী নামক এক হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে "হযরত (সাঃ) বলেছেন : যখন হালাল অর্থ নিয়ে কেউ হজের জন্য রওনা হয়ে যানবাহনে পা রেখে লাব্বায়েক উচ্চারণ করেন তখন অদৃশ্য থেকে ফেরেস্তা ঘোষণা করেন যে,"ওহে ভাগ্যবান। আপনার লাব্বায়েক (উপস্থিতি) কবুল (গৃহীত) হয়েছে। আপনার ব্যয় বৈধ, আপনার যাত্রা বৈধ, আপনি নিরাপদ।" আর মানুষ যখন অবৈধ অর্থ নিয়ে হজে রওনা হয়ে লাব্বায়েক বলেন তখন ফেরেশতা বলেন, "আপনার লাব্বায়েক নামঞ্জুর হয়েছে, আপনার পাথেয় হারাম। আপনার হজ কবুল হয়নি বরং গোনাহ্‌র কারন।" হাদিস শরীফে আরো আছে "অবৈধ উপার্জন নিয়ে যে হজে যায় হজকে বাণ্ডিল করে তার মুখেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়।" আলেমগণ বলেছেন, "হারাম (অবৈধ) উপার্জনের ভার উপার্জনকারীর মাথার উপরেই থাকবে।"

এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক হতে হবে। প্রথমতঃ এমন পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নিতে হবে যাতে কারো কাছে কোনভাবে হাত পাততে না হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ যা সঙ্গে নিতে হবে তা বৈধ উপার্জনের অর্থ হতে হবে।

এই আদর্শ মনে সদাজাগ্রত রেখে পবিত্র হজ পালনের জন্য সরকারী মঞ্জুরী পাওয়ার আয়োজন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে খোঁজখবর করার জন্য অগ্রসর হওয়ার আগেই কয়েকটি বিষয় সাধারণভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন।

ভারতের হজ যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে

'হজ কমিটি এ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে 'হজ কমিটি' নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বোম্বাই নির্ধারিত সেজন্য এই কমিটির সদর দফতর বোম্বাই শহরে অবস্থিত। ঠিকানা—হজ কমিটি (বোম্বাই), সাবুসিদ্দিক মোসাফিরখানা, লোকমান্য তিলক মার্গ, বোম্বাই ফোন: ২৬-২৯৮৯

বর্তমানে এই কেন্দ্রীয় হজ কমিটির নিজস্ব ভবন 'হজ হাউস' নির্মিত প্রায়। এর নির্মাণ সমাপ্ত হলে কেন্দ্রীয় হজ কমিটির অফিস এখানেই স্থানান্তরিত হবে। ক্রাফট মার্কেটের কাছাকাছিই এই সুউচ্চ ভবনটি নির্মিত হয়েছে। বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন থেকে হাঁটা পথেই এখানে পৌঁছান যায়। দূরত্ব এক কিলোমিটারের কাছাকাছি।

এছাড়া হজ ও যিয়ারাতের নীতি নির্ধারণের জন্য লোকসভার কিছু মুসলিম সদস্যসহ বিশিষ্ট মুসলমানদের নিয়ে ভারত সরকার বিদেশ মন্ত্রীর অধীনে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে থাকেন। এই পরিষদই বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী নীতি রূপায়ণ করেন।

কেন্দ্রীয় হজ কমিটির কাজের সুবিধার জন্য এবং হাজিদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে সব রাজ্যেই একটি করে রাজ্য হজ কমিটি আছে। প্রত্যেক রাজ্য হজ কমিটিকেই কেন্দ্রীয় হজ কমিটি (বোম্বাই) এর সঙ্গে যোগাযোগ ও সঙ্গতি রেখে চলতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের হাজিদের কল্যাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই কমিটির সদস্য সংখ্যা মন্ত্রীসহ ত্রিশজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ সাহেব এই কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যান।

এই কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংস-এর নীচের তলার পূর্বাংশে 'হজ অফিস' নামে একটি অফিস আছে। এখানে একজন স্থায়ী কর্মীসহ প্রত্যেক হজ মরশুমেই কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে হজের কাজ পরিচালনা করা হয়। অফিসের পূর্ণ ঠিকানা:

'রাজ্য হজ কমিটি', পশ্চিমবঙ্গ
রাইটার্স বিল্ডিংস ব্লক—১ (নীচতলা)
কলিকাতা-৭০০০০১ (ফোন ২৫-৩৩১০)

হজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই প্রথমে এই অফিসে যোগাযোগ করে নিয়ম-কানুন জেনে নিতে হবে। হজের আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এই আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় হজ কমিটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রত্যেক রাজ্য হজ অফিসে পাঠান। সেই ফর্মই বিভিন্ন রাজ্য হজ অফিস থেকে হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এটাই নিয়ম। বর্তমানে এই ফর্ম বিলিব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ শোনা যায় যে হজ গমনেচ্ছুদের টাকার বিনিময়ে এই ফর্ম সংগ্রহ করতে হয়। তবে ফর্মগ্রহীতা সতর্ক হলে সহজেই এই বিড়ম্বনা এড়ানো যায়। এমন একটি পবিত্র কাজের জন্য শুরুতেই কোন অন্যায় ও অনিয়মের কাজ না করার সঙ্কল্প নিয়েই ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। কোনরকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রয়োজনে এর প্রতিকারের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এতে ভয়, ভীতি, শংকার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে এবং এক আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা সহকারে এর প্রতিকারে সচেষ্ট হতে হবে।

হজের ফর্ম সংগ্রহ, বিতরণ, জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করে এই কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং রেডিও মারফত প্রচারের ব্যবস্থাও হয়। পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন জেলা হেড কোয়ার্টার্সে এই ফর্ম পাঠিয়ে থাকেন। দূরের জেলাগুলিতে হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ সেখান থেকেই ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন। বিভিন্ন জেলায় নিযুক্ত হজ বন্ধুর মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া যায়।

সব ক্ষেত্রের বিস্তারিত তথ্যাদি জানার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংস-এর হজ অফিসে যোগাযোগ করে নেওয়া নিরাপদ। মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হজের দরখাস্ত করতে না পারলে সে দরখাস্ত গৃহীত হয় না। ফর্ম সংগ্রহের পর তা যথাযথ পূরণ করে জমা দিতে হবে। এই ফর্ম তিন প্রস্থ। এই ফর্ম-এ নিজ নিজ এলাকার এম. এল. এ. / পঞ্চায়েত প্রধান বা গেজেটেড অফিসার-এর দ্বারা স্বাক্ষর করাতে হবে। সেই সঙ্গে কোন ডাক্তারের কাছ থেকেও এটির উপরে নির্ধারিত জায়গায় স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। অনেক সময় দ্বিপ্রস্থ ফর্ম সরবরাহ করা হয়। তেমন হলে ফর্মের প্রথম পৃষ্ঠাটি দরখাস্তকারীকে টাইপ করিয়ে কপি করে নিতে হবে।

দরখাস্ত যেভাবে করতে হবেঃ দরখাস্ত করার জন্য আট কপি

পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রয়োজন হবে। ছবি একসঙ্গে ১৫/১৬ কপি করিয়ে নেওয়া ভাল। কারণ বোম্বাই-এ কোন অসুবিধা হলে অথবা সৌদি আরবে পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে ৬ কপি ছবি লাগবে ফর্ম পূরণ করে প্রত্যেক ফর্মের সঙ্গে এক কপি করে ছবি লাগিয়ে দিতে হবে এবং অতিরিক্ত একটি স্লিপে নির্ধারিত জায়গায় ৫ কপি ছবি লাগিয়ে দিতে হবে।

মহিলাগণের ছবি ঃ মহিলা যাত্রীগণের ছবি তোলার সময় সতর্ক থাকতে হবে যে তাদের মাথায় যেন ভালভাবে কাপড় থাকে এবং কপালে যেন টিপ না থাকে। মনে রাখতে হবে এরকম থাকলে সৌদি সরকার ভিসা মঞ্জুর করবেন না।

ব্যাঙ্ক ড্রাফট ঃ সমুদ্রপথের যাত্রীদের জাহাজের ভাড়াবাবদ টাকার ড্রাফট দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এই ড্রাফট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে কোন শাখা থেকে নিতে হবে এবং স্টেট হজ কমিটি পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান শাখার উপর হতে হবে। এছাড়াও কমিটি প্রত্যেক দরখাস্তকারীর জন্য 'ক্যালকাটা হজ হাউস' ফাণ্ডের নামে নির্দিষ্ট হারে টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। এই চাঁদার হার পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি নির্ধারণ করেন। এই টাকার ড্রাফট ও দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হয়। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য হজ অফিসে যোগাযোগ করে নেওয়া উত্তম।

এইভাবে যথাযথ ফর্ম পূরণ করে ড্রাফট সহ সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রী ডাকে হজ অফিসে পাঠাতে হবে। পাঠানোর ঠিকানা :

স্টেট হজ কমিটি (পশ্চিমবঙ্গ), ব্লক ১ নীচতলা
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১

বিমান ও সমুদ্রপথের যাত্রীদের জাহাজ ভাড়ার ড্রাফট দরখাস্তের সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক বলে দরখাস্তের সঙ্গে ঐ পরিমাণ টাকার ড্রাফট না থাকলে কোন অবস্থাতেই ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় না। এ বিষয় সতর্ক থাকতে হবে।

হজের আবেদন পত্রের মঞ্জুরী ঃ বর্তমানে লটারির মাধ্যমে হজ যাত্রী বাছাই করা হয়। আবেদন পত্রগুলি ক্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষার পর যথাযথগুলি নিয়ে লটারীর ব্যবস্থা হয়। এই বাছাই ও লটারী অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হজ কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

যাঁরা হজের জন্য আবেদন করতে পারবেন না ঃ হজযাত্রার জন্য কিছু লোক অনুপযুক্ত বিবেচিত হন। এটা ভারত সরকারের নীতি

নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সৌদি সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে। যেমন :

১. যাঁরা গত পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতের যে কোন জায়গা থেকে হজ্জ তীর্থ সম্পন্ন করেছেন। এমন ব্যক্তি বদলা হজ্জও করতে পারবেন না।

২. যাদের বয়স ২ বছর থেকে ১৬ বছরের মধ্যে (২ বছরের কম বয়সের শিশুরা অভিভাবকের সঙ্গে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অভিভাবকের স্বাক্ষরিত পৃথক আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিতে হবে। জন্ম-তারিখের প্রমাণপত্রও সঙ্গে দিতে হবে। জাহাজে ওঠার দিন পর্যন্ত গণনা করে বয়স দু'বছরের মধ্যে হতে হবে।)

৩. যে সকল মহিলাগণ জাহাজ ছাড়ার সময়কালে পাঁচ মাস বা ততোধিক কালের গর্ভবতী।

৪. নিম্নলিখিত রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণ :

ক) সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস (Cerebral)।

খ) পালমোনারী টিউবারকুলাইসিস।

গ) কনজেকটিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর।

ঘ) এ্যাকুইট করোনারী ইনসাফিসিয়েন্সী।

ঙ) ইনফেকসাস লেপ্রসি।

এছাড়া এ ধরনের মারাত্মক কোন রোগ এবং অক্ষমতা।

আমাদের দেশ থেকে বিশেষত: মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন এলাকা থেকে বেশ কিছু অসৎ লোক নানা অসৎ উদ্দেশ্যে হজের নামে সৌদি আরব যান। তাঁদের অনেকেই সৌদি আরবে ভিক্ষাবৃত্তি সহ নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হন। ফলে একটি গোটা দেশের অপরিসীম বদনাম ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু লোক জড়িত। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যাঁরা এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে ধরিয়ে দেওয়া দরকার। এই ধরনের দুষ্কর্মকারীদের জন্য প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্যে যাওয়া হজ্জ যাত্রীদেরও নানা দুর্ভোগ ও দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়। সর্বোপরি এই মহান ধর্মীয় কর্মটি কলুষিত হয়। তাই সকল সমাজসেবী ও বিবেচক লোকদের এর প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকৃত অর্থে যাঁরা হজ্জ করতে চান তাঁরাই যেন সুযোগ পান। মনে রাখতে হবে এই দুর্নীতি দূর করা সরকারের একার পক্ষে

সম্ভব নয়—সর্বোপরি এই ধরনের কলুষ-কর্ম দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া ধর্মের অঙ্গ।

খ. হজের অনুশীলন

পরমকরুণাময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যাঁরা হজে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারলেন তাঁরা ধন্য। অবেদনপত্র জমা দিয়েই হজের অনুশীলন শুরু করার পালা। মনে রাখতে হবে এমন একটি আরাধনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে যার গুরুত্ব অপরিসীম এবং দৈনন্দিন জীবনে সে আরাধনা প্রচলিত নয়। মনে রাখতে হবে এমন একটা পবিত্র ভূমিতে হাজির হতে হবে যেখানে পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে একেশ্বরবাদের সাধনায় মহান আল্লাহ্‌র অসংখ্য দূত পদার্পণ করেছেন। যে ভূমির সর্বত্র আল্লাহ্‌র অসংখ্য নবী বিচরণ করেছেন। বিচরণ করেছেন একান্ত বিনম্র হয়ে বিশ্বস্রষ্টার ধ্যান মগ্ন হয়ে। সেই পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্‌র একান্ত বন্ধু আমাদের প্রিয় নবী অপরিসীম দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করেছেন। ধৈর্য হারাননি, সামান্যতম অন্যায়ের আশ্রয় নেননি। এমন এক ভূমিতে যাত্রা করার মনস্থ করেছেন যেখানে আল্লাহ্‌র প্রিয় নবীর পথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর কাঁটা। উদ্দেশ্য ছিল উষার আলো ফোটার আগেই নবীজী যখন যাবেন কাআবাগৃহে তখন তাঁর পদযুগল হবে কন্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। যে পবিত্র গৃহে আল্লাহ্‌র নবী সেজদায় নত হতেই ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে উটের উদর। এমনি কত নিষ্ঠুরতাকে তুচ্ছ করে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সকল যুগের বিশ্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক একান্ত ভক্তিভরে আজীবন এবাদত করে গেছেন। আজ যিনি সেই ঘরের সামনে এক আল্লাহ্‌র এবাদাতের জন্য উপস্থিত হতে চেয়ে আবেদন করলেন তিনি নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

মনে রাখতে হবে আজ যেস্থানে উপস্থিত হয়ে আরাধনার জন্য আবেদন করা গেল আমাদের প্রিয় নবী সহজে সে জায়গায় যেতে পারেননি। সেখানে সহজে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচারিত হয়নি। মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কী অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছেন কী সীমাহীন অত্যাচারেও নিরুৎসাহ হননি তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করে বিশ্ব মুসলিমের জন্য তিনি এহেন পুণ্যময় জায়গায় বিচরণকে সহজ করেছেন।

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কাআবাঘরতো দূরের কথা মক্কা শহরেও

এবাদাতের স্থান পাননি সহজে। শিষ্যগণকে নিয়ে মক্কার গিরিগহ্বরে গিয়ে উপাসনা করতেন। তাতেও রেহাই পাননি তিনি। সেখানেও উপাসনারত সময়ে আক্রমণ করেছে একেশ্বরবাদবিরোধীরা। এই আক্রমণ প্রতিহত করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সায়াদ বিন আক্কাস। পৃথিবীর বুকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নীতি আদর্শ রক্ষার্থে শুরু হলো রক্তদান। প্রতিষ্ঠিত হল জীবনের চেয়েও নীতিরক্ষা বড়।

তখনও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়নি। একটি পরিবার গোপনে এক আল্লাহ্‌র আরাধনায় আত্মনিবেদন করেছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দীক্ষা নিয়ে নিভৃত নির্জনে পড়ছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত দূত)।' সেই পরিবারের তিনজন ইয়াসির, তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া আর পুত্র আম্মার যখন এক আল্লাহ্‌র আরাধনায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন নিজেদের তখন কোরায়েশরা নির্মম অত্যাচারে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে ছুটে গেছে। স্ত্রীর সামনে ইয়াসিরের দুপায়ে দুটো দড়ি বেঁধে দুটি উটের পায়ে বেঁধে দিয়েছে। উট দুটিকে ছুটিয়ে দিয়েছে দুই বিপরীত দিকে। দুখান হয়ে গেছে ইয়াসিরের পবিত্র দেহ। এর পর শুরু হয় পুত্র আম্মারের উপর নির্মম অত্যাচার। মমতাময়ী মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল পুত্রের এহেন দুর্দশা দেখে। তবুও বিচলিত হলেন না সুমাইয়া। নিমীলিত নেত্রে এক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে লাগলেন। শেষে অচেতন হয়ে গেল পুত্র আম্মার। মায়ের বুক ফেটে কান্না এল। তবু তিনি অবিচলিত থেকে আগের মতই পড়তে থাকলেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আবু জেহেল এহেন দৃশ্যে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সারা দেহ তার রাগে জ্বলে উঠল। এত বড় স্পর্ধা! আর নয়। এবার তীক্ষ্ণ বর্শা বের করে বিদ্ধ করে হত্যা করলো সুমাইয়াকে।

এইরকম কত শত অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে মক্কার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠল। আল্লাহ্‌র একত্বের ঘোষণাও ধ্বনিত হতে লাগল এই নির্মম অত্যাচারের বুক চিরে। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত ওসমান ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। এই ওসমান যখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন কোরায়েশগণ ক্রোধে জ্বলে উঠল। ধারণ করল হিংস্র পশুর রূপ। কোরায়েশরা ওসমানের পিতৃব্যের সঙ্গে মিলে ওসমানের হাত পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার শুরু করল। সেকি অত্যাচার! ওসমানের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল প্রতিদিন। কিন্তু নির্বিকার ওসমান।

আল্লাহ্ভক্ত খাব্বাবের ভাগ্যে জুটেছিল আরো কঠিন অত্যাচার। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে বুকে পা দিয়ে চেপে রাখত কোরায়েশরা। আর চিৎকার করে তার সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করত যে সে মোহাম্মাদের আল্লাহ্কে মানেনা। অতি কষ্টে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। এত অত্যাচারও টলাতে পারেনি খাব্বারের এই গভীর বিশ্বাসকে। আরও কত শত অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল সেদিনের আল্লাহ্ভক্ত মুসলমানরা।

এমনি এক মহীয়সী মহিলা জেন্নিরা। কোরায়েশরা শত চেষ্টাতেও তাঁকে আল্লাহর এবাদত থেকে বিরত করতে না পেরে তাঁর চোখ দুটোই উপড়ে দিয়েছিল। তাকে বঞ্চিত করেছিল দৃষ্টি শক্তি থেকে। কিন্তু আত্মার গভীর বিশ্বাস আর আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতায় সামান্যতম আঘাত হানতে পারেনি।

আরও এক মহান আল্লাহ্-ভক্ত অসহনীয় অত্যাচার সয়েছেন। সর্বস্ব খুইয়েছেন কিন্তু তাঁর এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসে সামান্যতম দুর্বলতা দেখা যায়নি। তিনি হলেন মহান সাহাবী শোয়ায়েব (রাঃ আঃ)। সীমাহীন অত্যাচারেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি কোরায়েশরা। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিষয় সম্পত্তি ঘরবাড়ী সব ছিনিয়ে নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। শোয়ায়েব আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রাসূলের প্রেমে এমনই আত্মস্থ ছিলেন যে সর্বস্ব বিসর্জনকেও সে তুলনায় তুচ্ছ গণ্য করেছেন।

অনন্তজীবনের সন্ধান পেয়ে মুসলমানগণ আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি এমনই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন যে তাদের কাছে জীবন ও সম্পদ সব কিছুই অর্থহীন হয়ে উঠেছিল।

এমনি অত্যাচার আর উৎপীড়নে মহানবী সকলকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্হর উপর ভরসা রাখার আহ্বান জানাতেন। কোরায়েশদের উপর সামান্যতম ক্রুদ্ধও হতেন না। তিনি ক্রোধ ত্যাগ করে করুণা, দয়া ও ক্ষমার সুমহান আদর্শই দেখিয়ে গেছেন বিশ্বের দরবারে।

আজ যাঁরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁদেরকেও করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিলীন করে দিতে হবে নিজেকে। আর এখন থেকেই আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই পবিত্র হজের কাজ করার সময় যেন সামান্যতম ত্রুটিও না ঘটে। প্রত্যেকটি জায়গার করণীয় কাজগুলি করার জন্য নিজেকে তৈরী করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

মানবজীবনের এই শ্রেষ্ঠ আরাধনা করার সুযোগ জীবনে একাধিকবার

ঘটে না। সামান্য ত্রুটির সংশোধনের অবকাশও পাওয়া যায় না। তাই হজ্জের উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে গভীর অনুশীলন করে তৈরী করতে হবে নিজেকে। পার্থিব সব কিছু ত্যাগ করে মোহ মায়া মমতা মুক্ত হয়ে শুরু করতে হবে হজ্জ যাত্রার অনুশীলন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী, সাহাবাদের জীবনী, কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ বার বার পড়ে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে। হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য হজ্জের নিয়ম সম্বলিত বইপত্র, সালাত আদায়ের সহি তরিকা সংক্রান্ত বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। একাগ্রতা নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার, তাঁর প্রিয় দূত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ লাভের ক্ষমতা দান করেন। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কারো সাধ্য নেই তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার। আল্লাহ্‌র একান্ত করুণাই পারে সেই অপরিসীম পুণ্যময় দরবারে হাজির করতে। তাই অনুশীলনের সাথে আশা রাখতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে যাতে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান করেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হচ্ছেন কিনা জানার জন্য।

হজ্জের জন্য নির্বাচিত হলে করণীয়

ক. নিজেকে প্রস্তুত করা

হজ্জের নির্বাচন করার জন্য রাজ্য হজ্জ কমিটি যে লটারি করে থাকেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতে হবে। এ ব্যাপারেও নানা রকম দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে। মনে রাখতে হবে অন্যায়কে সাহায্য করা অপেক্ষা পথ থেকে ফিরে আসাও উত্তম। এই ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ কঠিন বেদআৎ। মুসলমানদের জন্য এটা একটা হীন, নীচ ও জঘন্যতম কাজ। এক্ষেত্রে আমি বাধ্য হয়ে দিয়েছি বা আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি বিজ্ঞ বাক্য দ্বারা এই জঘন্য

অপরাধ থেকে যে মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করা হয় তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। মহাত্মা ইবনে ওমর বলেছেন "সর্বোত্তম হজ্জ ঐটি যার নিয়ত সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ (খালেস), ব্যয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং বিশ্বাস সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

লটারিতে যাঁরা হজের জন্য নির্বাচিত হলেন তাঁরা সত্যই সৌভাগ্যবান। আর যাঁরা বঞ্চিত হলেন তাঁরা পরের বছরের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকুন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে আপনিও এ সুযোগ লাভ করে ধন্য হবেন। প্রশংসা সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র, যিনি আপনাকে তাঁর ঘরের হজ্জ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। হজ্জ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ এবাদাত (আরাধনা)। এই শ্রেষ্ঠ এবাদাত সুষ্ঠু, সুন্দর, নিয়মমাফিক করার জন্য এখন থেকে জীবনপণ করে অনুশীলন শুরু করতে হবে।

এই আরাধনা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে যাঁর উপর এই এবাদাত বাধ্যতামূলক (ফরজ) তিনি এটি সম্পন্ন না করলে জীবনের, ধর্মের আর এবাদাতের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারেন না। হজের জন্য এখন থেকেই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। লটারিতে নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ পেলে প্রথমেই দুরাকাত নফল নামায আদায় করে নিতে হবে। পরম করুণাময়ের দরবারে নিজের জীবনের পূর্ববর্তী ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত রকম ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের আচরণে কারো কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে সে ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে এখন থেকে শুরু করে হজ্জ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। পার্থিব চিন্তা আপনার এই মহামূল্য এবাদাতের কোন ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন থেকে দুঃস্থদুর্গত জনের প্রতি সদয় আচরণ নিঃস্ব ও দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার দ্বারা পরিপুষ্ট করতে হবে। একান্ত তা না পারলে তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে। কারো কোন জিনিস গচ্ছিত থাকলে তা যথোপযুক্ত জায়গায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

এবার সচেষ্ট হতে হবে কয়েকজন ধার্মিক সঙ্গী নিয়ে একটি কাফেলা বা দল তৈরী করার। এই কাফেলা ৪ থেকে ১২ জনের মধ্যে হওয়া ভাল। সঙ্গী ঠিক হয়ে গেলে—প্রতি দশ দিন অন্তর একদিন একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে পরস্পরের কাছ থেকে

জ্ঞান আহরণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেককে এমনভাবে তৈরী হতে হবে যেন একে অপরের সহায়ক হন। সঙ্গীগণ সর্বদা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবেন। কিছু ভুলে গেলে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। ভীত হলে সাহস যোগাবেন। ধৈর্যহারা হলে পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেবেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শুদ্ধ করে পড়তে হবে। কালেমাগুলি মুখস্থ করে নিয়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। নামাযের নিয়মকানুন, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত মোস্তাহাবগুলি ভাল করে জেনে নিতে হবে। একটি বিশুদ্ধ নামায শিক্ষার সাহায্য নিয়ে নূতন করে সব ঠিক করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত নামায শিক্ষাগুলির মধ্যে "ইসলামী শিক্ষা ও বিধান" নামক বইটিই সর্বাধিক সহায়ক। নামাযের নিয়ত, সুরা, আত্তাহিয়াতো, দোওয়া কুনুত, মোনাজাত ইত্যাদিগুলো শুদ্ধ করে নিয়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যাঁরা নিজেরা আরবী পড়তে পারেন না তাঁদের সবগুলো বাংলাতে পড়ে মুখস্থ করে কোন বিজ্ঞ লোকের কাছে শুনিয়ে সংশোধন করে নিতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মমত না পড়তে পারলে কোন এবাদাতই পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে না। নামায শুধুমাত্র অনুষ্ঠানসর্বস্ব না হয় সে ব্যাপারে সাবধানী হতে হবে। নামাযের প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়তে হবে। নিজে নিজে সম্ভব না হলে কারও সাহায্য নিতে হবে। অক্ষমতার অজুহাত কোন-ভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মনে রাখতে হবে জ্ঞানবান হওয়া হজের একটি শর্ত। নিয়মমত প্রতিদিন কোরআন শরীফ ও তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করে কোরআন শরীফের বিষয়বস্তুকে বুঝতে হবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও জীবনের ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্য নেই। কিন্তু অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রত্যেক বিষয় অনুশীলন ও অভ্যাস (আমল) করার উপর। এখন থেকে দৈনন্দিন কাজের একটা সময়সূচী করা যেতে পারে। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ওজু করে তাহাজ্জদের নামায আদায় করা। তাহাজ্জদের পর ফজর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ধ্যান (ওজিফা) করা। ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। প্রাতঃকালীন আহারাদির পর নামাযের বিভিন্ন বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য অনুশীলন এবং পারলে অর্থ সহ বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করা উচিত। দিনের অন্যান্য সাংসারিক ও সামাজিক

দায়িত্ব পালন করে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুশীলন ও অনুধাবন এবং তা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার সঙ্কল্প করতে হবে। আশ্বরের নামাযের পর আন্তরিকতার সঙ্গে নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নেওয়া দরকার। মাগরিবের নামাযের পর পর কিছুসময় ওজিফা (আল্লাহ্‌র ধ্যান) করা উচিত। তারপর নিজ পরিবারের লোক-জনকে নিয়ে বসে সৎ উপদেশ দান করা দরকার। এশার নামাযের পর হাদিস ও মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে ন্যায়নিষ্ঠা পবিত্রতা ইত্যাদিকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে স্মরণ করে রাত্রির নিদ্রার আয়োজন করা দরকার।

এখন থেকে সমস্ত রকম বেদআত কাজ থেকে বিরত হওয়া দরকার। সকলরকম অশ্লীল ও মন্দ কাজ, বিবাদ-বিসংবাদ ত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কোরআনে মানুষকে বার বার এ সম্পর্কে সাবধান করেছেন। মহাত্মা সুফিয়ান বলেছেন,—যে অশ্লীল কথা বলে সে তার হজকে নষ্ট করে।

শরীয়তের সমূহ আদেশ নিষেধ ইত্যাদি ভালভাবে জেনে নিতে হবে। এই সঙ্গে আদব বা শিষ্টাচার ও নির্দিষ্ট আছে। নামায, রোজা, হজ প্রত্যেকটিতেই কিছু শিষ্টাচার আছে সেগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তফসিরে আজীজীতে শাহ আব্দুল আজীজ (রাঃ) উল্লেখ করেছেন "যে ব্যক্তি শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে অলসতা করে সে ফরজ ত্যাগ করার মত কাজ করে আর যে ফরজের ক্ষেত্রে অলসতা করে সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হয়।"

এজন্যই কোন বিষয় অলসতা কুফরীর সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। শরীয়তের সামান্য ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। শয়তান সবসময় মানুষের সৎ কাজে বাধাদানের জন্য সচেষ্ট আছে। পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত শয়তানের উক্তি, "আমি শপথ করে বলছি আমি তাদের সোজা পথের মাঝখানে থাকব তারপর তাদের চতুর্দিক থেকে····আক্রমণ চালাব। আপনি (আল্লাহ্‌) তাদের অনুগত পাবেন না।"

খ. হজের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

হজযাত্রার আগে হজের যাবতীয় নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়া ও বোঝার প্রয়োজন। ইসলামের শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) জগৎ বাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করে এবং

কোন গর্হিত কথা, কাজ বা আচরণ করে না সে যেন সত্তোজাত শিশুর মত মাতৃজঠর হতে নিষ্পাপ হয়ে ভূমিষ্ট হয়। হজের দ্বারা সে সমূহ পাপ মুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।"

আলেমগণ বলেন—হজের দ্বারা ছোটবড় সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। মহানবী হযরত মোহম্মাদ (সাঃ) এর বাণীতে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে —প্রথমত হজ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবেনা কোন সুনাম ও গর্বের বাসনা। অনেকেই সুনাম ও সম্মান অর্জনের জন্য হজ করেন। পরিতাপ এমন মানসিকতার জন্য। এত কষ্ট, এত অর্থব্যয় সব বিফলে যায়। হজের ফরজ আদায় করা হয় ঠিকই কিন্তু হজ দ্বারা যে পরম প্রাপ্তি তা অর্জিত হয়না। মানবজীবনের এত বড় প্রাপ্তি, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র এত বড় অবদান শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী মোহময় জগতের তুচ্ছ সম্মান অর্জনের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

আজ থেকে চোদ্দশত বছর পূর্বেই মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সুদূর প্রসারী দূরদৃষ্টি দিয়ে আজকের দিনের অবস্থা অনুধাবন করে বলেছিলেন, "মহাপ্রলয়ের (কেয়াগাতের) পূর্বে আমার অনুসারী (উম্মত) ধনশালী লোকেরা ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে হজ করবে। যেন তারা অন্যত্র বিলাস ভ্রমণে না গিয়ে হেজাজ ভূমিতে ভ্রমণ করল। আমার অনুসারী মধ্যবিত্ত লোকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হজ করবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে নানা সামগ্রী নিয়ে যাবে ও নিয়ে আসবে। আর আলেমগণ লোক সমাজে সুনাম অর্জনের জন্য লোকদেখানো সম্মান অর্জনের উদ্দেশ্যে হজ করবে। আর দরিদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তির মানসে হজ করবে।" এই উক্তিতে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে একশ্রেণীর লোক ভ্রমণকারী হাজি, একশ্রেণীর লোক ব্যবসাদার হাজি, একশ্রেণীর লোক সুনাম অর্জনকারী হাজি এবং অন্য একশ্রেণী ভিখারী হাজিতে পরিণত হবে। আজকের দিনে এই চারশ্রেণীর হাজির সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। তাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। এত বড় প্রাপ্তি যেন হেলায় না হারাতে হয়। যেন আল্লাহ্‌ প্রাপ্তিই হজের উদ্দেশ্য হয়। মনে রাখতে হবে পার্থিব সম্পদ ও মোহময় জীবন সবই ক্ষণস্থায়ী। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ মানুষের স্থায়ী জীবন নির্দ্ধারণ করেছেন পরলোক। মহান আল্লাহ্‌ সেই স্থায়ী জীবনের চির শান্তি চির সুখ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন হজ্জের বিনিময়ে। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করেই হজ্জ সমাধা করতে হবে।

এক হাদিসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—'ইসলামী বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে আছেন এমন সময় একদল লোক এসে প্রথমে পবিত্র ঘর কাআবার তাওয়াফ করল তারপর সাফা ও মারওয়া সায়ী করল। খলিফা তাদের জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা, কোথা হতে এসেছ, উদ্দেশ্যই বা কী ? তাঁরা বললেন আমরা ইরাক থেকে হজ্জের জন্য এসেছি। হযরত ওমর বললেন এর মধ্যে তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নেই তো? তাঁরা উত্তর দিলেন না শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করার জন্য এখানে এসেছি। তখন হযরত ওমর বললেন, এবার তোমাদের পার্থিব জগতে নতুন জীবন শুরু হলো। কারণ তোমাদের সব পূর্ব পাপ ক্ষমা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ অশ্লীল কথাবার্তা একেবারে ত্যাগ করা প্রয়োজন। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গেও কোন অশ্লীল কথাবার্তা না বলা, কোন অশ্লীল আকার ইঙ্গিত থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন রকম অশ্লীলতা চিন্তার মধ্যে থাকলেও এই এবাদাতের সমূহ ক্ষতি হয়।

তৃতীয়তঃ ঝগড়াবিবাদ করা, আঘাত করা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ত্যাগ করা উচিত। হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন—হজ্জের মহৎ কাজ হলো বিনম্র কথাবার্তা বলা ও লোকজনকে আহার্য দেওয়া। তাই প্রত্যেকের উচিত সঙ্গীদের সঙ্গে নম্র ও মধুর ব্যবহার করা। কোন রকম কর্কশ কথা বলা ও রূঢ় আচরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন সঙ্গীকে কোন কিছুর জন্য বারবার উত্যক্ত না করা, কোন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কোন কথা না শোনানো, কোন বেদুঈন ও হেজাজ বাসীর সঙ্গে কলহ না করা উচিত। আলেমগণ বলেছেন—"কাউকে কষ্ট না দিলেই তাকে সৎ চরিত্রের অধিকারী বলা যাবে না বরং সৎ চরিত্রের অধিকারী সেই যে অন্যে কষ্ট দিলেও সহ্য করে।" যৌথ ভ্রমণেই মানুষের প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়ে। এক বার হযরত ওমর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি অমুক ব্যক্তিকে চেন ? লোকটি উত্তর দিলো অবশ্যই চিনি। হযরত ওমর তখন বললেন, তুমি কি তার সঙ্গে কখনও ভ্রমণ করেছ ? সে বলল না তা করিনি। তখন হযরত ওমর বললেন তাহলে তুমি তাকে কিছুই চেননি।' আর একস্থানে উল্লিখিত আছে—"হযরত ওমরের উপস্থিতিতে একজন লোক অন্য একজনের উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করছিল। তখন হযরত ওমর ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন কি কখনও ঐ লোকের সঙ্গে ভ্রমণ করেছ? লোকটি উত্তর দিলো না তা করিনি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন তবে তুমি কি করে তার প্রশংসা করছ?

একথা অনস্বীকার্য যে একত্রে ভ্রমণের সময় যে কোন লোকের সহনশীলতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহানুভূতি সহিষ্ণুতা সব কিছু পরীক্ষিত হয়। চরিত্রে প্রকৃতপক্ষে কি আছে তা সহজে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "প্রকৃত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।" পূর্ণ হজের অর্থ হলো হজের মধ্যে সামান্যতম গোনাহের কাজ না করা, হজের যাবতীয় শর্ত পালন করে হজ সমাধা করা, বিনম্র কথা বলা, লোকজনকে ভোজন করানো ও সালাম দেওয়া।

মেশকাত ও মোসলেম শরীফ নামক দুই বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ আরাফাতে হজের দিন যত লোককে নরকাগ্নি থেকে মুক্ত করে দেন আর কোন দিনই তা করেন না। আল্লাহ্ ঐ দিন মর্ত্যবাসীর উপর তাঁর সর্বাধিক করুণা বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করে বলেন "দেখ আরাফাতে উপস্থিত আমার বান্দারা (ভক্তরা) কি চায়?" অপর একটি হাদিসে আছে : মহান আল্লাহ ঐদিন পৃথিবীর আকাশে (সামাআদ্দুনিয়া) অর্থাৎ প্রথম আকাশে অবতরণ করে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব প্রকাশ করে বলেন "দেখ আমার বান্দারা কি অবস্থায় আমার সামনে হাজির হয়েছে। রুক্ষশুষ্ক কেশ, দীর্ঘ ক্লান্তিকর ভ্রমণে দেহ হয়েছে ধুলিধুসরিত, শুচিশুভ্র বসন হয়েছে ধূলিমলিন, কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে লাব্বায়েক! লাব্বায়েক (আমি উপস্থিত! আমি উপস্থিত!) আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে আমি এই একাগ্র বিনম্র বান্দাদের সমস্ত পাপরাশি ক্ষমা করে দিলাম।" ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত ভাবে বলেন,—হে আল্লাহ্! ঐ লোকটি সর্বত্র পাপী বলে পরিচিত আর ঐ স্ত্রীলোকের পাপের কথাতো বলাই যায় না। তাদের কি হবে? মহা পরাক্রমশালী করুণাময় ক্ষমাশীল আল্লাহ্ বলেন "আমি তাদেরও সমূহ পাপরাশি ক্ষমা করে দিলাম।" আল্লাহ্ আরও বলেন,—"এলোমেলো বেশবাসে, ধূলিমলিন দেহে, রুক্ষশুষ্ক কেশে আমার বান্দারা শুধুমাত্র আমার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পাপরাশি যদি বিশ্বভূমির সমস্ত ধূলিকণা আর পৃথিবীর বৃক্ষরাজির

সমপরিমাণ হয় তাহলেও আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।”

একটি কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে একসময় সাআতুন খাওলানীর কাছে একদল লোক এসে একটা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলল যে, 'হুজুর! ফাতেমা গোষ্ঠীর কিছু লোক একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে আগুনে জ্বালানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু সারাদিনব্যাপী আগুন জ্বেলেও তার একটি লোমও পোড়ানো সম্ভব হয়নি। হযরত সাআতুন শুনে বললেন, সম্ভবতঃ লোকটি তিনবার হজ করেছে।' তিনি আরও বললেন,—“যে একবার হজ করল সে নিজের ফরজ পালন করল, যে দুবার হজ করল সে আল্লাহ্‌কে ঋণ দিল আর যে তিনবার হজ করে আল্লাহ তার চর্মকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন।”

মেশকাত শরীফে উল্লিখিত হয়েছে—“আরাফাতের দিন ছাড়া শয়তান এত বেশী অপদস্থ, ধিকৃত, হীনমন্য ও রুষ্ট আর কখনই হয় না। কারণ ঐদিন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অধিক পরিমাণে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।”

শয়তানের আজকের দিনে সর্বাধিক ব্যথিত, মনঃক্ষুণ্ণ ও রাগান্বিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। কত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে সে মানুষকে প্ররোচিত ও প্রতারিত করে পাপে লিপ্ত করেছিল। অথচ আজ এই মহাপ্রান্তরে একাগ্রতা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজির হওয়ায় তাঁর অপরিসীম করুণারাশির ধারায় ভেসে গেল সেই পাপরাশি। এ কি কম পরিতাপের বিষয়! শয়তানের জন্য একি কম ক্ষতি! হাজিদের বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের যাত্রাপথে শয়তান সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী নিয়োগ করেছিল। কিন্তু করুণাময়ের কৃপায় তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বহু মানুষই একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হাজির হতে পেরেছে আর আল্লাহ্‌ তাদের হাজিরাকে গ্রহণ করে তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। শয়তানের এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে।

মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী এহিয়াউল উলুমুদ্দিন গ্রন্থে আল্লাহ্‌র এক অলির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঐ অলি ব্যক্তি আরাফাতের দিন শয়তানকে ক্ষীণকায় বিবর্ণ, হরিদ্রাভ ম্লান দেহে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখলেন। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? শয়তান উত্তর দিলো, “হাজিগণ পার্থিব লোভলালসা, ব্যবসাবাণিজ্য, মোহ মমতা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর' দরবারে হাজির হয়েছে। আমার আশংকা

হচ্ছে যে তারা আল্লাহ্‌র করুণা থেকে বঞ্চিত হবে না। তাই আমি হতাশায় কাঁদছি। অলি ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত ক্ষীণকায় হলে কেন? সে বলল—অসংখ্য যানবাহনের ধ্বনি শ্রবণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। আহা এই যানবাহন যদি হজ ও ওমরাহর জন্য না দৌড়ে খেলতামাসা ও হারাম কাজে দৌড়াত আমার কাছে তা কত তৃপ্তিদায়ক হতো। ঐ অলি ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীর এত হরিদ্রাভ কেন? দীর্ঘদিন ধরে হাজিগণ একে অন্যকে ভাল কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে নেক আমলে (পবিত্র অভ্যাসে) অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা দেখে এবং এ থেকে তাদের বিরত করতে না পেরে আমার এ অবস্থা। তারা যদি পাপ কাজে এইভাবে একে অপরকে সাহায্য করত তা আমার জন্য কত না তৃপ্তিদায়ক হত। এরপর ঐ বুজর্গ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরকম ন্যুব্জ হয়ে গেলে কি করে? শয়তান উত্তর দিলো,—এখানে লোকেরা ঈমানের (বিশ্বাসের) সঙ্গে মৃত্যুবরণের বিষয়ে অত্যধিক চিন্তা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে সুতরাং তারা তাদের এই নেক আমলের জন্য গর্ব প্রকাশ করবে কি করবে না সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে আমার এ অবস্থা হয়েছে।

পবিত্র হাদিস মোসলেম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে এবনে সামাসা বলেন, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "কুফরী অবস্থার সমূহ পাপকে ইসলাম ধ্বংস করে দেয়। আর হজ তার পূর্বকৃত সমূহ পাপ ও অন্যায়কে নির্মূল করে দেয়।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মীনার মসজিদে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে—"হজের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হলে প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পাপমোচন হয় এবং একটি করে পুণ্যসঞ্চয় হয়। তাওয়াফের পর দুরাকাত নামাজে একজন আরবী গোলামকে মুক্তি দেওয়ার পুণ্য লাভ হয়। সাফা ও মারওয়ায় সায়ী (দৌড়াদৌড়ি) করলে সত্তরজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার পুণ্যসঞ্চয় হয়। আরাফাতের ময়দানে মানবকুল যখন একত্রিত হয় তখন আল্লাহতাআলা প্রথম আসমানে হাজির হয়ে ফেরেশতাদের সাক্ষী রেখে সকলকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তাঁরা যাদের জন্য ক্ষমার সুপারিশ করেন তাদেরও ক্ষমা করে দেন।"

এরপর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আরও বলেন, "শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারলে এক একটি পাথরের বিনিময়ে নিক্ষেপকারীকে ধ্বংস করার মত এক

একটা পাপ মোচন হয়। এহরাম খোলার সময় চুল কাটার বিনিময়ে প্রত্যেক চুলের বদলে এক একটি পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং এক একটি পাপ মোচন হয়। কোরবাণীর বিনিময়ে অর্জিত পুণ্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পুঁজি জমা থাকে। সবশেষে যখন তাওয়াফে যিয়ারাত করা হয় তখন ঐ ব্যক্তির আমলনামায় (কৃতকর্ম সম্বলিত দলিল) কোন গোনাহ্ থাকে না। এই সময় ফেরেশতা তাঁর কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন তুমি এখন থেকে নতুন করে আমল (সৎকার্যাভ্যাস) করতে থাক কারণ আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী সকল পাপই ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আবু সোলায়মান নামক এক সাহাবী বলেছেন—"আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি নাযায়েজ (ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ) কাজের সঙ্গে হজ্জ করে এবং লাব্বায়েক বলে আল্লাহ তার জন্য লা-লাব্বায়েক বলেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত রকম অন্যায় কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজের জন্য লাব্বায়েক বলা হয় ততক্ষণ কারো লাব্বায়েক মঞ্জুর হয় না।" 'হযরত আবু সোলায়মান হজে গিয়ে এহরাম বেঁধে লাব্বায়েক বললেন না। এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর আল্লাহ্‌র ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গীদের বললেন আমি শংকিত যে যদি আল্লাহ আমার উপস্থিতিকে নামঞ্জুর করেন। এই ভয়ে আমি লাব্বায়েক বলতে পারছি না।'

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—"যখন হযরত জয়নাল আবেদিন হজের জন্য এহরাম বাঁধলেন, তাঁর মুখমণ্ডল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দেহ প্রকম্পিত হতে থাকল। চিত্ত এমন বিহ্বল হয়ে পড়ল যে তিনি লাব্বায়েক উচ্চারণ করতে পারলেন না। তখন অন্যেরা জিজ্ঞাসা করলেন আপনি লাব্বায়েক বলছেন না কেন ? তিনি বললেন, আমার ভয় হচ্ছে যদি আমার লাব্বায়েকের উত্তরে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে লা-লাব্বায়েক অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি গ্রাহ্য নয় ঘোষণা হয়ে যায়। এরপর অতিকষ্টে ভীতিবিহ্বল চিত্তে কোনক্রমে লাব্বায়েক উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র ভয়ে অজ্ঞান হয়ে উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। এইভাবে সারা হজ্জ মরশুমে যখনই তিনি লাব্বায়েক বলতে গেছেন তাঁর ঐ একই দশা হয়েছে।"

তিরমিজী শরীফে আছে "বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের আত্মার কৃতকর্মের পর্যালোচনা করতে থাকেন আর পরলোকের জন্য নেক আমল

করতে থাকেন। আর নির্বোধ দুর্বল ঐ ব্যক্তি যে নিজের আত্মার কুচিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ধান্দায় থাকেন।"

এহেন মহামূল্য প্রাপ্তির জন্য নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সব রকম পার্থিব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে যে কোন রকম লোভ লালসা, মোহ মায়া মমতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিজেকে উৎসর্গ করে এই মহাতীর্থে অংশ নিতে হবে। তবেই হবে হজ। তবেই হবে জীবনের পরমতৃপ্তি, ঘটবে পরমপ্রাপ্তি। নিজেকে রাসূল (সাঃ)-এর নীতির আলোকে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী এবং আল্লাহ্‌র অলিগণের জীবনাদর্শের ধারায় জীবনের এই পরম প্রাপ্তিকে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে লাব্বায়েকের অনুশীলন শুরু করতে হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে আমি একটি হাদিস রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে বুঝে নিয়েছি তা এরকম : হুজুর (সাঃ) বলেছেন "কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে মানুষের ক্রিয়াকলাপের হিসাব নিতে শুরু করবেন তখন মানুষ ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবেন। সর্বাগ্রে তিন ব্যক্তিকে ডাকা হবে। প্রথমে একজন কোরআনে হাফেজ তারপর একজন ধনশালী, অতঃপর একজন মোজাহেদ। হাফেজকে জিজ্ঞেস করা হবে—আমি তোমাকে এমন নেয়ামত দান করেছিলাম যা আমি নবীর উপর অবতীর্ণ করেছি। তখন সে উত্তর দেবে নিশ্চয় ঐটি আপনার অসীম অনুগ্রহ ছিল। মহান আল্লাহ্‌ বলবেন—তুমি তাতে কি আমল করেছ? সে উত্তর দেবে—আমি প্রত্যেকদিন সকাল-বিকাল তা পাঠ করেছিলাম। আল্লাহ্‌ পাক বলবেন তুমি মিথ্যাবাদী! ফেরেশতারাও বলে উঠবেন—তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি ঐসব এজন্য করেছিলে যে লোকে তোমাকে বড় হাফেজও কারী বলবে। তোমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। লোকে তোমাকে কারী বলেছে। এরপর ঐ ধনশালীকে ডেকে আল্লাহ্‌ বলবেন—আমি তোমাকে অফুরন্ত ধনরাশি দান করেছিলাম যাতে তুমি কারো মুখাপেক্ষী না হও। সে উত্তর দেবে,—হে দয়াময় প্রভু অবশ্যই আপনি আমাকে পৃথিবীতে ধনশালী করেছিলেন। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তুমি তোমার ধনরাশি দিয়ে কি হক আদায় করেছ? ধনবান ব্যক্তিটি উত্তর দেবে, আমি আত্মীয় স্বজনের প্রতি সৎ ব্যবহার করেছি, দানধ্যান করেছি। আল্লাহ্‌

বলবেন তুমি মিথ্যাবাদী। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণও বলবেন তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ বলবেন—লোকে যাতে তোমাকে বড় দাতা বলে সেজন্য তুমি তা করেছিলে। তাতো তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর মোজাহেদকে হাজির করা হবে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি আমল করেছ? তিনি উত্তর দেবেন আল্লাহ! তুমি জেহাদের হুকুম দিয়েছ। সেইমত আমি তোমার রাস্তার জেহাদ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি। আল্লাহ্র তরফ থেকে বলা হবে তুমি তা করেছ এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলবে। তাতো দুনিয়ায় তোমাকে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন: যারা (সৎকাজের দ্বারা) কেবলমাত্র পৃথিবী এবং পার্থিব সুখ চায় আমি তাদের আমলের পরিবর্তে পৃথিবীতেই সবকিছুর ব্যবস্থা করে থাকি এবং তাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনা। আর পরকালে তাদের জন্য নরকাগ্নি (জাহান্নাম) ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। তারা পৃথিবীতে যা কিছু করেছিল মন্দ নিয়তের দরুন পরকালে ঐ সব কিছুই কাজে লাগবে না।"

এহেন অবস্থায় এমন সুদৃঢ়ভাবে নিয়ত করতে হবে যে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য ও পরকালের পুরস্কারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা নিয়ে হজের নিয়ত করাই একমাত্র লক্ষ্য এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় হজের আহকাম আরকান পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এতে যেন কোন পার্থিব লাভালাভ বা আকাঙ্খা না থাকে।

হজ যাত্রার আয়োজন শুরু

ক. প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ

যে ক'জন দলবদ্ধভাবে হজ সমাধা করার স্থির করেছেন তাদের একত্রে বসে একটি তালিকা তৈরী করা দরকার। তালিকার কিছু জিনিষ পুরো দলের জন্য কিনতে হবে। কিছু জিনিষ প্রত্যেককে পৃথকভাবে কিনতে হবে। হজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র হালাল (বৈধ) অর্থ দ্বারা কেনা অবশ্য কর্তব্য।

বিমানযাত্রী ও জলজাহাজ যাত্রীগণের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সামান্য

হেরফের হয়। বর্তমান মক্কা ও মদিনা শরীফ পৃথিবীর সর্বাধুনিক শহরগুলির অন্যতম। সেখানে কোন জিনিষের অভাব নেই। ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেও পাওয়া যায়। জিনিষপত্র বেশী হলে পথে এবং মক্কা মদিনা সর্বত্র বিব্রত থাকতে হয়। সরকারীভাবে বরাদ্দ বিদেশী মুদ্রায় ভালভাবেই চলে যায়। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যতীত অন্য কিছু সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে সৌদি সরকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া ওদেশে কোথাও খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ও কষ্ট নেই বরং নির্ভেজাল অঢেল ভাল জিনিস পাওয়া যায়। কোন খাদ্যদ্রব্য, চাল, ডাল, তেল, ঘি ইত্যাদি কিছুই সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সৌদি আরবে কুলি নেই। সব মালপত্র নিজেকে বইতে হবে, গাড়ীতে তুলতে হবে। সুতরাং নিজের ক্ষমতার বাইরে কিছুই সঙ্গে না নেওয়া ভাল।

সবদিক বিবেচনা করে একটি তালিকার খসড়া দিলাম :—

১. এহরামের কাপড় (দু জোড়া) (৫০ ইঞ্চি বহরের লংক্লথ ২½ মিটার করে)।
২. হাওয়াই চপ্পল (২ জোড়া)
৩. সাধারণ নিউকাট জুতো বা চামড়ার চটি (১ জোড়া)
৪. কাঁধে সর্বক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার মত ছোট ব্যাগ।
৫. হাতে ঝোলানো ছোট হোল্ড অল একটি।
৬. ছোট সতরঞ্চি—১
৭. ছোট পাতলা বেডসিট—২
৮. জায়নামায বা মোসাল্লা—১
৯. গরম চাদর—১
১০. লুঙ্গি—২
১১. গামছা—১
১২. পায়জামা—২
১৩. পাঞ্জাবী—২
১৪. টুপি—২
১৫. গেঞ্জি—২
১৬. মোজা—১ জোড়া
১৭. রুমাল—২
১৮. ছোট আয়না—১
১৯. চিরুনি—১
২০. সেফটি রেজার—১ ব্লেড—১ প্যাকেট
২১. ছোট কাঁচি—১
২২. ছুরি—১
২৩. সূচ ও সুতো
২৪. মাথায় দেওয়ার তেল ২৫০ গ্রাম
২৫ বাসন—১

পেয়ালা—১
স্টীলের গ্লাস—১

২৬. ১ মিটার পুরোনো কাপড়
২৭. বাজারের থলে—১
২৮. গুড়ো সাবান—১ কে. জি
২৯. গায়ে মাখা সাবান—১
৩০. আতর ও সুরমা
৩১. মগ ও বদনা—একটি করে
৩২. টর্চ—১
৩৩. পাসপোর্ট সাইজের ছবি—৮/১০ কপি
৩৪. দুটি ছবির উল্টোপিঠে নিজের থাকার জায়গার ঠিকানা ও নাম লিখে একটি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ও একটি পকেটে সবসময় রাখা দরকার।
৩৫. একজোড়া হাওয়াই চপ্পল রাখার মত সরু কাপড়ের থলে।
৩৬. জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য কিড ব্যাগ
৩৭. টাকাপয়সা রাখার ব্যবস্থা আছে এরকম কোমরের বেল্ট—১টি
৩৮. হজের নিয়ম ও দোওয়ার একই বই কম করে দুখানা।

একটি সুটকেসে জিনিসপত্র ও হোল্ডলে বিছানাপত্র ভরে নিতে হবে।

বিমান যাত্রীদের এই সকল জিনিষ নেওয়ার জন্য ভি, আই, পি বা এরিস্টোক্রাট জাতীয় সুটকেশ। সমুদ্রপথের যাত্রীদের জিনিষ নেওয়া যায় এমন ট্রাঙ্ক দরকার। জাহাজে ব্যবহারের জন্য কিছু অতিরিক্ত জামাকাপড় নেওয়া প্রয়োজন। তবে এক জোড়ার বেশী প্রয়োজন নেই। সী-সিকনেস ও পেটের অসুখের কিছু ট্যাবলেট এবং কারও বিশেষ ধরনের অসুখ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শমত সেই অসুখের কিছু ওষুধপত্র।

মহিলা হজ যাত্রীদের জন্য কাপড় জামা ছাড়া অন্য আসবাব পত্র একই রকম। যেমন: শাড়ী ২ জোড়া সম্ভব হলে সালওয়ার কামিজ ১ জোড়া। সঙ্গে পরার জন্য ফুল হাতা ব্লাউজ ২ খানা। সালওয়ার কামিজ পরার জন্য মাথার ওড়না ১ জোড়া। বোরখা ১ টি। মোহরাম সঙ্গে থাকলে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রগুলি এক জনের হলেই হবে। যাদের এখনও মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয় নি তেমন মহিলাদের কম করে তিনটি 'কমফিট' বা 'কেয়ার ফ্রী' জাতীয় স্যানেটারী টাওয়েল। এর ব্যবহার জানা না থাকলে জানা-

মহিলার কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। যে কোন ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

জুতার ব্যাপারে একটি জ্ঞাতব্য তথ্য হলো এহরাম অবস্থায় এমন চটি পরতে হয় যাতে আঙ্গুলগুলি ও পায়ের পাতার উপরিভাগ খোলা থাকে। এজন্য হাওয়াই চপ্পলই সবচেয়ে উপযোগী। ওদেশে চামড়ার স্যাণ্ডেল সারানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ছিঁড়ে গেলে ফেলে দিতে হয়। তবে এহরাম খোলা অবস্থায় পাম্প-সু উপযোগী। ভিড়ের মধ্যে চলতে সুবিধা হয়। মক্কা মদিনায় এক আধ পশলা বৃষ্টি হয়। সে সময়ও পাম্প-সুই উপযোগী।

বিমানপথের হজযাত্রীগণ হাতের ছোট ব্যাগ বাদ দিয়ে মোট ৩০ কেজি ওজনের মালপত্র বহন করতে পারেন এর বেশী নিয়ে যাওয়া যায় না। গেলেও তার জন্য অনেক বেশী ভাড়া দিতে হয়। তাই বিমানযাত্রীদের মালপত্র যাতে মাথা পিছু ৩০ কেজির বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হজ যাত্রীগণ যে ট্রাঙ্ক বা সুটকেশ নেবেন তার উপর পরিষ্কার করে নিজের নাম ঠিকানা দেশ ও রাজ্যের নাম ইংরেজিতে লিখে নিতে হবে। যাঁরা ইংরাজী পড়তে জানেন না তাঁরা ইংরাজীর সঙ্গে নিজ নিজ মাতৃভাষাতেও নাম লিখে রাখবেন যাতে নিজের বাক্স চিনে নিতে পারেন। বাক্সের সাইজ বড় হলে তা জলজাহাজের ডেকের নীচে রাখার নিয়ম। তাই সমুদ্রপথের যাত্রীদের বাক্সের জন্য মাঝারি রকম নাইলন দড়ির জাল তৈরী করা দরকার। জালটি এমন ভাবে করতে হবে যেন বাক্সের ঢাকনা খুলতে অসুবিধা না হয়। প্রয়োজনে বাক্স খুলে আবার বন্ধ করে জালের মুখ সেলাই করে দেওয়া যায় তেমন করে তৈরী করতে হবে। কারণ জাহাজে ক্রেনের সাহায্যে মাল ওঠানো নামান হয়। বহু ক্ষেত্রে বাক্স ভেঙে যায়। তেমন হলে জিনিসপত্র যাতে নষ্ট না হয় এবং জালের মধ্যে থেকে যায় সেজন্যই জালের ব্যবস্থা করা দরকার।

হজের প্রস্তুতি বেশ বিরাট ব্যাপার। সবার উপরে আছে সঠিক ভাবে হজ সম্পন্ন করার জন্য পড়াশোনা। তাই অন্ততঃ বছরখানেক আগে থেকে হজের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ করতে পারলেই হজ প্রকৃত অর্থে সার্থক হয়। তাই কারো কোন জিনিস পত্র এনে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া অনুচিত।

হজের প্রয়োজনীয় বইপত্র একাধিক নেওয়া উচিত। কোনকারণে একটি

বই হারিয়ে গেলে যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয় সেজন্যই সতর্কতার দরকার। এইভাবে প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে সতর্ক ও সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

খ. দায়দায়িত্ব বিষয় করণীয়

জিনিসপত্র যোগাড় করে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশুদ্ধ নিয়তে তওবাহ করে দুরাকাত শোকরানার (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের) নামায পড়ে নিতে হবে। এবার কেবল একাগ্রভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে একনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করতে হবে। অতীতে নিজ কথা ও কাজের দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে। তা হয়ে থাকলে অকুণ্ঠচিত্তে সেই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারো কাছে ক্ষতিপূরণ বাকি থাকলে তা পূর্ণ করতে হবে এবং উক্ত লোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কোনরকম ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করে দিতে হবে। ঋণের মালিক না থাকলে তার অংশীদারদের কাছে ঐ ঋণ পরিশোধ করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারো কোন আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) থাকলে তা অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক এবং মালিক না থাকলে মালিকের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের ফেরৎ দিতে হবে। এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও হজ যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালন করতে না পারলে এই পুণ্যময় আরাধনার সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) একবার সাহাবীদের বললেন: "তোমরা কি জান নিঃস্ব দরিদ্র কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যাদের অর্থ ধনদৌলত নেই তারাই নিঃস্ব দরিদ্র। প্রিয় নবী বললেন, না গরীব হলো ঐ লোক যে প্রচুর পরিমাণে নামায, রোযা, সাদকা, দান-ধ্যান ইত্যাদি নিয়ে কেয়ামতের দিন হাজির হবে। কিন্তু পৃথিবীতে যাকে গালাগালি করেছিল, যার নামে অপবাদ দিয়েছিল, যার মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল তারা সকলে মিলে ঐ ব্যক্তির সমূহ পুণ্যফলকে নিজেরা ভাগবণ্টন করে নেবে। আর তাদের পাপসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ঐ ব্যক্তি হলো প্রকৃত নিঃস্ব দরিদ্র।"

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন, "মানইজ্জত নষ্ট করে বা অন্য কোনভাবে যদি অপরের ক্ষতি করা হয়ে থাকে তবে দুনিয়াতে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। যেদিন কারো কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না, শুধু নেক

আমল দিয়েই তার জুলুম অন্যায় ইত্যাদির প্রতিদান আদায় করে দেওয়া হবে। কোন নেক আমল না থাকলে অত্যাচারিতের যাবতীয় গোনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই সেদিন আসার আগেই একাজ করে নিতে হবে।

মেশকাত শরীফে একটি হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে যে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) সূর্যগ্রহণের নামায পড়ছিলেন। সেই সময় তাঁর সামনে বেহেশত ও দোযখের অবস্থা প্রকাশ পেল। রাসূলুল্লাহ দেখলেন, জাহান্নামে একজন স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এইজন্য যে ঐ স্ত্রীলোকটি পৃথিবীতে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল এবং তার খাবার ব্যাপারে কোন খেয়াল করেনি। অর্থাৎ তাকে খেতেও দেয়নি আর স্বাধীনভাবে খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি।

সুতরাং এহেন পুণ্য কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করার পূর্বেই কারো প্রতি কোনরকম অন্যায় আচরণ হয়ে থাকলে, কারো কোন সম্পদ ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করে থাকলে বা কারো উপর কোন অত্যাচার করে থাকলে সেজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। এর দ্বারা নিজ অন্তর্দ্বন্দ্বে সফলতা অর্জিত হবে সেই সঙ্গে 'হজ্জে মাবরুর' (গৃহীত হজ) অর্জিত হবে। পবিত্র কোরআনে আছে, "নিজ আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করাই হলো প্রকৃত জেহাদ।"

এইভাবে অতীত জীবনের সকল প্রকার গোনাহ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্বগুলির সমাধা করতে হবে। হজে গিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত যাদের ভরণপোষণ দরকার তাদের সে বিষয়ে সুব্যবস্থা করতে হবে। নিজের স্ত্রী কন্যা পুত্রদের বিষয় যা যা হক আদায় বাকি তার সুব্যবস্থা করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. আত্মীয় বন্ধু পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

হজে যাত্রার আগে আত্মীয় পরিজন ও পরিচিতদের সঙ্গে মিলন ও সাক্ষাৎকার অবশ্যকরণীয়। তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁদেরকেও আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে বলা প্রয়োজন। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দেখা সাক্ষাৎ করে বিদায় নেওয়ার সময় পড়তে হবে—"আসতাওদেউল-লাহা দ্বীনাকা অ আমানাতাকা অ খাওয়াতেমা আমালেকা" অর্থাৎ তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তোমার কর্মের ফল আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করছি।

এই প্রসঙ্গে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র সেটি যে কত অসম্মানকর তা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়ার দিন এক অকল্পনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। চরম বিশৃঙ্খলা ও ধাক্কাধাক্কিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। আল্লাহ্‌র স্মরণ তো দূরের কথা চরম ঝগড়া বিবাদ, অশান্তি শুরু হয়ে যায়। ঐ সময় হাওড়া ষ্টেশনের অন্য সম্প্রদায়ের অসংখ্য যাত্রীগণের চোখে বিষয়টি একটি হাস্যকর বিদ্রূপের বিষয় বলে মনে হয়। এহেন একটি মহৎ কাজের জন্য যাঁরা যাত্রা করছেন তাঁদের দেখে কোথায় সকলে আকৃষ্ট হবেন, কোথায় শ্রদ্ধায় অবনত হবেন—তার পরিবর্তে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় সবার মনে। কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ত এতে আনন্দ পান কিন্তু যাঁরা মহান ব্রত, সুবৃহৎ দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বপালকের দরবারে চলেছেন —তাঁদের হয়ে যায় অপূরণীয় ক্ষতি। সে ক্ষতি শুধু পার্থিব নয়, পারলৌকিক ক্ষতিও। কারণ তাঁরা অসংখ্য মানুষের দারুণ কষ্ট ও দুর্ভোগের কারণ হচ্ছেন। তাঁদের হজ যাত্রাই অন্য যাত্রীর অশেষ কষ্টের কারণ হচ্ছে। অথচ এই ঘটনার কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাই যাতে এই কুৎসিৎ দৃশ্য ও ঘটনার অবকাশ না ঘটে সেজন্য প্রত্যেক হজযাত্রীকে সচেষ্ট হতে হবে। প্রত্যেক হজ যাত্রীকেই সর্বত্র এমন আচরণ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অন্যের কাছে ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শকে তুলে ধরে ও আকৃষ্ট করে। ইসলামের প্রতিটি কাজ প্রশংসার যোগ্য হয়। যাত্রার আগেই সকল আত্মীয় বন্ধু পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সেরে নিতে হবে। সেই সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে যাতে কেউ না আসেন সে ব্যাপারে প্রত্যেককে আগে থেকে সতর্ক করে দিতে হবে। তা না পারলে জীবনের শ্রেষ্ঠ এবাদাতের (আরাধনার) জন্য যাত্রা শুরুর শুভ লগ্নেই এক ঘোরতর অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী হতে যেতে হবে। হাজার হাজার মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে যেতে হবে। ইসলামের সুশৃঙ্খল, সুসংহত আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

দূর ও নিকট সকল আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার কাজ শেষ করে একটি দিন সম্পূর্ণভাবে রাখা উচিত নিজ গ্রাম বা বসবাসের এলাকার মানুষদের জন্য। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সালাম বিনিময় করে তাঁদেরকে দোওয়া করতে অনুরোধ জানাতে হবে। ধর্মবিশারদ ও অলি ব্যক্তিগণ বলেছেন,— "হজে যাওয়ার সময় নিজে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে আর হজ থেকে ফিরে এলে অন্যেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।" এমনকি হাজি বাড়ী পোঁছানোর

আগেই তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে দোওয়া প্রার্থনা করা দরকার। কারণ হাদিস শরীফে আছে—"হাজি সাহেব বাড়ী না পৌছান পর্যন্ত তাঁর দোওয়া কবুল হতে থাকে।" এবার থেকে প্রত্যেক সালাতের (জায়নামাযে) মোসাল্লায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে হবে, "ওগো দয়াময় আল্লাহ্! তুমিই আমার লক্ষ্যস্থল, তুমিই আমার উদ্দেশ্য এবং তুমিই আমার ভরসাস্থল। ওগো প্রভু! যে সকল বিষয় আমি চিন্তা ও চেষ্টা করি তাতে তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর যা চিন্তাও করতে পারি না তাতেও তুমি আমাকে সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। হে আল্লাহ্! সর্বত্র ধর্মীয় বিধানের সীমা রক্ষা করে চলার ক্ষমতা দান কর। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দরবার সহ পবিত্রভূমিতে তোমার দরবারে শুধু তোমার উদ্দেশ্যে হাজির হওয়ার ক্ষমতা দান কর। আমার যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দাও। তোমার দরবারে এই আমার কাতর মিনতি। আমিন!"

দ্বিতীয় অধ্যায়

তীর্থভূমি আরবের পরিচয়

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। আয়তনে ১২ লক্ষ বর্গমাইলের কিছু বেশী। এই উপদ্বীপের উত্তরে ব্যাবিলন, সিরিয়া ও সুয়েজ যোজক ; উত্তর পূর্বে তাইগ্রিস নদী, পূর্বে পারস্য ও ওমান উপসাগর এবং আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। এই বিশাল উপদ্বীপের এক তৃতীয়াংশই মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল। তার মধ্যে উত্তর পশ্চিমাংশ শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চল।

ভূতত্ত্ববিদগণের ধারণায় পৃথিবীর বেশীর ভাগ উপদ্বীপই সাগর, নদনদী থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই ইউফ্রেটিস নদী, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর দ্বারা সুবৃহৎ আরব উপদ্বীপের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচীনকালে যে সময় সমগ্র পৃথিবীতে নানা উত্থান পতন

চলছিল, নানা জাতির বিলুপ্তি ও আবির্ভাব ঘটছিল তখন এই আরব দেশও আক্রান্ত হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু এর স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসীগণ বারবার বিতাড়িত করেছে আক্রমণকারীদের—রক্ষা করেছে নিজেদের স্বাধীনতাকে। দেশকে রেখেছে অপরিবর্তনীয়, ভ্রমণশীল জাতির কোন চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেনি বিশ্বের এই পরিবর্তনের তরঙ্গে।

'আরব' নামটির আদি বিবরণ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। পয়গম্বর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে হিব্রু ভাষায় 'আরাবা' নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ আছে। হিব্রু ভাষায় 'আরাবা' শব্দের অর্থ মরুভূমি। আরাবা শব্দের বহুবচন 'আরাবাহ' শব্দ দ্বারা সমগ্র আরবভূমিকে বোঝায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন তাহামা প্রদেশে আরাবা নামে একটি শহর ছিল, তা থেকেই সমগ্র উপদ্বীপের নাম হয়েছে আরব। আবার 'আরব' শব্দ বাকপটু, বাগ্মী ও স্পষ্টভাষী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সেজন্য ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা আরব উপাধি ধারণ করে। আজও আরবরা আরব ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের লোককেই 'আজম' বা আজমী অর্থাৎ মূক ও অস্পষ্টভাষী বলে অভিহিত করেন এই আরব উপত্যকার আরাফাত নামক মরুপ্রান্তরেই আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়ার সাক্ষাৎকার ঘটান। তওরাত গ্রন্থে দেখা যায় আরব দেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন কেনান রাজ্য। গ্রীসগণ এই কেনান রাজ্যকেই ফিনিশিয়া এবং খ্রীষ্টানগণ প্যালেস্টাইন বা ফিলিসতিন বলে উল্লেখ করতেন।

গোটা আরবভূমিই প্রস্তরময় পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমি। ভৌগোলিকগণ এই আরব উপদ্বীপ বা জাজিরাতুল আরবকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছেন। তাদের মধ্যে হেজাজ প্রদেশে জেদ্দা বন্দর, প্রসিদ্ধ মক্কা ও প্রাচীন শহর মদিনা অবস্থিত। এই অঞ্চলটি আরবের পশ্চিমাংশে লোহিত সাগর ও উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। জেদ্দা বন্দর এবং তায়েফ নগরীও এই প্রদেশের অন্তর্গত। উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে হল ইয়েমেন প্রদেশ। হাজরা মাউত ও আহকাফ এই প্রদেশেই অবস্থিত। ইয়েমেন ছিল সমগ্র আরবদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে সর্বাধুনিক উর্বর প্রদেশ। তাছাড়া প্রাচীন যুগে এটাই ছিল মূল্যবান রত্ন ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। হাজরামাউত ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল। এই প্রদেশের প্রধান নগর সান্আ, এডেন ও নাজরান। আরবের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ওমান সাগরের সঙ্গেই ওমান

প্রদেশ। এই প্রদেশের প্রধান নগর ও শহর মস্কট। পারস্য উপসাগর ও হেজাজের পাহাড়শ্রেণীর মধ্যেকার মালভূমি হল নেজদ। এর উচ্চতা ৪০০০ ফুট। ওমানের উত্তরে মণিমুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ নগরী হলো বাহরাইন। মদিনার উত্তরে প্রাচীন সামুদ জাতির বাসস্থান হিজর এবং ইহুদী প্রধান খাইবার অঞ্চল। গোটা আরব উপত্যকার আবহাওয়া শুষ্ক। হেজাজের শুষ্ক ভূমির পূর্বে উর্বর শস্যক্ষেত্ররাজিপূর্ণ বৃক্ষচ্ছায়াশীতল তায়েফ অঞ্চল এই হেজাজেরই অন্তর্গত। এখানে আপেল, ডুমুর, দাড়িম্ব, পীচ, দ্রাক্ষা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বর্তমানে এখানে সবরকম সব্জি জন্মায়।

এই হেজাজ প্রদেশেরই অল্পবিস্তর ভৌগোলিক পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে সাউদী আরব নামকরণ হয়েছে। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর বর্তমান সাউদী আরবেরই প্রধান দুটি শহর।

আরবগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। কাআবাগৃহ সকল গোষ্ঠীর কাছেই আল্লাহ্‌র ঘর বলে পৃথিবীর শুরু থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীই কাআবাঘরকে মান্য করত। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা সকলেই এখানে উপস্থিত হত। প্রত্যেক গোষ্ঠীই কাআবাঘরকে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) ও উপাসনা করত এবং তারা স্ব স্ব গোষ্ঠীর নিয়ম অনুসারে কোরবাণী করত। এই সকল প্রার্থনা ও উপাসনা পরিচালনার ভার থাকত বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উপর। সেই সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে কোরায়েশ বলে খ্যাত হয়।

পবিত্র মক্কা শহরকে অনেকেই পৃথিবীর নাভিস্থল বা উম্মুলকোবা বলে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনে এই শহরের নাম বাক্কা বলে উল্লিখিত হয়েছে। মদিনা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এ শহরের দূরত্ব ৪৩৪·৪৩ কিমি. এবং লোহিত সাগরের তীরবর্তী জেদ্দা বন্দর থেকে দূরত্ব ৯৬·৫৪ কিমি.। জেদ্দায় মানবের আদি পিতা হযরত আদমের সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার সমাধি রয়েছে। কলকাতা থেকে পশ্চিমে এই শহরের দূরত্ব তিন হাজার চল্লিশ মাইল বা ৪৮৬৭·০৬ কিমি.। মক্কা শহরের পূর্বদিকে মাত্র ১৯·৩১ কিমি. দূরে আরাফাত ময়দান। হযরত আদম ও হযরত হাওয়া জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এই প্রান্তরে প্রথম পরস্পর মিলিত হন। এরপর তাঁরা তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস-এর মধ্যস্থলে ব্যাবিলনে বসবাস করেন কিন্তু প্রতি বছর এই পাহাড়ে এসে আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন। সেই থেকে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আজও হজ্জব্রত সমাধা হয়ে আসছে। একটা নির্দিষ্ট সময় হাজি-গণকে এই আরাফাত প্রান্তরে উপস্থিত হতে হয়।

পৃথিবীর বুকে মানবের আগমন

সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে নানা ধারণার প্রচলন আছে। বিজ্ঞানীগণের কল্প আবিষ্কার অনুসারে মানুষ বানর থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আকার আকৃতি পেয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞান এই কষ্টকল্পিত আবিষ্কারকে কোনভাবেই গ্রহণ করে না। বরং এর অসারতা প্রমাণের পর ইসলামী বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্বস্রষ্টার এক সৃষ্টি রহস্য বলে ঘোষণা করেছে।

সাধারণ বুদ্ধিতেও এটি প্রতীয়মান হয় যে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর বিবর্তনের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকলে সেই প্রাণীটিও বর্তমানে রইল কি করে? আর আজকের পৃথিবীতেই বা তা ঘটে না কেন? লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে ভাবে বানর জাতীয় প্রাণীটির বিবর্তন হয়ে মানুষ আকৃতি পেল, আজ সেই বানরগোষ্ঠীর বিবর্তন হচ্ছে না কেন। কেন যুগ যুগ ধরে মানুষের সৃষ্টি কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত। তাছাড়া আধুনিক যুগের বিজ্ঞান সর্বশক্তি নিয়োগেও কি কোন বানর জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠীকে বিবর্তন দ্বারা মানুষে পরিবর্তন করতে পারে? এগুলোর কোনটাই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কষ্টকল্পিত ব্যাপার। একজন প্রকৃত মুসলমানের এ ধরনের সৃষ্টির ইতিহাসে বিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়। এই বিতর্কিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্যে আস্থাশীল হতে হবে। আর মানবসৃষ্টি সম্পর্কে সেটাই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় বলে মেনে নিয়ে বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশলের প্রথম সৃষ্ট মানুষ ছিলেন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রথম প্রতিনিধি বা নবী। মহান আল্লাহ্ তাঁর অভূতপূর্ব সৃষ্টিকৌশল দ্বারা মাটি থেকে প্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাঁরই শরীরের এক অংশ দ্বারা অভূতপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের সাহায্যে তাঁর সঙ্গিনী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর তা থেকেই পৃথিবীর মাটিতে এত বড় মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সৌরজগৎ, পৃথিবী আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ভূমণ্ডলে স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা ফেরেশতাদের (দেবদূত) জানালেন। কোরআনের সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে (শ্লোকে) মহান

আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন : "স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ-তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে আর রক্তপাত করবে ? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন আমি জানি, যা তোমরা জাননা। (১ : ৩০)

পবিত্র কোরআনের সূরা হিজর-এর ১৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন—"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে " আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতায় ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করার সক্ষমতা ও সামর্থ্য সঞ্চার করেছেন। যে শক্তি দিয়ে মানুষ সৌরজগৎ, পৃথিবী, সমুদ্রের সুগভীর তলদেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন, "সমুদ্রের তলদেশের নিম্নস্তরে অগ্নি রয়েছে।" বর্তমান যুগে বিজ্ঞান প্রমাণ করছে সমুদ্রতলে আগ্নেয়গিরি ও তেল সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে।

মেশকাত শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্ আদমকে যে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন সে মাটি ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। যার মধ্যে লাল, সাদা, কালো নরম, শক্ত, মন্দ, ভাল সবরকমের মাটি ছিল। সেজন্য মানুষ সাদা, কালো, নরম, শক্ত ইত্যাদি শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্ আদম (আ:)-কে তাঁর দৈহিক গঠন ও আকারের উপরই সৃষ্টি করেছিলেন (সৃষ্টি ও জন্মের প্রথম) তাঁর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা ছিল ষাট (৬০) হাত।"

সৃষ্ট জীব সমূহের জন্মপদ্ধতি হলো অতি ক্ষুদ্রাকারে জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর সম্পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু হযরত আদমের জন্মবৃত্তান্ত ছিল ভিন্নরূপ। তিনি ষাট (৬০) হাত দীর্ঘ ও সাত (৭) হাত প্রস্থ দৈহিক আকার নিয়ে জন্মলাভ করেছিলেন। এই পার্থক্যের বিজ্ঞানও সুস্পষ্ট। সকল জীবই মাতৃগর্ভে কিংবা ডিমের মধ্যে জন্ম নেয়। কিন্তু আদম (আ:)-এর সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়। পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ই-ইমরানের ৫৯-৬০ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, "তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সুতরাং

সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা” অর্থাৎ শুকনো মাটি দ্বারা তৈরী করে তাঁর মধ্যে আত্মার সঞ্চার করেছেন। পবিত্র কোরআনের সুরা হেজর-এর ২৯নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে “যখন আমি ওকে (আদম) সুঠাম করব এবং ওতে আমার রূহ (আত্মা)[১] সঞ্চার করব তখন তোমরা (ফেরেশতা) ওর প্রতি সেজদাবনত হয়ো।” একমাত্র ইবলিস ছাড়া সব ফেরেশতাই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সেজদা করে সম্মান প্রদর্শন করেন।

আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাঁকে বেহেশতে রাখার ইচ্ছা করেন। বেহেশতে আদম-এর নিজস্ব কোন সঙ্গী নেই তাই আল্লাহ্ তাঁর এই অভাব দূর করে তাঁর জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টির ব্যবস্থা করলেন। এক সময় হযরত আদম গভীর নিদ্রামগ্ন। আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব কুদরত (প্রক্রিয়া) বলে আদমের পাঁজরের উর্ধ্বভাগের একখানা হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে আদমের চিরসঙ্গিনী করে দিলেন—যাতে আদম তাঁর সঙ্গলাভে শান্তি ও সুখভোগী হন। পবিত্র কোরআনের সুরা নেসার প্রথম আয়াতে (শ্লোকে) আছে, “হে মানব তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর যিনি তা থেকে তার সাঙ্গনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে (পৃথিবীতে)[২] বহু নরনারী বিস্তার করেন।” সুরা আ'রাফ এর ১৮৯ আয়াতে (শ্লোকে) বলেছেন, “তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।” এ ছাড়া অন্যত্র আছে “আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তা থেকেই তার জোড়াকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তাদের উভয় থেকে তাদের বংশধর সৃষ্টি করেছেন।

এইভাবে মানুষের শান্তিলাভের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তাঁর জীবনসঙ্গিনী নারী। তাই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন “নারীদের সঙ্গে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার অবলম্বন সম্পর্কে আমার উপদেশ পরামর্শ ও আদেশ তোমরা রক্ষা করে চলো।”

---

১. রূহঃজীবের ক্ষেত্রে রূহ অর্থ হলো আত্মা আর আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো আদেশ।

২. পৃথিবী শব্দটি মূল আরবীতে নেই, এখানে পৃথিবীতে বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোসলেম শরীফের হাদিসে উল্লেখ আছে "বিশ্বাসী স্বামী বিশ্বাসী স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী হবে না।" স্ত্রীর কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট পেলেও পুনঃ তার দ্বারাই এমন ব্যবহার পাবে যাতে সন্তুষ্টি লাভ করবে। হযরত হাওয়ার সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহতাআলা হযরত আদমের সঙ্গীর অভাব দূর করে দিলেন। তাঁদের তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে জান্নাতে[১] বসবাস করার পরামর্শ দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব যাতে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে যায় তাই সতর্ক করে দিলেন এবং তার স্রষ্টার প্রতি সদা অনুগত থাকার জন্য একটি মাত্র শর্ত আরোপ করলেন। মানব স্রষ্টা আল্লাহ্ বললেন, "তোমরা জান্নাতের উদ্যানে সর্বত্র যাতায়াত করবে, যে কোন ফলমূল ভক্ষণ করবে কিন্তু ঐ একটি গাছের কাছে যাবে না ও তার ফল মুখে দেবেনা। এ তোমার প্রভুর নির্দেশ। ঐ বৃক্ষের সান্নিধ্যে গেলেই তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আরও স্মরণ রেখো ইবলিস (শয়তান) তোমাদের পরম শত্রু। সে সর্বদা তোমাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় রত। পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ৩৫ নং শ্লোকে আছে, "এবং আমি বললাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যখন ও যেখানে ইচ্ছা আহার কর কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলেই তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" এছাড়া সুরা তাহার সপ্তম ছত্রের ১১৬, ১১৭ নং আয়াতে (শ্লোকে) বর্ণিত হয়েছে, "স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাদের বললাম আদমের প্রতি নত হও তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই নত হলো, সে অমান্য করল। অতঃপর আমি বললাম, হে আদম এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে।" ঐ একই সুরায় একই রুকুর (অনুচ্ছেদের) ১২০, ১২১নং আয়াতে (শ্লোকে) আছে "অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, হে আদম আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনদায়ী বৃক্ষের কথা আর অক্ষয় রাজ্যের কথা ?" "অতঃপর তারা উভয়েই ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো" ১২২নং আয়াতে (শ্লোকে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ নেমে এলো আদমের জান্নাতের জীবনে। তিনি বললেন, "তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই

১. অর্থ স্বর্গোদ্যান

সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে তার জীবনের ভোগ সম্ভার হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।"

হযরত আদম ও হাওয়া এইভাবে ইবলিসের দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্যকারীর শাস্তি পেলেন। নেমে এলেন ধরণীর মাটিতে। আমরা সেই আদম থেকেই বংশপরম্পরায় বর্ধিত হয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছি।

হযরত আদম স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলেন। অনুতাপে জর্জরিত হয়ে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের আশায় পাহাড় পর্বত সংকুল মরুপ্রান্তরে ঘুরতে লাগলেন। শুধু একটু আশা বিশ্বপালক যদি এ অপরাধ ক্ষমা করেন। এ সম্পর্কে সাহাবী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, "আদম ও হাওয়া নিজেদের ভুলের জন্য দীর্ঘ তুশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করেছিলেন।" (রুহুল মায়ানী)

আল্লাহ্‌তাআলা এইভাবে পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। আদম পৃথিবীর মাটিতে প্রথম খলিফা বা নবী হয়ে জগৎ সংসারে অসংখ্য জীবনের সঙ্গে মিশে গেলেন। দিনে দিনে পৃথিবী ভরে উঠল মানব মানবীতে। এই হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্যের অপূর্ব কৌশল।

বিশ্বের বুকে মানুষের সংখ্যা যত বাড়তে থাকল দিনে দিনে মানুষ তত দিগভ্রান্ত হতে থাকল, বিপথগামী হতে থাকল। ভুলে গেল তাদের চিরশত্রু শয়তান সর্বক্ষণ তাদের পিছনে কুমন্ত্রণা দাতা হিসাবে অবিরাম কাজ করে চলেছে।

এই বিপথগামী, পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে এক আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক জ্ঞানে তাঁর নির্দেশ মেনে আরাধনার আহ্বান জানাতে বারে বারে আল্লাহ্‌ পৃথিবীর বুকে তাঁর দূত পাঠালেন। এমনি দূত (নবী) যে সংখ্যায় কত তার সঠিক সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। অনেকে এক লক্ষ বা তুলক্ষ চব্বিশ হাজার বলেও উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এরকম অনেক নবী ও রাসুলের উল্লেখ আছে। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ নিয়ে মানুষকে সৎপথে আহ্বান জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য নবী হলেন হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ)

হযরত ইদ্রিস, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত ইব্রাহিম হযরত লূত, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত মুসা, হযরত শোয়ায়েব, হযরত ইউনুস, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত জাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত ঈশা (আঃ) এবং সর্বশেষ পয়গম্বর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এঁরা ছাড়াও যে নবী বা রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন তা কোরআনের ভাষাতেই স্পষ্ট। সুরা আল মুমিন-এর অষ্টম রুকুর (অনুচ্ছেদের) ৭৮নং আয়াতে (শ্লোকে) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয়েছে "এবং অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম ; তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে—ন্যায়সংগত ভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ যাবে।"

এইভাবে যুগে যুগে যে সকল নবী পয়গম্বর পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁরা যে সত্য ও খাঁটি এ বিশ্বাস করা ইসলামের একটি অঙ্গ। তাই সংখ্যার বিতর্কে না গিয়ে একান্ত ভাবে আস্থাশীল হতে হবে এবং গভীর ভাবে বিশ্বাসী হতে হবে যে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে যত পয়গম্বর পাঠিয়েছেন তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত সত্য ধর্মবাহক অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষ। তাঁরা যাবতীয় পাপ ও অন্যায় থেকে মুক্ত ছিলেন। এই বিশ্বাসে প্রতিটি মুসলমানকে সুদৃঢ় হতে হবে।

এই সকল পয়গম্বরের উপর বিভিন্ন সময় ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান চারটি ঐশীগ্রন্থ হলো তৌরাত, জবুর, ইনজিল ও সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ কোরআন। পৃথিবীতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী রাসূল আসবেন না এবং আর কোন ঐশীগ্রন্থও অবতীর্ণ হবে না।

হজ যাত্রা শুরু হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই। তিনিই প্রথম জান্নাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা শুরু করেন মক্কা থেকে ১৯.৩১ কিলোমিটার দূরে আরাফাত প্রান্তরের জাবালে রহমতের চূড়ায়। সেখানেই তিনি আল্লাহ্‌রই শেখানো ক্ষমাবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করে ক্ষমা লাভ করেন। পরবর্তীকালে আদম ও হাওয়া যখন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী

ব্যাবিলনে বসবাস করতেন তখনও তাঁরা মাঝে মাঝে সেই মিলনস্থানে[১] গিয়ে আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন। এ থেকেই ৯ই যিলহজ তারিখে হজব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মাসে আরবের যুদ্ধপ্রিয় জাতিরাও হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করত।

এরপর সকল নবীগণের সময় হজ প্রচলিত থাকে। হযরত ইব্রাহিমের সময় জগৎবাসীকে হজের আহ্বান জানানো হয় এবং হযরত মোহাম্মাদ (সা:)-এর সময় কালে নবম হিজরীতে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানের জন্য হজ করা ফরজ (বাধ্যতামূলক) হয়।

মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এই বরকতময় ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের পূর্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব অপরিমেয়। মানুষের প্রতিপালক যুগে যুগে এখানে লক্ষ কোটি মানুষের কাতর প্রার্থনা শুনেছেন তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে তাদের নিষ্পাপ শুচিসুন্দর জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন। এই শিক্ষার গভীরতা অনুভব করেই হজের অনুষ্ঠানে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে ইসলামের কোন আরাধনাই (এবাদাত) অনুষ্ঠান সর্বস্ব, বহিরঙ্গীন নয়। সবটাই হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপার।

---

১. হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহেস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে জান্নাত থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন থেকেই দিশেহারা হয়ে পরস্পর পরস্পরকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। দীর্ঘদিন পর বর্তমান সৌদি আরবের অন্তর্গত 'আরাফা' ময়দানে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে এবং একে অপরকে চিনতে পারেন। তাই এই জায়গা তখন থেকেই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

পৃথিবীর প্রথম প্রার্থনাগৃহ কাআবা

হযরত ইব্রাহিম আলায়হেস সালামের কাআবাঘর সংস্কার ও পুনর্নিমাণ

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের সুরা আল-এমরানের ৯৫ আয়াতে (ছত্রে) বলেছেন: মানবজাতির (উপাসনার) জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতো বাক্কায় (মক্কায়)*, ওটি আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক।"

পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি মক্কা শহরে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ঘর। পৃথিবীর আদিকালে বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে এই ধরণীর বুকে নিক্ষিপ্ত হন। আদম (আঃ) দুঃখকষ্টের মধ্যে বিচরণকালে আল্লাহ্‌র দরবারে এক কাতর প্রার্থনা করেন,—"হে আল্লাহ্ আমি নিজের আত্মার উপর নিজে ক্ষতি করেছি তোমার আদেশ অমান্য করে। হে আমার পালয়িতা প্রভু! তুমি পবিত্র, মহান, তুমি সকল প্রশংসার যোগ্য। হে ক্ষমাশীল আল্লাহ্ আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার অবাধ্য হয়ে বায়তুল মামুরে তোমার ফেরেশতাগণের সঙ্গে তাওয়াফ ও এবাদাত থেকে বঞ্চিত হলাম।" হযরতের অনুরূপ বিলাপ ও ক্ষমা ভিক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে করুণাময় আল্লাহ্ বললেন: "আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ো না।" আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত আদম কাআবাঘর প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা শুরু করেন। আল্লাহ্‌র আরশে যেমন বায়তুল মামুর বিদ্যমান তেমনি তারই ছায়াতলে তোমার ও তোমার পরবর্তী সন্তানদের জন্য এবাদতগাহ্ করা হলো এই বায়তুল্লাহ্ বা কাআবাঘরকে। এই গৃহকে তাওয়াফ করলে মানুষ বায়তুল মামুরে ফেরেস্তাগণের তাওয়াফের মর্যাদাই পাবে।

হযরত আদম প্রতিষ্ঠিত কর্দমলিপ্ত কাআবাঘর হযরত নুহ (আঃ)-এর প্লাবনের সময় বিধ্বস্ত হয়। এই প্লাবনের ৩৭৯০ বছর পরে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র এক দূত হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাব হয় পৃথিবীর মানুষকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এই মহাপুরুষ হযরত ইব্রাহিমের

*: মক্কার অপর নাম বাক্কা।

জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে কাআবাঘর সংস্কার পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বায়তুল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণরূপে বোঝা ও হজ সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

প্রাচীন যুগে আরবের অধিবাসীরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: (১) মরুভ্রমণশীল আরবজাতি বা আরাবাল বায়দা। (২) আদিম আরব জাতি বা আরাবাল-আরেবা, আর (৩) আরাবাল মোস্তারিবা। শেষোক্ত জাতি-গোষ্ঠী এক সাধারণ বংশ থেকে উদ্ভূত। এই জাতিগোষ্ঠী অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি গোষ্ঠী বনু ইসমাইল বা ইসমাইলের বংশ বলে খ্যাত। এই গোষ্ঠীর লোকেরা বাবেল নামক দেশের অধিবাসী ছিল। এই সময় বাবেল দেশের রাজা ছিল নাস্তিক নমরূদ। রাজা নমরূদ তার রাজ্যের অধিবাসীদের নির্দেশ দেন—'হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা আমার প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাকে পূজা কর। আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। সকলেই রাজার আদেশ অনুসারে তার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করতে প্রবৃত্ত হলো। রাজা নমরূদের রাজ্যে আজর নামে একজন লোক বাস করতেন। তিনি রাজার মূর্তি নির্মাণকারী ছিলেন। তাই রাজা নমরূদ তাকে খুবই স্নেহ করতেন। রাজা নমরূদ দৈবজ্ঞের কাছ থেকে জানতে পারলেন তাঁর রাজ্যে শীঘ্রই এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন যিনি তাঁর ধর্ম ও রাজ্য দুই ধ্বংস করে দেবেন। তখন এই অহংকারী রাজা রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য এক নিষ্ঠুর আদেশ জারী করলেন: 'আমার রাজ্যের মধ্যে কোন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হতে পারবে না।' কিন্তু আজরের স্ত্রী আদনা এই আদেশ ভঙ্গ করে গর্ভবতী হন। আদনা অতি বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি প্রসবকাল আসার আগেই একটি সুবৃহৎ গর্ত খনন করে সেখানে প্রসূতির যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রাখেন। স্বামীর অজ্ঞাতসারে সেই গর্তে এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। গর্তের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ইব্রাহিমের মুখে কথা ফুটলো। তিনি একদিন জননীকে প্রশ্ন করলেন, মা আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? জননী আদনা উত্তর দিলেন—মহারাজ নমরূদ। শিশু ইব্রাহিম পুনরায় প্রশ্ন করলেন—মহারাজা নমরূদের সৃষ্টিকর্তা কে? মা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। আদনা শিশুপুত্রকে রাজধর্মদ্রোহী দেখে বিষণ্ণ বদনে স্বামী আজরের কাছে পুত্রের কথা জানালেন। জননী উত্তর দিতে না পারায় শিশু ইব্রাহিম পিতার কাছে একই প্রশ্ন রাখলেন,—পিতা

মহারাজা নমরূদের সৃষ্টিকর্তা কে? পিতাও যথারীতি নিরুত্তর রইলেন। কোরআনের সুরা আনআমের এর ৭৪ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "স্মরণ কর, ইব্রাহিম তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্ (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।" এমনই এক অমীমাংসিত প্রশ্ন বুকে নিয়ে বড় হতে থাকলেন ইব্রাহিম। ষোল বছর বয়সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একদিন কিশোর ইব্রাহিম গর্তের জীবন থেকে বাইরে আনীত হলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় (সুরা আন আমের ৭৫-৭৯) "এইভাবে আমি ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তমসাচ্ছন্ন হয়ে এল। অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাঁকে আচ্ছন্ন করল তিনি নক্ষত্র দেখে বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক। তারপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেন, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।" (৬ : ৭৬) "অতঃপর যখন তিনি চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালক। যখন তাও অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেন আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (৬ : ৭৭) "অতঃপর তিনি যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন তখন তিনি বললেন—এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ। যখন এটাও অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক (অংশী) কর তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। (৬ : ৭৮) এরপর কিশোর ইব্রাহিম বললেন: "আমি একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (কোরআন ৬ : ৭৯)

এইভাবে বিশ্বের বুকে আবার তৌহিদের বাণী প্রতিষ্ঠিত হলো কিশোর ইব্রাহিমের মাধ্যমে। কিশোর ইব্রাহিম হয়ে উঠলেন বিশ্বস্রষ্টার দূত হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। হযরত ইব্রাহিম নিজের পিতাকে বললেন. 'পিতা আপনি কি কারণে খোদিত প্রতিমূর্তিগুলিকে সৃষ্টিকর্তা বলে সম্মান করেন? আর খোদাতাআলার সৃষ্ট দেহকে কি কারণেই বা কাঠের পুত্তলিকার সামনে ভূলুণ্ঠিত করেন? যে আত্মা সত্য আল্লাহ্‌র আরাধনায় সন্তুষ্ট থাকে তাকেই বা কি কারণে জড় পদার্থ চন্দ্রসূর্যাদির উপাসনায় নিযুক্ত রেখেছেন? বাস্তবিকই আপনি ও লোকেরা ভ্রমে পতিত হয়েছেন।'

এইভাবে আল্লাহ্‌র বন্ধু হযরত ইব্রাহিম যখন এক আল্লাহ্‌র উপাসনার প্রচার শুরু করলেন তখন মহারাজা নমরূদ তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। তাঁকে হত্যা করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে যখন ব্যর্থ হলো তখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারার আয়োজন করল। কিন্তু তাতেও নমরূদ ব্যর্থ হলো। কোরআনের ভাষায়—"হে অগ্নি তুমি ইব্রাহিমের জন্য নিস্তেজ থাক এবং ইব্রাহিমকে দাহ করো না।" জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডও হযরত ইব্রাহিমকে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ দিল। এমনি করে নমরূদের হযরত ইব্রাহিমকে হত্যার সব চক্রান্তই ব্যর্থ হলো। এরপর হযরত ইব্রাহিম বাবেল নগর ছেড়ে অন্যত্র আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে মনস্থ করলেন। তাই তিনি মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন সারা বিবিকে। পথেই হযরত ইব্রাহিম সারা বিবিকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেলেন। তাঁরা মিশরে পৌছানর পর সেখানকার শাসনকর্তা সাধুকের সহযোগিতা পান। বহুকাল পর্যন্ত বিবি সারার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁর সম্মতিতে হযরত ইব্রাহিম হাজেরা নাম্নী এক নারীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই হাজেরার গর্ভেই হযরত ইসমাইলের জন্ম হয়। হযরত ইসমাইলের জন্মের অল্পদিন পরেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্র ইসমাইলসহ বিবি হাজেরাকে জলতৃণাদিশূন্য উত্তপ্ত পাথুরে মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়ে আসেন। তাঁদের দিয়ে আসেন এক মশক পানি আর সামান্য খোরমা। বিবি হাজেরা কাতরকণ্ঠে হযরত ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদের এই নির্জন মরুপ্রান্তরে নির্বাসন দিচ্ছেন?" হযরত ইব্রাহিম (আঃ) উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। বিবি হাজেরা আল্লাহ্‌র আদেশের কথা শুনে নীরব হলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে করুণা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে চললেন। সানিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি একবার মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানালেন,—"হে প্রভু আল্লাহ্। আপনার পবিত্র গৃহের[১] নিকট অনুর্বর উপত্যকায় আমার সন্তানকে বাস করার জন্য রেখে গেলাম।"

ধূ ধূ মরুপ্রান্তর, একাকিনী হাজেরা—কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু। চতুর্দিকে

১. এই বাক্যে স্পষ্ট হচ্ছে যে হযরত ইব্রাহিম ও মক্কায় পবিত্র গৃহ 'বায়তুল্লাহ' সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

তিনি অন্ধকার দেখতে লাগলেন। স্বামী প্রদত্ত খোরমা ও পানি ক্রমে শেষ হয়ে গেল। শিশু তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগল। বিবি হাজেরা পানির জন্য অস্থির হয়ে লোকালয়ের অন্বেষণ করার জন্য নিকটস্থ সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন: কিন্তু চতুর্দিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ও পুত্রের চিন্তায় তিনি পর্বত থেকে অবতরণ করলেন। পুনরায় মানুষের সন্ধানে মারওয়া পর্বতের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু পর্বতের উপরে আরোহণ করে চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে কোন জনমানবের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। আবার তিনি উর্ধ্বশ্বাসে মারওয়া থেকে সাফার দিকে ছুটলেন। এইভাবে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে সাতবার পাগলিনীর মত সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী পথ পরিক্রমা করলেন। যদি কোনভাবে ছোটশিশুর প্রাণরক্ষা করা যায় এই আশায় বুক বেঁধে। ইব্‌নে আব্বাস বলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে হজের সময় সাতবার গমনাগমনের রীতি বিবি হাজেরার ঐ গমনাগমনের স্মৃতিচারণের জন্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। শেষবার বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে একটি শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। পুনরায় শব্দটি শুনে বললেন,—"কেন আমাকে ডাকছ। পার তো সাহায্য কর।"

এরপর তিনি দিব্যচক্ষে দেখলেন এক স্বর্গীয় দূত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। উৎকণ্ঠায় তাঁর কণ্ঠ তখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোনক্রমে তাঁর কাছে নিজের বিপদের কথা কাতর কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন। দূত সব কিছু শুনে বললেন: 'হাজেরা তুমি দুঃখ বা ভয় পেও না। আল্লাহ্‌ তাআলা এই শিশুর কাতর কান্না শুনেছেন। ওঠ, শিশুকে কোলে তুলে নাও। মহান আল্লাহ্‌ তার দ্বারা এক মহাজাতি সৃষ্টি করবেন।'

কোরআনের এক আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-র একটি প্রার্থনা উক্ত হয়েছে, তা হলো: "হে বিশ্বপালক আমি তোমার পবিত্র গৃহের নিকটস্থ অনুর্বর স্থানে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করলাম।" হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাআবা নির্মাণের সময়েও অনুরূপ প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রার্থনাগুলি থেকে বোঝা যায় অনুর্বর স্থানে কাআবা ও মক্কানগরী স্থাপিত হয়েছিল।

বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। হযরত ইসমাইল বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন ও মক্কাশহরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) একদিন পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং জানালেন, "আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর উপাসনার জন্য আমাকে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে অনুমতি দিয়েছেন এবং

সেই কাজে তোমাকে সাহায্য করতে বলেছেন।" হযরত ইসমাইল (আঃ) সানন্দে পিতার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হযরত আদমের নির্মিত মসজিদের ভিত্তির উপর মসজিদ পুনর্নিমাণের কাজ শুরু করলেন। সে নির্মাণকাজ এক অপূর্ব ঐশ্বরিক মহিমায় মণ্ডিত। নূহ্ নবীর আমলে বন্যায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কাআবাঘরের স্থানটি হযরত ইব্রাহিমকে দেখিয়ে দিলেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)। কাআবাঘরের স্থান দেখার পর হযরত ইব্রাহিম চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই পাথুরে মাটিতে কোথায় পাবেন ইটপাথর যে গড়ে তুলবেন কাআবাঘর। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি জানতে পারলেন হযরত ইব্রাহিমের মনের কোণের চিন্তাটি। ওহী (দৈববাণী) মারফত তাঁকে জানিয়ে দিলেন,—"ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) পাঁচটি পাহাড় থেকে তাঁকে পাথর এনে দেবেন।" ফেরেশতা জিবরাঈল ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ লোনান, কোহেতুর, সিনা, সরঞ্জাম ও জিতান এই পাঁচটি পাহাড় থেকে কাআবাঘরের জন্য পাথর এনে যোগান দেন নবী হযরত ইব্রাহিমকে।

কাআবার ভিত মজবুত করার জন্য ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) সপ্ত স্তর পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে বড় বড় পাথর ফেলে কাআবার ভিত গাঁথেন। সেই ভিতের উপর হযরত ইব্রাহিম পাথর দিয়ে ইট তৈরী করে কাআবাঘর গড়ে তুললেন। পুত্র হযরত ইসমাইল দিতেন পাথর তুলে আর পিতা হযরত ইব্রাহিম একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে গাঁথতেন দেওয়াল। এইভাবে বুক পর্যন্ত দেওয়াল গাঁথা শেষ করে হযরত ইব্রাহিম পড়লেন মহা অসুবিধায়। আর তো নাগাল পাওয়া যায় না। তিনি পুত্র ইসমাইলকে একটি উঁচু পাথর সন্ধান করতে বললেন যাতে দাঁড়িয়ে তিনি বাকি দেওয়াল শেষ করতে পারেন। হযরত ইসমাইল কাছেই কয়েস পাহাড়ে গেলেন একটি উঁচু পাথরের সন্ধানে। সেখানে ফেরেশতা জিবরাঈল তাঁকে তিনটি স্বর্গীয় ক্ষমতাসম্পন্ন পাথরের কথা জানালেন। আরও জানালেন তার একটি আছে জেরুজালেমে। বাকি দুটি পাথর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে সে দুটি নিয়ে যেতে বললেন। হযরত আদম বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আসার সময় এই তিনখানি পাথর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। হযরত নূহনবীর প্লাবনের পর হযরত ইদ্রীস পাথর দুখানাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই কয়েস পাহাড়ে রাখেন। ফেরেশতা জিবরাঈল আরও বলে দিলেন একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহিম দেওয়াল গাঁথবেন আর একটি কাআবাঘরের দরজার ডানদিকের কোণে রাখবেন।

বর্তমানে ঐ পাথরটি কাআবাঘরের ডানদিকের কোণে আঁটা আছে। ওটিই হলো হযরে আসওয়াদ (কালো পাথর) হাজিগণকে ঐ পাথরে চুমা দিয়ে এই কোণ থেকেই কাআবাগৃহকে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ শুরু করতে হয়।

হযরত ইব্রাহিম (আ:) যে পাথরখানার উপর দাঁড়িয়ে কাআবাগৃহের দেওয়াল গাঁথতেন সেটি প্রয়োজন অনুযায়ী ওঠানামা করত। এই পাথরটিতে হযরত ইব্রাহিমের পদচিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে।

কাআবাশরীফের পূর্বদিকে মাকামে ইব্রাহিম নামক জায়গায় সে পাথরটি এখন সযত্নে রাখা আছে। বর্তমানে সৌদী সরকার সমস্ত রকম বেদআত (বর্জনীয় কাজ) থেকে পাথরটিকে রক্ষা করার জন্য কাঁচ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। হাজিগণ সেই পবিত্র পাথরখানাকে দেখতে পান।

কাআবাঘরের দেওয়ালের উচ্চতা যতটা হওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ঐ পাথর ততটাই উঁচু হয়েছিল। এইভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে হযরত ইসমাইলের সহায়তায় হযরত ইব্রাহিম কাআবাগৃহ গাঁথা শেষ করলেন। ইতিহাসবিদগণের মতে হযরত ঈসা (আ:) (যীশু)-র জন্মের উনিশশত বংসর পূর্বে এই গৃহ পুনঃনির্মিত হয়েছিল। তারপর তাঁরা পিতাপুত্র আল্লাহ-তাআলার নিকট প্রার্থনা জানালেন, "হে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌! এটা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যারা তোমার ঘর পরিদর্শনে (যিয়ারত) আসবে তারা ফলপানি ও খাদ্যের জন্য যেন কষ্ট না পায়।" আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করে আরবের এই পাহাড়ী অঞ্চলের কিছু অংশকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করলেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ দিলেন সিরিয়া এবং মিশর থেকে মাটি এনে মক্কার অনতিদূরে এক বিশাল এলাকাকে ফল-ফসল উৎপাদনের উপযোগী করার। তাই ফেরেশতা মিশর থেকে মাটি এনে কাআবাঘরকে সাতবার তাওয়াফ করে সেই মাটি ফেললেন ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে। তাওয়াফ করে মাটি ফেলে যে স্থান গড়ে উঠল তার নাম হলো তায়েফ। প্রখর রৌদ্রতাপদগ্ধ পাহাড়ী মরুর বুকে স্নিগ্ধ শান্ত শস্যশ্যামল চোখজুড়ানো সবুজের ঐশ্বর্য নিয়ে আজও তায়েফ মরুজীবনে স্নিগ্ধশীতল বারির মত বর্তমান। শুষ্ক পাহাড়ী মরুর বুকে এমনটি হয়েছে ঐশ্বরিক ইচ্ছায়। আল্লাহতাআলা পাহাড়ী মরুর কিছুটা শস্যশ্যামলা করে গড়ে তুলেছিলেন মানুষের মঙ্গলের জন্য।

হজরত ইব্রাহিম আল্লাহর দরবারে আরও প্রার্থনা করলেন, "হে রহমানুর

রহীম! তুমি সব কিছুই জানো, সব কিছুই শোনো। তোমার এই ঘরের মাহাত্ম্যে আমাদের, আর আমাদের সন্তান সন্ততিদের ঈমানদার করো। আমরা যেন তোমারই দ্বীনে (ধর্মে) তোমারই নির্দেশিত পথে চলতে পারি। পৃথিবীর কাদামাটির না-পাক পথে পিছলে না পড়ি।"

"হে প্রার্থনা কবুলকারী আল্লাহ্! আমাদের আওলাদদের (সন্তান সন্ততিদের) মধ্যে এমন একজন পূতঃপবিত্র চরিত্রের নবীপাঠিও যেন তিনি এসে তোমার ধর্ম, তোমার কিতাবকে পুর্ণতা দান করেন এবং তাঁর অন্তরে পবিত্র জ্যোতির এমন পুর্ণতা দান করো যা তোমার এ ঘরের মর্যাদা ও মহিমা বাড়িয়ে তোলে।"

মহান আল্লাহ্ তাঁর এ প্রার্থনাও কবুল করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) খৃঃ পূর্ব ১৯১০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিমের পরবর্তীকালে হযরত ইসমাইলই পৃথিবীতে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্র দূত মনোনীত হয়েছিলেন। বহু যুগ পরে হযরত ইসমাইলের দ্বাদশ পুরুষ আদনানের বংশ থেকে মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভাব ঘটে।

নবীভুমি আরবে পৌত্তলিকতা

বিশ্বের প্রথম মানব ও আল্লাহ্র প্রতিনিধি হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবভূমিতে অসংখ্য নবী বা পয়গম্বর এসেছেন। এঁরা সকলেই একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু কালক্রমে মানুষ আল্লাহ্র আদেশ ও নবীগণের উপদেশ ভুলে একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়। এমনি করে একে একে গোটা পৃথিবীর মানুষ এক তমসাচ্ছন্ন কুহেলিকাময় গভীর অন্ধকারে ডুবে যায় সেই সঙ্গে আরবভূমির অবস্থা হয় ততোধিক শোচনীয়।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল একেশ্বরবাদ। কিন্তু পৌত্তলিক সমাজের প্রভাবে এই সকল ধর্মাবলম্বীরা নরপূজারী হয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের নবীদের আল্লাহ্র পুত্র রূপে পূজা শুরু করে দেয়। ধর্মের

সকল অনুশাসন বিস্মৃত হয়ে নানা পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আরবের ইয়েমেন, কিন্দা, খাইবার, মদিনা ও দক্ষিণ অঞ্চলে ইহুদীরা এবং কিছু কিছু এলাকায় খৃষ্টানরা প্রভাব বিস্তার করে।

পারস্য দেশে অগ্নিউপাসকরা নিজেদের ধর্মমতের প্রচার শুরু করে। উত্তর আরবের কিছু অঞ্চল, মধ্য আরবের মক্কা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীরা ঘোর পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক গোত্রের পৃথক প্রতিমার প্রচলন হয়।

আরবের অধিবাসীরা মনে করতো বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্। আর তাঁর তিন কন্যা হলো আল উজ্জা, আল-লাৎ, আল-মানাৎ। তারা তাদের দেবতাদের কল্পনার প্রতিমা নির্মাণ করে প্রস্তরনির্মিত বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে। আল উজ্জা (সর্বশক্তিমান) প্রভাত তারকার দেবী। মক্কার পূর্ব দিকে নাখলা নামক স্থানে তিনটি বৃক্ষতলে তার বেদী নির্মিত হয়েছিল। পূজারীরা দেবীকে তুষ্ট করার জন্য নরবলি প্রথা চালু করে। আল-লাৎ উজ্জ্বল তারকার দেবী। তায়েফ অঞ্চলে এই দেবী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত এক বেদীমূলে অধিষ্ঠিত ছিল। ধর্মভীরু পৌত্তলিকরা এখানে পূজা ও বলিদানের জন্য মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এসে সমবেত হতো। আলমানাত হলো ভাগ্যদেবী। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী কোদায়েদ নামক স্থানে এই দেবীর মূর্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আওস ও খাজরাজ গোষ্ঠীর লোকজন এই দেবীর উপাসক ছিল।

মক্কার কাআবা গৃহের চত্বরেও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হোবল নামে এক বিশাল নরমূর্তি ছিল। তাকে বায়ু ও প্রেতের দেবতা বলে কল্পনা করা হতো। কাআবা গৃহ এলাকায় এরকম প্রায় ৩৬০টি দেবতার মূর্ত্তি ছিল। এক এক গোষ্ঠী এক একটি মূর্ত্তিকে বিশেষভাবে মানত।

এইভাবে গোটা আববভূমি পৌত্তলিকতার তমসায় আবৃত হয়ে পড়েছিল। বৃক্ষ, পশুপক্ষী, চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্রকে দেবতাজ্ঞানে পূজাঅর্চনা শুরু হয়। তারা নবীগণের প্রচারিত পারলৌকিক জীবনদর্শনের আদর্শ ভুলে গেল। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি এই মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আত্মার অবিনশ্বরতার তত্ত্বে তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। ফলস্বরূপ তারা নানা জাগতিক বিশৃঙ্খলায় ডুবে গেল। যুদ্ধ, খুন, নারীহরণ, ব্যভিচার, চুরিডাকাতি, ছলচাতুরি, মদ, জুয়া, শিশু হত্যা তাদের জীবনের নিত্যকর্মে পরিণত হলো। একই ভাবে পৃথিবীর দিকে দিকে পৌত্তলিকতা বাড়তে বাড়তে

জনজীবনে নেমে এলো চরম বিশৃঙ্খলা। একেশ্বরবাদের ধারণা প্রায় মুছে যেতে লাগল পৃথিবীর মাটি থেকে। শুরু হলো শাসন ও শোষণের রথচক্র। সমাজ ব্যবস্থা পড়ল ভেঙে। ধর্মগুরুরা সাধারণ মানুষকে অত্যাচার ও শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ করলেন। তাঁরা অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করতে লাগলেন। ধর্মীয় ও রাষ্ট্র নেতাগণ দাস-ব্যবসাকে বৈধ আকারে প্রচলন করলেন। দুর্বল মানুষগণকে এই সময় হীন প্রাণীর মত গণ্য করা হতো।

এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর কোন কোন প্রান্তে তখনও একেশ্বরবাদ আর নবীগণের উপদেশবাণী পালন করতেন এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ আরব অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিকে একেশ্বরবাদে আস্থাবান দেখা যেত। এইসব ব্যক্তিগণ 'হানিফ' বলে পরিচিত ছিলেন।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরব দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ প্রতি গোত্রের বিশেষ জনপদ ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা। আরবরা নিজ নিজ গোত্রের জন্য পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টি করেছিল। যাবতীয় কাজকর্ম লেনদেন নিজ নিজ গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত। ফলে আরব সংহতি দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় অন্য কোন সভ্যতার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। তবে আরবীয়রা মূলতঃ ছিল কবি। প্রায় প্রত্যেকেই তারা ছিল স্বভাবকবি। প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সাহিত্য তাদের কাব্যিক মনের অজস্র স্রোতধারায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম ছিল কাব্য প্রতিযোগিতার আসর। আবার কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে অনেকসময় যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হতো। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও অন্যান্য খেলাধূলাকে কেন্দ্র করেও দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহ চলত। এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ শুরু হলে তা বংশপরম্পরায় চলত।

এছাড়া আরবের জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার উদগ্র চেষ্টায় জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করে। কাআবা ঘরকে সব গোষ্ঠীই ধর্মস্থান হিসাবে মান্য করত এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মমন্দির বলে বিশ্বাস করত। বছরের নির্দিষ্ট দিনে কাআবা ঘরকে প্রদক্ষিণ, পূজা ও বলিদান করার জন্য সমবেত হতো। সব গোষ্ঠী একমত হয়ে কাআবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একটি

সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছিল। এইভাবে আরব জাতির মধ্যে পুরোহিত-তন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত আদ জাতি আরবে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে তারাও সত্যধর্ম বিস্মৃত হয়ে নানান অন্যায়, অবিচার ও কুপ্রথায় নিমজ্জিত হয়। তাদের সত্য পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ হযরত হুদ (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু আদ জাতি তাঁর ধর্মোপদেশে কর্ণপাত করল না। ফলে গোটা জাতিটি প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝা ও দুর্ভিক্ষে বিনষ্ট হয়। সামুদ জাতি তখনও পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসী ছিল কিন্তু সব দিক থেকে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিপথগামী হয়ে পড়ে। পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য নবী করে পাঠালেন সালেহ (আঃ)-কে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশতি শতকে কাহতান বংশের লোকেরা ইয়েমেন ও হাজরামাউতে বসতি গড়ে তোলে। এরাই ছিল আরবের দুটি গোষ্ঠী আওস খাজরাজদের পূর্বপুরুষ। অনেকের ধারণা এক পুত্র ইয়ারেবের নামানুসারেই এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছিল আরব। কাহতান গোষ্ঠী সম্পূর্ণ আরব দেশ জয় করে নিজেদের শাসনাধীনে এনেছিল।

পরবর্তীকালে আরবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরগণের শাসন কায়েম হয়। খৃষ্টপূর্ব ১৯:০ অব্দে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্ম হয়। তিনি মক্কার নিকটে বসতি গড়ে তোলেন ও সমগ্র হেজাজ প্রদেশকে নিজের শাসনাধীনে আনেন। তিনি আরবদের সৎজীবন-যাপনে অভ্যস্ত করেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর সাহায্যেই কাআবা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নেবুকাডনেজার ও রোমানদের দ্বারা বিতাড়িত ইহুদীরা আরবের সিরিয়া প্রান্তের বিশাল শস্যশ্যামল অংশ খায়বার অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। হযরত মূসা (আঃ) প্রচারিত তৌরাত গ্রন্থের বাণীকে বিকৃতি করেছিল যারা সেই ইহুদীদের ধর্মের কেন্দ্রস্থল তৈরী হলো মদিনা শহরের ১০০ মাইল দূরে খায়বার অঞ্চলে।

আরবরা প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক ও নক্ষত্রপূজক ছিল। এদের ধর্ম বলে কিছু ছিল না। মনগড়া কাল্পনিক দেবদেবীর পূজার মধ্যে ছিল তাদের আনন্দ। অনাচার, অত্যাচার ব্যভিচার, কন্যাবিক্রয়, নরহত্যা, কন্যাবধ, লুণ্ঠন,

যুদ্ধ বিগ্রহ, কলহ, মদ্যপান, জুয়াখেলা, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ছিল তাদের নিত্য জীবনের অঙ্গ। এই সময় আরবরা প্রায় ৩২টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকের ছিল একটি গোষ্ঠী দেবতা। সব গোষ্ঠীর সমবেত তীর্থক্ষেত্র কাআবা গৃহে ছিল ৩৬০টি প্রতিমা। এই কাআবা গৃহে অনুষ্ঠিত হতো নরবলি। এইভাবে আরব জাতি নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে প্রবেশ করে।

মধ্যযুগে আরব উপদ্বীপের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হলো বনু ইসমাইল বা বনু আদনান এবং বনু কাহতান বা বনু একতান। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর চল্লিশ পঞ্চাশ পুরুষ পরে তাঁর যে বংশধর আরব দেশের হেজাজ অংশের অধিপতি ছিলেন তিনি হলেন আদনান। আধুনিক যুগের তৃতীয় শতাব্দীতে আদনানের পুত্র মায়াদের বংশধর ফেহের জীবিত ছিলেন। এই ফেহেরেরই অপর নাম কোরায়েশ অর্থাৎ বণিক। এঁর বংশধরগণই পরবর্তীকালে কোরায়েশ নামে পরিচিত হন। ৪৪০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের কোসাই মক্কা সহ সমগ্র হেজাজ প্রদেশের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। তিনিই মক্কা শহর ও কাআবা গৃহের সংস্কার করেন। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কর আদায় প্রথা চালু করেন তাদের মধ্যে খাদ্য-পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি আইনসভাও তৈরী করেন। তৎকালীন ৯০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আইন সভার সদস্য ছিলেন। কোসাই নিজে একটি বৃহৎ প্রাসাদে বাস করতেন। প্রাসাদের লাগোয়া ছিল একটি কাউন্সলগৃহ। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে কোসাই-এর মৃত্যু হয়। এঁর উত্তরাধিকার নিযুক্ত হন আবদুদ্দার। আবদুদ্দারের মৃত্যুর পর কাআবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মোত্তালিব, আবদুস শামস, নওফেল ও হাশিমের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত আব্দ্ মানাফের পুত্র আব্দুস শামসের উপর কাআবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাউন্সিলগৃহ সহ প্রাসাদ ও সামরিক শক্তির সমূহ দায়িত্ব আব্দুর দারের পৌত্রগণের উপর অর্পিত হয়। পরে আবদুস্ শামস্ নিজের কার্যভার ভাই হাশিমকে প্রদান করেন। হাশিমের মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব পান অপর ভাই মোত্তালেব। হাশিম মদিনার সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। ৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম শয়বা। মোত্তালেব শাসনভার গ্রহণ করে ভ্রাতুষ্পুত্র শয়বাকে মদিনা নিয়ে আসেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে মোত্তালেবের মৃত্যুর পর শয়বা তাঁর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন।

আব্দুল মোত্তালেবের ১২ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদের মধ্যে আবু লাহাব, আবু তালেব, আব্বাস, হামজা এবং সর্বকনিষ্ঠ আব্দুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বকনিষ্ঠ আব্দুল্লাহ্‌ ৫৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ২৪ বছর বয়সে আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে মদিনাবাসী বনি নাজ্জার বংশের ওহাব বিন আবদ মানাফের কন্যা আমেনার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আব্দুল্লাহ ইহলোক ত্যাগ করেন। মদিনার কাছে দারুন নাকা নামক স্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

এই সময়ও গোটা আরব দেশ নৈতিক অধঃপতনে জর্জরিত ছিল। দেশের অধিবাসীরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা রক্ষায় দিকভ্রান্ত উন্মাদের মত। অনাচার, ব্যভিচার, কন্যাবিক্রয় ও বধ, নরহত্যা, লুণ্ঠন, কলহবিবাদ, মূর্তিপূজা, মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি অপকর্ম তখন আরববাসীদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এরই মধ্যে আল্লাহ শেষবারের মত বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য, মহাসত্য ও শান্তির বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক বাণীবাহক পাঠালেন পৃথিবীর বুকে।

সেদিন ছিল ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট হিজরী ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। এই পুণ্য দিনে বিবি আমিনার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন বিশ্ববাসীর কল্যাণকামী এক দিব্য জ্যোতির্ময় শিশু। এই শিশুই আমাদের প্রিয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লেল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তথা হিজরী ১২ই রবিউল আউয়াল রাত্রি অবসানের পথে, কিন্তু প্রভাতের আলো তখনও পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করেনি। এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণে কাআবাগৃহের অনতিদূরে আব্দুল্লাহ্‌র ঘরে মাতা আমিনার ক্রোড়ে বিশ্বজগতের করুণাস্বরূপ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্ম নিলেন।

দেশে দেশে বিশ্বমানব সেদিন বিসর্জন দিয়েছিল সত্যের আলোক-বর্তিকাকে। মুছে গিয়েছিল তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের বাণী। প্রকৃতিপূজা,

মূর্তিপূজা, নরপূজা পুরোহিতপূজা, থেকে শুরু করে যাবতীয় জড়পূজার ঘোর অন্ধকারে বিশ্বমানবের মুক্তবুদ্ধি, সত্য চেতনা সেদিন নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আরব, পারস্য, মিশর, চীন, ভারত সহ ইউরোপ সভ্যতার প্রতিটি জন্মভূমিতে ধর্ম, নৈতিকতা আদর্শচেতনা নীতিভ্রষ্টতার চির অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। তৌরাত, জবুর, ইনযিল প্রভৃতি ঐশ্বরিক গ্রন্থ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপথগামী মানুষের হাতে হয়েছে বিকৃত। মানুষ ভুলে গিয়েছিল নিজ স্রষ্টাকে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ মাথা নত করেছিল তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির কাছে। এমনকি মিথ্যার কুহেলি, কুসংস্কারের অন্ধকারে যখন পথভ্রান্ত দিশেহারা তখন বিশ্বপালক আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, বিশ্বের জন্য যিনি করুণা-স্বরূপ সেই মহামানব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে পাঠালেন কাআবা ঘরের সন্নিকটে হাশেমী মহল্লার আব্দুল্লাহর ঘরে। আজও এই গৃহ মক্কা শহরে দাঁড়িয়ে আছে। সাফা বাজারের কাছে বিশ্বনবীর জন্মস্থান এই গৃহটি বর্তমানে একটি লাইব্রেরী। সৌদি সরকারের নিয়মানুসারে কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় না। কারণ তা করলে ঐ বিশেষ স্থানকে মানুষের দুর্বল মন এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন শুরু করে যা বস্তুপূজার রূপ নেয়। এমন আশংকায় এই সকল স্থানের কোন বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রচলন নেই।

বিশ্বশান্তির বাণীবাহক, শাশ্বতঃ সত্যধর্মের মহা প্রচারক শুষ্ক মরুর পাহাড় কুটিরে যখন জন্ম নিচ্ছেন তখন সমগ্র পৃথিবী গভীর অন্ধকারে নিমজ্জমান। ইসলামের সভ্যতা সংস্কৃতির সুসংহত রূপটিকে অনুভব করতে গেলে তদানীন্তন বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ : তুলনামূলকভাবে ইউরোপ এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি অনেকাংশে উন্নত থাকলেও সামগ্রিকভাবে তার অবস্থা ছিল শোচনীয়। সারা দেশ বহু ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। নিরাকার পরম ব্রহ্মার আরাধনা ধর্ম হিসাবে কোনদিনই ভারতে স্থান পায়নি। বেদে একমেবো-দ্বিতীয়ম ঈশ্বরের উল্লেখ থাকলেও ভারতীয়রা দেবদেবীর আরাধনাই করে এসেছেন। এমনকি বেদের যুগেও ভারতীয়দের ধর্ম ছিল প্রাকৃতিক শক্তি, মূর্তি ইত্যাদির উপাসনা। যুগ যুগ ধরে জড় পদার্থ ও মানবনির্মিত নিষ্প্রাণ মূর্তিকেই দেবতা বা ঈশ্বর কল্পনা করে নানা উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তুতি করা এবং

ঐসকল দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ও সোমরস নিবেদনই ছিল ধর্মাচরণ। আধুনিক যুগেও অনুরূপ পদ্ধতিই প্রচলিত।

বৈদিক যুগের পর ভারতে প্রচলিত হলো বর্ণাশ্রম প্রথা। হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন স্তরে। সমাজের উচ্চস্তরে আসীন হলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ, পূজাঅর্চনা ও পৌরোহিত্য করার অধিকার অর্জন করল একমাত্র ব্রাহ্মণরা। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সুযোগ সুবিধাও ভোগ করত ব্রাহ্মণরাই। হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর উক্তি হলো—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দেবেন তিনি সেই শূদ্রের সঙ্গে অসংবৃত নরকে নিক্ষিপ্ত হবেন।

নারীজাতির সামান্যতম মর্যাদাও হিন্দুধর্ম ও সমাজে স্বীকৃত ছিল না। শূদ্রের মতই নারীরও বেদমন্ত্র পড়ার অধিকার ছিল না। নারীদের পুরুষের দাসী বলে গণ্য করা হতো। রাজা অশোকের মৃত্যুর পর সমাজে ব্রাহ্মণরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য বর্ণের উপর নানাভাবে শোষণ ও অত্যাচার চালাতে থাকে। সমাজে সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদির মত পৈশাচিক অমানবিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। একদিকে বহুবিবাহ সমাজে এক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করে অপরদিকে নারীদের মধ্যে একাধিক পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করার মত স্বেচ্ছাচারিতা সমাজে চালু হয়। স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অংশ থেকে মেয়েদের সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয়। মনুর মতে—"মেয়েদের অন্তঃকরণ নির্মল হতে পারে না।" এইরকম বহু অনাচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছিল।

চীন ঃ চীনের অবস্থা ছিল ভারতের চেয়ে শোচনীয়। চীনে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রকৃতিপূজা, পুরোহিতপূজা ও পূর্বপুরুষপূজা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলেও গ্রামাঞ্চলে তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। আর শহরের অধিবাসী ও ধনিকশ্রেণীও বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদের প্রভাবে ধর্মহীন হয়ে পড়েছিল। চীনে শোষণ প্রচলিত ছিল ব্যাপকভাবে। শোষণের হাতিয়ার ছিল রাজতন্ত্র। দাসত্ব, বহুবিবাহ, উপপত্নী রাখা, জুয়াখেলা ইত্যাদি ছিল চীনের জাতীয় জীবনের অঙ্গ।

পারস্য ঃ পারস্যে অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজাই ছিল প্রধান। নানান অনাচার ও পৌত্তলিকতা সমাজের সুগভীরে প্রোথিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাদের সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে যায়। এইভাবে সারা পারস্য দেশে দুর্নীতি আর কুসংস্কারে ডুবে যায়।

ইহুদী ঃ ইহুদীরা ছিল একেশ্বরবাদী। কালক্রমে এরাও পথভ্রষ্ট হয়ে

যায়। এই জাতির মঙ্গলের জন্য আল্লাহ হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান প্রভৃতি পয়গম্বরকে পাঠান। তৌরাত ও জবুর নামক ঐশীগ্রন্থ এদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এত বড় ঐশ্বরিক সম্পদ লাভ করেও এরা দিনে দিনে সব বিস্মৃত হয়ে অত্যাচারী স্বৈরাচারী বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এরা হযরত মূসাকে অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল। ঈশা (আঃ) (যীশু)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করে ইহুদীরাই হত্যা করেছিল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে এই সম্প্রদায়ই বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে। সবদিক থেকেই নৈতিক অধঃপতন ইহুদী সমাজে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

ইউরোপ ঃ বাইজানটাইন সাম্রাজ্য প্রায় গোটা ইউরোপ সহ নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত দেশ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। দাসত্ব প্রথা ইউরোপের সর্বত্র স্বীকৃত প্রথা ছিল। অসংখ্য উপপত্নী রাখা সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক বলে গণ্য হতো। চার দেওয়ালে আবদ্ধ থাকা ছাড়া নারীদের সামান্যতম সম্মান স্বীকৃত ছিল না। সারা ইউরোপের প্রধান ধর্ম ছিল খ্রীষ্টধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট একত্ববাদ প্রচার করে গেলেও পুরোহিত ও পাদ্রীরা একে চরমরূপে বিকৃত করে। যীশু প্রচারিত ধর্মের মূল আদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত হয়। খ্রীষ্টান ধর্মের একত্ববাদকে বিসর্জন দিয়ে যাজক পুরোহিতরা ত্রিতত্ববাদে পরিণত করেন। জীবনে যে যত অন্যায় ও পাপ করুক যীশুকে ভজনা করলেই সব পাপমুক্তি ঘটবে এই বিশ্বাসের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম আবদ্ধ হয়ে যায়। আর এই বিশ্বাসের ফলে দেখা দিলো ধর্ম নিয়েও নানা অনাচার, অবিচার। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে পোপেরা বীভৎস আচার আচরণে মেতে উঠলেন। চার্চের অত্যাচার আর দাসমালিকদের অত্যাচার মিলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

এই গভীর সংকটকালে সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনযন্ত্রণা ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল। মানুষের মনুষ্যত্ব রূপান্তরিত হয়েছিল পশুত্বে। মনুষ্য নামধারী অত্যাচারী পশুর দলের বীভৎস তাণ্ডবে ধর্ম, ন্যায়নীতি, মানবতা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছিল। মানবজাতির এই চরম দুঃসময়ে—চরম অত্যাচার থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ পৃথিবীর মাটিতে পাঠালেন করুণার বাণী বহন করে তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্মের দুসপ্তাহ পরই আরব দেশের প্রথামত বেদুঈন রমণী ধাত্রী হালিমার উপর তাঁর লালন পালনের ভার অর্পণ

করা হয়। হালিমা ছিলেন বনি সা'দ গোত্রের মহিলা। শিশু নবীকে নিয়ে হালিমা চলে গেলেন নিজ গৃহে। মা আমিনা প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্রকে ধাত্রীর কোলে সমর্পণ করে আল্লাহর কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করলেন। প্রকৃতির কোলে ধাত্রীগৃহে বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)।

মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে নিয়ে আসার পর থেকে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল হালিমার গৃহে। তাঁর গৃহপালিত পশুগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। তাদের দুধ দেওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেল। খেজুর গাছগুলি প্রচুর ফল দিতে শুরু করল। হালিমার গৃহের সব অভাবই এমনি করে পূরণ হয়ে গেল। সবচেয়ে অবাক হলেন হালিমা শিশু মোহাম্মাদ হালিমার একটি মাত্র স্তন্য পান করতেন, অপরটিতে কোনদিনই মুখ ঠেকাতেন না। কি করে এমন হয়। কেমন করে অবোধ শিশু তার দুধ ভাই বোনের জন্য অপর স্তনটি রেখে দেয়। দিনে দিনে এই সব অলৌকিক ঘটনায় হালিমা শিশুর প্রতি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেন। এমনি করে দুটি বছর পার হয়ে গেল। হালিমা শিশু মোহাম্মাদকে মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়ে দিতে এলেন মক্কায়। মক্কায় সে সময় চলছে কঠিন মহামারী। মাতা আমিনা আবার পুত্রকে হালিমার কাছেই ফিরিয়ে দিলেন। আরও তিনটি বছর শিশু মোহাম্মাদ হালিমার কাছে কাটালেন। মক্কার নিকটবর্তী এলাকার ভাষাগুলির মধ্যে বনি সাদ গোত্রের ভাষাই ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নত সাবলীল আর শ্রুতিমধুর। মহিমাময় আল্লাহ্‌র নিগূঢ় ইচ্ছায় শিশু মোহাম্মাদ সেই সুললিত ভাষা আয়ত্ত করার সুযোগ পেলেন পাঁচ বছর কাল পর্যন্ত। জীবন সম্পর্কে তাঁর এখন প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির সান্নিধ্যে বাধাবন্ধনহীন মুক্ত মরু প্রান্তরে—উন্মুক্ত আকাশতলে নিত্য স্বাধীন বেদুইন বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলে বেড়ান শিশু নবী। বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত ক্রোড়ে আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক শিক্ষায় তিনি হয়ে উঠলেন চিন্তাশীল।

ধাত্রীমাতার গৃহে শিশু নবীর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী: হালিমা বলেছেন মোহাম্মাদ একদিন তার দুধভাইদের সঙ্গে বাড়ীর কাছাকাছি স্থানে মেষ চরাচ্ছিলেন। এমন সময় বালকেরা ছুটে এসে আমার কাছে বলল দুজন শ্বেত বসন পরিহিত লোক এসে তাদের কোরায়েশ ভাইটির বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আমি এবং আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখলাম মোহাম্মাদ বিবর্ণ ও ভীত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আমরা শিশু

মোহাম্মাদকে বুকে তুলে নিয়ে এমন হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন শিশু মোহাম্মাদ উত্তর দিলেন "শুভ্র বসন পরিহিত দিব্যদর্শন ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে আমার কলিজা (হৃৎপিণ্ড) বের করে নিয়ে তা থেকে কোন জিনিষ ফেলে দিয়েছে। সে যে কি জিনিষ জানিনা।" পরবর্তীকালে হযরত আনাস বর্ণিত হাদিসেও এই বর্ণনা আছে। সেখানে আরও একটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তা হলো হৃৎপিণ্ড বের করে তার থেকে এক বিন্দু কাল রক্ত ফেলে দিয়ে তাদের হাতের তসতরির পানি দিয়ে তা বিধৌত করে দেন।"

পাঁচ বছর পর শিশু নবী মায়ের কাছে ফিরে এলেন। ধাত্রীগৃহের জীবন সমাপ্ত হলো। শিশু মোহাম্মাদ, সংসারী মোহাম্মাদ কোনদিনই বিস্মৃত হননি তাঁর লালনপালনকারী মাতা হালিমাকে। সারা জীবনে যখনই মা হালিমা এসেছেন নবীর দরবারে তিনি তখনই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছেন। বসার জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন নিজের শিরস্ত্রাণ আর সঙ্গীদের কাছে পরম শ্রদ্ধায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন "মা, আমার মা।" বিবি খাদিজার সঙ্গে শুভ পরিণয়ের সময় এই মা ও দুধ বোনেদের আনতে ভোলেন নি। সারা আরব যখন দুর্ভিক্ষের কবলে তখন বিস্মৃত হননি এই মাকে। তাঁদের জন্য মমতায়, ব্যথায় বিগলিত হয়েছেন কোমল প্রাণ নবী মোহাম্মাদ। একটি উটের পিঠে বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য আর চল্লিশটি মেষ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁদের কাছে।

শিশু মোহাম্মাদকে ফিরে পেয়ে বৃদ্ধ পৌত্র আব্দুল মোত্তালেব মুগ্ধ হয়ে গেছেন। অকৃত্রিম স্নেহ আর মমতায় ভরিয়ে দিয়েছেন শিশু মোহাম্মাদের হৃদয়মন। আর মা আমিনা! তাঁর তৃপ্তি সীমাহীন। ভালোবাসায় আদরের সন্তানকে ভরিয়ে দিতে তিনি ব্যাকুল। সন্তানগর্বে উদ্বেল মার প্রাণে সাধ জাগল তাঁর এই দীপ্তিময় আদরের দুলালকে মদিনায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনেন পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনদের। তাই মা আমিনা রওনা হলেন মদিনার পথে। সঙ্গে দিব্যকান্তি বালক মোহাম্মাদ আর পরিচারিকা উম্মে আইমান। মদিনায় পৌঁছে স্বামীর কবরের সামনে গিয়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন হারিয়ে যাওয়া সুখ স্মৃতির আবেশে। স্মৃতির মিছিল তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন চোখ জুড়ানো বালক মোহাম্মাদ পিতৃহীন। আজ প্রথম মায়ের অঝোর অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে আগতদিনের নবী মোহাম্মাদ হৃদয়ঙ্গম করলেন পিতৃহীনের সকরুণ বেদনা। একটি মাস কেটে গেল। মা আমিনা

প্রাণাধিক পুত্রকে নিয়ে আবার মক্কার পথে সওয়ার হলেন। কিন্তু হায়! আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মানুষের বোধের অতীত। পিতৃহীনতার ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করার পরই বালক মোহাম্মাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আর এক নিদারুণ অশনিপাত। মক্কার পথে এক কঠিন অসুখে মা আমিনা ইহলোক ত্যাগ করলেন। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকে আজ বালক মোহাম্মাদ একা। পিতা ছেড়ে গেছেন জন্মের আগেই আজ মাও চলে গেলেন জীবনের অনন্ত-পথে। মাথার উপর রৌদ্রদগ্ধ নীল আকাশ, তপ্ত মরুভূমির চারদিকে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় তার মাঝে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, অত্যাচারিতের মুক্তিদাতা, আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী বালক মোহাম্মাদ। সঙ্গে কেবল একটি উট আর একজন দাসী। এই বয়সেই জীবনের এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হলেন—এতিম হলেন। স্নেহময়ী মাকে মরুপ্রান্তরে কবরস্থ করে ফিরে এলেন মক্কায়। বুক ভাঙা বেদনা নিয়ে পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব এতিম পৌত্রকে কোলে টেনে নিলেন। কিন্তু মাত্র দুবছর পরই বিদায় নিলেন পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব। একে একে হারালেন সব প্রিয়জনকে। নিঃসঙ্গ জীবনের বিরাট সিংহদুয়ারে দাঁড়ালেন বালক মোহাম্মদ।

এবার মোহাম্মাদকে বুকে টেনে নিলেন পিতৃব্য আবু তালেব। মোহাম্মাদ তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। কিশোর মোহাম্মাদের সুমিষ্ট ব্যবহার সত্যবাদিতা আরববাসীদের হৃদয় জয় করল। আরবীয়গণ তাঁকে তাঁর সত্যবাদীতার জন্য আল-আমিন আখ্যায় ভূষিত করলেন।

বালক মোহাম্মাদ ১২ বছর বয়সে পদার্পণ করলে চাচা আবু তালেবের সঙ্গে বানিজ্য যাত্রায় সিরিয়া যেতে চাইলেন। আসলে তাঁর কৌতূহলী মন ছুটে যেতে চায় কোন সুদূরে। মক্কার সীমানার বাইরে বিশাল জগৎকে জানার আকুলতায় ব্যগ্র হয়ে উঠত তাঁর মন। পরম স্নেহে হাসিমুখে আবুতালের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিলেন সিরিয়া বাণিজ্য যাত্রায়। বাণিজ্য কাফেলার পথে বহু প্রাচীন নগরীর সঙ্গে পরিচয় হলো কিশোর মোহাম্মাদের। তাঁদের কাফেলা পৌঁছুল বিখ্যাত বিধ্বস্ত প্রাচীন নগরী হেজারে। সেই হেজার নগরী যেখানে সামুদ জাতি বাস করত। তখনও হযরত ইব্রাহিমের অবির্ভাব ঘটেনি। হেজার প্রদেশের দুধর্ষ সামুদ জাতি আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে ঘোর পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বপালক আল্লাহ্ তাদের সৎপথে আহ্বান জানানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন নবী সালেহ (আঃ)-কে। সামুদ

জাতির অধিকাংশ লোক তাঁকে স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু যারা ঈমান আনার তারা সালেহ (আ:) এর সত্যধর্মের অনুসারী হয়। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। আল্লাহ্‌র রোষে মূর্তিপূজক গোটা সামুদ জাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়। দেশটি পরিণত হয় এক বিজন মরুভূমিতে।

এই জনশূন্য মরুভূমি পার হয়ে কাফেলা পৌঁছুল বসরা সীমান্তে। আল্লাহ্‌র কী অপূর্ব কুদরত। জনশূন্য মরুভূমি পাশেই স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় ভরা দেশ। বয়ে চলেছে স্বচ্ছ শীতলা নদীজল সবুজ তরুলতায় ঢাকা বনানী। সৃষ্টির এই বৈচিত্র্যে বালক মোহাম্মাদের হৃদয় ভরে উঠল এক অনাবিল আনন্দে। মোয়াবাইত আর এমনাইতদের প্রাচীণ নগরীর ধ্বংসাবশেষের বুক চিরে চলছে কাফেলা। এটা ছিল নেস্টরীয় খ্রীষ্টানদের বাসভূমি। এখানে এসে কাফেলা তাঁবু ফেলল। তাঁবুর অনতিদূরে খ্রীষ্টান মঠ। এই মঠের পাদ্রি বহিরা। বহিরা নেস্টরীয় খ্রীষ্টান। বাইবেলে গভীর জ্ঞান। তিনি বাইবেলে উল্লিখিত যীশুর পরবর্তী নবীর আগমন সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন। তিনি জেনেছিলেন এ পথেই তাঁর আগমন ঘটবে। তাই সেই আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য পথচেয়ে বসে আছেন। বাণিজ্য-কাফেলা এলেই তা পরখ করে দেখেন। অভ্যাসবশতঃ সেদিন আবুতালেবের কাফেলার চারদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন কাফেলার বারো বছরের বালককে দেখে। এ তো তাঁরই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রতিশ্রুত নবী। এর জন্যই তো তিনি অপেক্ষা করছেন সুদীর্ঘ দিন। বাইবেল থেকে নবী মোহাম্মাদের যা যা নিদর্শন জেনেছেন সবই বালক মোহাম্মাদের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি বালক মোহাম্মাদের হাত ধরে বলতে লাগলেন, এই তো বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক! এই তো সেই যীশুর প্রতিশ্রুত শান্তি দাতা! আল্লাহ্ একেই বিশ্বজগতের আশীর্বাদস্বরূপ পাঠিয়েছেন। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বহিরা আবুতালেবকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। একান্তভাবে বালকের প্রতি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দিলেন। আর সতর্ক করে দিলেন ইহুদীদের সম্পর্কে যেন তারা এই বালকের সন্ধান না পায়।

সিরিয়া বাণিজ্যে আবুতালেব লাভ করলেন আশাতিরিক্ত। বাণিজ্য শেষে দেশে ফিরে এলেন। বালক মোহাম্মাদ বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী চিন্তাশীল—অনেক বেশী ভাব গম্ভীর। চাচা আবুতালেবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। বাড়ীর অন্যান্য বালকদের সঙ্গে মেষপাল নিয়ে উপত্যকায় যান চরাতে। প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক।

এই সময়ে একটি ঘটনা গভীর ভাবে দোলা দিল বালক মোহাম্মাদের মনকে। হেজাজ ভূমির অনেক স্থান বছরে একবার করে মেলা বসত। বিভিন্ন গোত্রপতিরা উপস্থিত হতেন এই মেলায়। কবিরা স্বরচিত কাব্য শোনাতেন। এক গোত্র অন্য গোত্রের কুৎসা রটনা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করত। ফলে দারুন উত্তেজনা সৃষ্টি হতো। আর এই উত্তেজনা থেকে আক্রমণ, আক্রমণ থেকে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়ে যেত। এইভাবে ওকাজ মেলার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবদের মধ্যে এক দারুণ যুদ্ধ সৃষ্টি হয়। সকল গোষ্ঠীই এই যুদ্ধে জ ড়িয়ে পড়ে। এক নাগাড়ে পাঁচ বছর যুদ্ধ চলতে থাকে। হাজার হাজার মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'হরবে ফেজ্জার' বা অন্যায় যুদ্ধ বলে খ্যাত। হাশিম বংশও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আবু তালেবের সঙ্গে বালক মোহাম্মাদকেও যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। তবে তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেন নি। নিজের গোষ্ঠীর স্বপক্ষের লোকদের তীর যোগানোর কাজ করতেন। কোরায়েশরা নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। বিনা কারণে পাঁচ বছর যুদ্ধ করে ঘরে ঘরে কান্নার রোল, মহল্লায় মহল্লায় হাহাকার ভরে উঠল। কত নারী হলো স্বামীহারা, কত শিশু হলো পিতৃহারা, কত মাতা হলো পুত্রহারা। কি নিষ্ঠুরতা! কি অমানুষিক বর্বরতা। বিনা কারণে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয় ধরণীর ধূলা। শেষ পর্যন্ত একটা সন্ধি করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু মানুষের নবী বিচলিত হলেন। আর্তপীড়িত, ব্যথিত, অত্যাচারিত সর্বহারাকে সহায় দান আর অত্যাচারীকে বাধাদানে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন তিনি। উদ্যমী যুবকদের ডেকে তিনি বোঝালেন এ অন্যায় প্রথা, এই আত্মঘাতী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন মানব কল্যাণের পথ। তিনি এইসব যুবকদের নিয়ে 'হেলফুল ফজুল' নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণ ও সেবার প্রচেষ্টা চালালেন। হযরতের সৃষ্ট এই সেবাপ্রতিষ্ঠান দুর্বার গতিতে জনসেবা করে চলল। হযরত সর্বক্ষণ এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চিন্তায় আত্মমগ্ন। কোথায় কোন্ অনাথ ক্ষুধার জ্বালায় ধুকছে, কোথায় দুঃস্থ পীড়িত রুগ্নের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, কোথায় বিধবা নারী নির্যাতিত অবহেলিত সর্বত্র হযরত ছুটে যান তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সহায়তা নিয়ে। এই কল্যাণ কাজে তিনি পুলকিত— অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তাঁর হৃদয়। এমনি করে ঘটনাবহুল সময়ের মধ্য দিয়ে বালক মোহাম্মাদ পৌঁছলেন যৌবনে।

হযরতের বয়স ২৫ বৎসর। তাঁর চরিত্রের মধুর গুণাবলী ছড়িয়ে

পড়েছে দিকে দিকে। আরবীয়রা তাঁকে ভূষিত করেছে আল আমিন নামে। মোহাম্মাদ নামের পরিবর্তে আলআমিন নামেই তিনি আরবদের কাছে অধিক পরিচিত। মক্কার এক ধনবতী বিধবা তাঁর গুণাবলী শ্রবণে আকৃষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে ডেকে ব্যবসাবাণিজ্য দেখাশোনার কাজে নিয়োগ করলেন। সততার সঙ্গে মোহাম্মাদ (সাঃ) সেকাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে সময় বয়ে চলেছে। একসময় বিবি খাদিজা হযরতের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। হযরত সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যখন গোটা আরব দেশে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত, সেই সময়ে নারীত্ব আর সতীত্বের মর্যাদা বাঁচিয়ে খাদিজা যশস্বিনী। মক্কার লোকেরা তাঁকে খাদিজা না বলে বলত তাহেরা (পবিত্রা)। দুপক্ষের অভিভাবকগণের মধ্যে আলোচনা চলল আলআমিনের (সত্যবাদী) আর তাহেরা (পবিত্রা)-র শুভ পরিণয়ের জন্য। সম্মত হলেন সকলে। আলআমিনের পক্ষ থেকে চাচা আবু তালেব আর তাহেরার পক্ষ থেকে চাচা আসর বিন আসাদ অভিভাবকত্ব করলেন। সাড়ে বারো উকিয়া (তৎকালীন মুদ্রা) মোহরানায় বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। পঁচিশ তরুণ যুবক আর বিগত যৌবনা চল্লিশ বছরের এক বিধবা নারীর মিলন ঘটল।

এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কোরায়েশরা কাআবা ঘর মেরামত করার কথা ভেবে জেদ্দা বন্দরে অচল হয়ে যাওয়া জাহাজের কাঠ-কুটো বেশ সস্তা দামে কিনে আনল। তখন কাআবা ঘরের চারপাশে কোন প্রাচীর বেষ্টনী নেই। কাআবা ঘরের উপরে কোন ছাদ নেই। ফলে নানা বিড়ম্বনা দেখা দিত। তাই কোরায়েশ দলপতিরা একযোগে এর মেরামতির কাজে লেগে গেল। মেরামতি চলছে এমন সময় এক বিভ্রাট শুরু হলো। কাআবা ঘরের অনতিদূরে প্রাঙ্গণে যে কৃষ্ণ প্রস্তর ছিল তা কারা তুলে এনে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করবে তা নিয়ে বিরোধ বেধে গেল। কারণ এই প্রস্তরের সঙ্গে তৎকালীন যুগের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্যের সম্পর্ক যুক্ত ছিল। প্রথমে বচসা, তারপর তুমুল দ্বন্দ্ব কলহ আরম্ভ হলো। কিন্তু মীমাংসা আর হয় না। যুদ্ধ ছাড়া মীমাংসার আর কোন পথই দেখা যাচ্ছে না। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘরের সংস্কারের জন্য তো আর রক্তক্ষয় হতে পারে না। অথচ যুদ্ধ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে ডেকে বললেন, "এই সামান্য বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী যুদ্ধ করে রক্তক্ষয় করো না বরং আমার

প্রস্তাব—আগামী প্রভাতে যে প্রথমে কাআবা ঘরে প্রবেশ করবে তাকেই এই বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং তার সিদ্ধান্তই সকলে মেনে নিক।" শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব সকলে গ্রহণ করলেন। সকল গোষ্ঠীর দলপতিগণই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন কাআবায় কে আসেন সর্বপ্রথম আজ প্রভাতে। কি সিদ্ধান্ত হবে শেষ পর্যন্ত। এইসব চিন্তায় তাঁরা যখন বিভোর তখন কয়েকজন বলে উঠলেন, "এই যে আলআমিন আসছেন. আমরা তাঁর সিদ্ধান্তই সকলে মেনে নেব।" হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এলে তাঁকে সব কিছু বুঝিয়ে বলা হলো। তিনি শুনে বললেন, বেশ ভাল কথা, যে যে গোত্র কৃষ্ণপ্রস্তর আনার দাবীদার তাঁদের মধ্য থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করুন। প্রতিনিধি নির্বাচন হলে আলআমিন তাঁদের নিয়ে গেলেন কৃষ্ণপ্রস্তরের সামনে। একটি চাদর নিজ হাতে বিছিয়ে দিয়ে পাথরটি তুলে তার মাঝখানে রাখলেন। তারপর বললেন, "এবার আপনারা সকলে চাদরের প্রান্তভাগ ধরে নিয়ে চলুন কাআবা ঘরের কোণে। পাথরটি নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সেটি তুলে কাআবা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশ করলেন। মোহাম্মাদের বিচক্ষণতায় সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। এই সেই হজরে আসওয়াদ যা আদমের (আঃ) ফেরেশতাদের, হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) স্পর্শধন্য পবিত্র পাথর। আর তাই আজ এক অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্য দিয়ে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হস্তস্পর্শে যথাস্থানে রক্ষিত হলো। এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব ইঙ্গিত নিহিত।

তখন থেকেই কাআবা ঘরের ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পাথরটি অবস্থান করছে। হজযাত্রীরা পরম শ্রদ্ধাভরে ঐ পাথরকে চুম্বন করেন। কাআবা প্রদক্ষিণ শুরু হয় ঐ প্রস্তরের নিশানা থেকে। মানুষের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কত যুগের কত বিচিত্র পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত এই প্রস্তর খণ্ডটির দেহে। কত মহান পবিত্র স্পর্শে ধন্য, কত মহান আত্মার সুরভি মাখানো এই নির্জীব প্রস্তরের অণুপরমাণুতে। এর স্পর্শ যেন গোটা মানব-জাতির স্পর্শ। এটি যেন গোটা মানবজাতির ইতিহাসের প্রস্তরীভূত রূপ। মানুষের তথা ইসলামের ইতিহাসের চেতনার এ সুন্দর নিদর্শন।

বিবি খাদিজার বিশাল বাণিজ্যসম্ভার আর বিপুল ধনরাশির মালিক এখন এতিম, নিঃস্ব যুবক সংসারী মোহাম্মাদ (সাঃ)। খাদিজা তাঁর যথাসর্বস্ব ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী স্বামীর পদতলে সমর্পণ করে দিয়েছেন। সংসার জীবনেও তাঁর চরিত্রে কোন পরিবর্তন নেই। ভোগবিলাসের প্রতি নেই কোন আকর্ষণ।

সততা, সাধুতা, মিতব্যয়িতা, বিশ্বস্ততায় তাঁর চরিত্র চির উদ্ভাসিত। এর মধ্যে তিনি কাসেম, তাহের, তৈয়ব নামে তিন পুত্র এবং জয়নাব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা নামে চার কন্যা লাভ করেন। পুত্রগণ সকলেই নবুয়তের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। বিবি ফাতেমাই হযরতের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। বিবি ফাতেমাই খলিফা হযরত আলীর মহীয়সী স্ত্রী এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের মাতা।

কোন পুত্রসন্তান না থাকায় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও বিবি খাদিজার মনে দুঃখ ছিল। একবার বিবি খাদিজা ওকাজ মেলা থেকে জায়েদ নামে এক দাস ক্রয় করেন এবং মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সেবার জন্য তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু দাস নয় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন। এমন পুত্রবৎ স্নেহে তাকে ঘিরে রেখেছিলেন যে সে জায়েদ বিন মোহাম্মাদ বা মোহাম্মাদের পুত্র নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যিনি বিশ্ব মানবের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে দুনিয়ার বুকে এসেছেন তিনি নিজে কি কাউকে শৃঙ্খলিত করতে পারেন! তাই তিনি জায়েদকে স্বাধীন করে দেন। কিন্তু বাদ-সাধে জায়েদ নিজে। সে বলল, পিতা আমিতো আপনাকে ছেড়ে যেতে চাইনা। চাইনা মুক্তি, চাইনা স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষের মুক্তির দূত নবী বুঝলেন তাকে নিজের কাছে রাখলে ক্রীতদাস প্রথার সমর্থনই করা হবে। তাই তিনি কাআবা গৃহে গিয়ে সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে ঘোষণা করলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক। এই জায়েদ আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী।" জনমণ্ডলী এত বড় উদার ঘোষণায় হতবাক। কোথায় কোন্ অজ্ঞাত কুলশীল এক ক্রীতদাস কিনা এক সম্ভ্রান্ত কোরায়েশের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির একটি বাস্তব ঘোষণা করলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)।

অসহায়, অনাথ শৈশব পার হয়ে, মেষ চারনের মধ্য দিয়ে, সত্যনিষ্ঠতার পুরস্কার স্বরূপ আলআমিন উপাধি পাওয়া কৈশোর পার হয়ে এক পরিপূর্ণ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান সংসার জীবন অতিবাহিত করে আজ তিনি পরিপূর্ণ মানব। মানুষের জীবনের সবরকম দুঃখবেদনা—সবরকম কাজের মধ্য দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ—তিনি পরীক্ষিত। এই মানবের মধ্যেই তো সম্ভব বিশ্বের সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনির্বচনীয় সত্তার দ্বারোদ্ঘাটন। বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহের পর মোহাম্মাদ (সাঃ) নিশ্চিন্তে

অধ্যাত্মচিন্তার বিভোর হয়ে দিন কাটান। এভাবে সংসার জীবনের দশবছর অতিবাহিত করলেন। যুবক মোহাম্মাদ পঁয়ত্রিশ বছরে পা দিয়েছেন। এই সময় থেকে তিনি মানস নেত্রে এক অপূর্ব জ্যোতি দেখতে লাগলেন। কোন সুদূর থেকে অনির্বচনীয় আহ্বান ধ্বনি তাঁর হৃদয়মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। তিনি স্থির থাকতে পারেন না। চলে যান মক্কার অনতিদূরে পবিত্র হেরা গুহায়। ধ্যানস্থ হয়ে কাটান দিনের পর দিন সেই নিভৃত গুহায়। আহার্য শেষ হয়ে গেলে আহার্য নিয়ে যেতেন। ধন্য মহামানবের ধন্য পত্নী খাদিজা! কোন অনুযোগ নয়, অভিযোগ নয়, সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে লাগলেন এ অধ্যাত্ম সাধনায়। মোহাম্মাদ (সাঃ) যে এক পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন তা তিনি অনুভব করতেন। এমনি করতে করতে এসে গেল রমযান মাস। মোহাম্মাদ (সাঃ) রোযা রেখে দিনরাত আরাধনায় কাটান হেরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে। গভীর রাত্রি, নিস্তব্ধ চতুর্দিক, পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে। এই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে, রাতের নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে কে যেন ডেকে উঠল, মোহাম্মাদ! মোহাম্মাদ চোখ খুলে দেখতে পেলেন এক জ্যোতির্ময় ফেরেশতা সামনে দাঁড়িয়ে। গুহার জমাট অন্ধকার সেই জ্যোতিতে আলোকিত। মোহাম্মাদ বাকরুদ্ধ স্তম্ভিত। সেই দিব্য জ্যোতি আর কেউ নন। তিনি ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে তিনি বললেন—'পড়'। মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রকম্পিত কণ্ঠে বললেন—'আমি পড়তে জানিনা'। ফেরেশতা আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। এক তীব্র তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল হযরত (সাঃ)-এর সারা দেহে। এমনি করে তিনবার পড়ার আহ্বান আর ফেরেশতার আলিঙ্গন। তারপর নিরক্ষর মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখে কোথা থেকে এলো বাণীর স্রোত। এক পবিত্র ঐশ্বরিক অনুগ্রহে তিনি পড়ে চললেন, "একরা বেইসমে রাব্বেকাল লাযী খালাক···পড় তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।····এমনি করে নেমে এলো আল্লাহ্‌র বাণীর প্রথম ছত্র কটি মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে। ফেরেশতা আরও বললেন, "ইয়া মোহাম্মাদ তুমি আল্লাহ্‌র রসুল, আর আমি ফেরেশতা জিব্রাঈল।" এইভাবে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সমস্ত দেহ জ্যোতিস্নাত পবিত্র নির্মল হয়ে উঠল।

মোহাম্মাদ (সাঃ) অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর সারা দেহ প্রকম্পিত হতে থাকল। তিনি আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। দৃষ্টি উন্মীলিত করে দেখলেন

তখনও আকাশপথে জিব্রাঈল (আঃ) দাঁড়িয়ে। তিনি ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তখনও রাত্রি প্রভাত হয়নি। মক্কানগরী নিদ্রামগ্ন।

ধীরে ধীরে পূর্বগগন উদ্ভাসিত হয়ে উষার আলো দেখা গেল। ভীত বিহ্বল মোহাম্মাদ (সাঃ) হেরা গুহা থেকে ছুটে এলেন নিজ গৃহে। প্রাণ-প্রিয় সাধ্বী পত্নী খাদিজার কাছে। কাঁপতে কাঁপতে বললেন আমায় আবৃত কর। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। কিছুটা প্রকৃতস্থ হয়ে স্ত্রী খাদিজার কাছে বললেন আনুপূর্বিক ঘটনা। সব শুনে খাদিজা অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আত্মীয়ের মঙ্গল করেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করেন, দুঃস্থ পীড়িত আর্তের সেবা করেন, অতিথিকে আশ্রয় দেন, ঘোর বিপদেও সত্য পালন করেন। আল্লাহ্‌ কখনই আপনাকে অপদস্ত করবেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেছেন, "রাসূলুল্লাল হেরা গিরিগুহা থেকে যখন খাদিজার কাছে ফিরলেন তখন তাঁর অভিভূত অবস্থা। বারে বারে তিনি ফেরেশতা জিব্রাইলকে দেখতে লাগলেন আর শুনতে লাগলেন "হে মোহাম্মাদ তুমি আল্লাহ্‌র রসূল, আর আমি ফেরেশতা জিব্রাঈল।" মোহাম্মাদের এই অবস্থা দেখে খাদিজা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন না সত্যই মোহাম্মাদ ফেরেশতা আশ্রিত না কোন শয়তানের ধোঁকায় আক্রান্ত। এটি পরীক্ষার জন্য বিবি খাদিজা এক বিস্ময়কর পন্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে তাঁর বাম উরুতে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি উত্তর দেন হ্যাঁ। বিবি খাদিজা এবার ডান উরুতে বসিয়ে একই প্রশ্ন করেন। এবারও একই উত্তর হ্যাঁ। এরপর কোলের উপর বসিয়ে ঐ প্রশ্নই করলেন। তাতেও তিনি উত্তর দেন হ্যাঁ ঐ দিব্য জ্যোতি এখনও বিদ্যমান। তখন বিবি খাদিজা তাঁর দেহাবরণ একটু শিথিল করে দিলেন আর জিজ্ঞেস করলেন এখনও কি আপনি কাউকে দেখছেন। এবার রাসূলুল্লাহ্‌ উত্তর দিলেন না। যাঁকে দেখছিলাম তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন বিবি খাদিজা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন যাঁকে আপনি দেখছিলেন তিনিই আল্লাহ্‌র ফেরেশতা।

কিন্তু হলে কি হয়। গত রাতের সেই বিস্ময়কর ঘটনাকে ভুলতে পারছেন না তিনি। তাঁর দেহমন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। তিনি কিছুতেই সুস্থির হতে পারছেন না। মোহাম্মাদ (সাঃ) সারা দেহ আবৃত করে শুয়ে পড়লেন। খাদিজা তাঁর স্বামীর এহেন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর চাচাতো ভাই অর্কার কাছে।

কোরায়েশদের পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। গভীর জ্ঞানের অধিকারী। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশারদ একনিষ্ঠ পণ্ডিত। অর্কা খাদিজার কাছ থেকে সব শুনে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন "'কুদ্দ্ুসুন'! 'কুদ্দ্ুসুন'! পবিত্র! পবিত্র! আল্লাহ্ পূর্ববর্তী নবী হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইসা (আঃ)-এর প্রতি যে নামুস (ফেরেশতা) পাঠিয়েছিলেন এই সেই নামুস। হায় মোহাম্মাদ! তোমার স্বদেশবাসী তোমার উপর চরম অত্যাচার করবে, তোমাকে দেশত্যাগ করাবে। সেই ঘোর অত্যাচারের দিনে আমি জীবিত থাকলে তোমাকে সাহায্য করব।" খাদিজা পুলকিত হয়ে উঠলেন। গৌরবে হৃদয় ভরে গেল। তিনি স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন এই সত্যনিষ্ঠ যুবক মোহাম্মাদই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। এই মোহাম্মাদই অনাগত পয়গম্বর, বিশ্বের শেষ নবী, নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ। একে একে এমনি করে মানুষ মোহাম্মাদের মধ্যে পয়গম্বর মোহাম্মাদের আবির্ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাআবা শরীফের ফজিলত (মাহাত্ম্য)

হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন—নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন যে, প্রত্যেক বছর ছয় লক্ষ লোক কাআবায় হজ করবে। যদি তার কম হয়, আল্লাহ্ ফেরেশতা দ্বারা সেই সংখ্যা পূর্ণ করবেন। কাআবাকে কেয়ামতের দিন নববধূর মত রত্নালংকারে ভূষিতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং যারা তার হজ করেছে তারা প্রত্যেকেই কাআবাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করার কাজে ব্যস্ত থাকবে। কাআবা শরীফ বেহেশতের দিকে অগ্রসর হতে হতে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তিরাও বেহেশতে প্রবেশ করবে। হাদীসে আছে যে কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডও বেহেশতের একটি হীরক। কেয়ামতের দিন ওকে ওঠানো হবে। হজরত ওমর (রাঃ) একবার চুম্বন দিয়ে বলেছিলেন,—'নিশ্চয়ই আমি জানি যে তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র তুমি উপকার বা অপকার করতে পার না। যদি আমি রসূলে করিমকে তোমাতে চুম্বন করতে না দেখতাম, তোমাকে আমি কখনও চুম্বন

করতাম না।' তারপর তিনি ক্রন্দন করে উঠলেন, এমনকি ক্রন্দনের স্বর উচ্চ হয়ে উঠল। হজরত আলী বললেন,—হে আমিরুল মোমেনিন! বরং এই পাথর উপকার করে। হজরত ওমর বললেন--কিরূপে? তিনি বললেন, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা আদমের বংশধরগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তিনি তাদের উপর একটি লিপি লিখলেন এবং এই প্রস্তরে সে লিপি অংকিত করে রাখলেন। 'যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে তাদের পক্ষে এই প্রস্তর সাক্ষ্য দিবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কুফরীর সাক্ষ্য দিবে।' কেউ কেউ বলেন, —চুম্বন দেওয়ার সময় মানুষ যে দোওয়া বলে তার অর্থই উক্ত বক্তব্য— "হে আল্লাহ্, তোমার প্রতি ইমানের জন্য, তোমার কিতাবে সত্যতায় আস্থা জ্ঞাপকের জন্য এবং তোমার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করবার জন্য এই তাওয়াফ করলাম।" মহাত্মা হাসান বসরী বলেছেন—'তাওয়াফের সময় একদিনের রোজা একলক্ষ রোজার সমান এবং এক দেরহাম সাদকা এক লক্ষ দেরহাম সাদকার সমান।' এইভাবে ওখানে সমস্ত পুণ্য লক্ষগুণ হয়। কেউ বলেন— যে ব্যক্তি সপ্তাহ ধরে কাআবা তাওয়াফ করে তার এক ওমরাহ্‌র সমান সওয়াব হয় এবং তিনটি ওমরাহ করলে একটি হজের সমান সওয়াব হয়। হাদিসে আছে 'রমজানের ভিতর একটি ওমরাহ আমার সঙ্গে হজ করার সমান।' হাদীসে আছে হজরত আদম (আঃ) যখন হজের সকল অনুষ্ঠান শেষ করলেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন,—'হে আদম আপনার হজ কবুল হয়েছে। আমরা এই কাআবা আপনার দুই হাজার বছর পূর্বে তৈরী করেছি।' হাদীসে আছে যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক রাত্রে পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রথম দৃষ্টিপাত করেন হারামের অধিবাসীগণের প্রতি এবং হারামের অধিবাসীগণের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন কাআবা শরীফের অধিবাসীদের প্রতি। যাকে তিনি তাওয়াফ করতে দেখেন তাকেই ক্ষমা করেন। যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকে ক্ষমা করেন। যাকে কাআবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তাকে ক্ষমা করেন। হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,— "কাআবাশরীফে প্রত্যেক দিন ১২০টি অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, ৬০টি তাওয়াফ-কারীদের জন্য, ৪০টি নামাযীদের জন্য এবং ২০টি কাআবাশরীফ দর্শকদের জন্য।" হাদীস শরীফে আছে, "অধিকবার কাআবার তাওয়াফ কর, কেননা এ এমন বড় জিনিষ যা তোমার আমলনামাতে কেয়ামতের দিন স্থান পাবে এবং যার জন্য লোকে ঈর্ষা করবে।" অলিআল্লাহ্ ও আবদাল-এর তাওয়াফ

যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন কাবাগৃহকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ ঘটবে। সেদিন ভোরে মানুষ দেখবে কাআবাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর আর তার কোন চিহ্ন থাকবে না। হজরত বলেছেন—আল্লাহ্ বলেছেন—"যখন পৃথিবী ধ্বংসের ইচ্ছা করব, তখন আমার গৃহ থেকে আরম্ভ করব এবং তা প্রথমে ধ্বংস করব। ওর পরবর্তী সময়ে পৃথিবী ধ্বংস করব।"

মদিনা শরীফের ফজিলত (মাহাত্ম্য)

মক্কার পরে সর্বোত্তম স্থান হলো মদিনা শরীফ। হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন—"আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায কাআবা মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের নামাযের চেয়ে এক হাজার গুণ সওয়াব বেশী।" মদিনায় প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য এইরূপ এক হাজার গুণ সওয়াব হয়। হযরত আরও বলেছেন—'মদিনার মসজিদে এক নামায দশ হাজার গুণ নামাযের সমান, বায়তুল মোকাদ্দাসে এক হাজার গুণ নামাযের সমান এবং মক্কার মসজিদে এক নামায এক লক্ষ গুণ নামাযের সমান।' হযরত বলেছেন, —"যে ব্যক্তি মদিনার বিপদ-আপদ সহ্য করে তার জন্য কেয়ামতের দিন আমি সুপারিশকারী হবো।' তিনি আরও বলেছেন—'মদিনাতে মৃত্যু হলে কেয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী হবো।' এই তিন স্থানের পর সীমান্ত ব্যতীত সকল স্থানই সমান, কেননা সীমান্ত শত্রু হতে রক্ষার জন্য পাহারার দরকার এবং তার ফজিলতও বেশী। এই জন্যই হযরত বলেছেন —"তিনটি মসজিদের জন্য ছাড়া তোমার উট বেঁধো না—কাআবার মসজিদ, আমার এই মসজিদ এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাআবা সংলগ্ন বর্তমান মসজিদ হেরেমের পরিচয়

মক্কাশহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশালকায় এক অনিন্দ্যসুন্দর গোলাকৃতি তিনতলা অট্টালিকাকে বলা হয় হেরেম শরীফ বা হরম শরীফ। এই হেরেম শরীফের চতুঃসীমার মধ্যেই প্রাচীনতম ঘর কাবাগৃহ অবস্থিত। এই সীমার মধ্যেই রয়েছে বিখ্যাত জমজম কূপ। সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির চিহ্নিত সীমাও বর্তমানে হেরেম শরীফের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

হেরেম শরীফের মধ্যে পবিত্র শরীরে প্রবেশ করতে হয়। এখানে যে কোনরকম জীবজন্তু, পাখি শিকার নিষিদ্ধ। এমনকি গাছপালা তৃণলতা ছেঁড়াও নিষিদ্ধ। এখানে কোন জিনিষ পড়ে থাকলে মালিক ভিন্ন অন্য কারও স্পর্শ করা উচিত নয়। এখানকার ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বাইরে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। হেরেমের সীমার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়াবিবাদ, হানাহানি সবই হারাম বা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সমস্ত রকম অন্যায় আচরণ করা। সেজন্যই এর নাম হয়েছে হারাম বা হেরেম শরীফ।

হেরেম শরীফের অট্টালিকা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই মসজিদেই অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের বৃহত্তম সালাতের জামাআত। লক্ষ লক্ষ মানুষ একই সঙ্গে সালাতের জামাআতে সামিল হন। বিশ্ববিখ্যাত এই মসজিদে মোট বিশখানা দরজা আছে। এর মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি দরজা, দক্ষিণে সাতটি এবং উত্তর দিকে রয়েছে পাঁচটি। সব দরজাই বিশালাকার ও বহুমূল্য কাষ্ঠনির্মিত। হেরেম শরীফের বর্তমান আকৃতির সবটা একসঙ্গে তৈরী হয়নি। এর সামনের দিকের অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকের একতলা ছোট ছোট গোলাকৃতি গম্বুজ বিশিষ্ট অংশটি যে সময় সৌদি আরব তুরস্কের অধীনে শাসিত হত তখন তুর্কীরাই তৈরী করেছিলেন। এদের তৈরী স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ আজও তা অপরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে। এই অংশের চারদিকে বিশাল নয়নাভিরাম কারুকার্যখচিত বর্তমানের ত্রিতল মসজিদ। মসজিদটি হেরেম শরীফের নামান্তরমাত্র। অপূর্ব এর সৃষ্টি কৌশল। মনোমুগ্ধকর নক্সায় একে সজ্জিত করা হয়েছে। অপূর্বসুন্দর প্রস্তর বিছিয়ে তৈরী করা হয়েছে এর মেঝে। তার উপর মহামূল্য গালিচা পাতা আছে নামাযীদের জন্য।

মসজিদের সামনের সীমানা থেকে কাআবাঘর পর্যন্ত বিশাল উন্মুক্ত ছাদহীন মোটা শ্বেতপাথর বাঁধান চত্বর। এই উন্মুক্ত চত্বর প্রখর রৌদ্র তাপেও কোন সময় গরম হয় না। স্বচ্ছন্দে খালি পায়ে তাওয়াফ করেন আল্লাহ্-র ঘরের তাওয়াফকারীগণ। বিশাল উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশে প্রথমে রয়েছে তুর্কীদের তৈরী মসজিদ তারপর আরও সুবিশাল এলাকা জুড়ে ত্রিতল মসজিদ বা হেরেমের শরীফ। হেরেম শরীফে প্রবেশের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট দরজা সহ চারটি বড়দরজা বা প্রধান প্রবেশ দ্বার। প্রায় পশ্চিম দিকে বাবুল উমরা, প্রায় দক্ষিণ দিকে বাবে আব্দুল আজীজ, উত্তর দিকে বাবুস সালাম, দক্ষিণ পূর্ব দিকে সাফা পাহাড় সংলগ্ন বাবুস সাফা। রয়েছে সাতটি অপূর্ব সুন্দর সুসজ্জিত মিনার। বাবে উমরার উপর দুটি, বাবে (আ:) আজীজের উপর দুটি, বাবুস সালামের উপর দুটি ও বাবুস সাফার উপর একটি নয়নাভিরাম মিনার।

পূর্বে হেরেম শরীফের সীমানা এত বৃহৎ ছিল না। পাহাড় কেটে বিভিন্ন দিক থেকে এর সীমানা বিস্তৃত করা হয়েছে। হেরেম শরীফের প্রথম তলাটি চারদিকে উঁচু এবং ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে কাবাগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এক অভিনব ও বৈচিত্রময়, দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন পৃথিবীর এই বৃহত্তম প্রার্থনাগৃহটি।

হেরেম শরীফের প্রথম তলার পার্শ্ববর্তী স্থান কিছুটা উঁচু। তার নীচে আর একটি তলা আছে। মাটির নীচের এই তলাটিও সুন্দর কারুকার্যময় প্রস্তর দ্বারা শোভিত। মেঝে স্তম্ভ সর্বত্র মোজাইক করা। প্রস্তর খচিত জালি দেওয়া জানালা রয়েছে অনেক। এগুলির মধ্য দিয়ে বাইরের আলোবাতাস প্রবেশ করে। আগে প্রথম ও দোতলায় জায়গা না হলে এখানে নামাযীগন নামায পড়তেন। বর্তমানে এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। পরিবর্তে উপরে আর একটি তলা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে।

মাটির নীচের তলাটিকে ফ্লোর ধরলে প্রথম তলাকে দোতলা এবং দোতলাকে তিনতলা বলা যেতে পারে। এই বিশালতম তিনটি তলা নিয়ে হেরেম শরীফ। তিনতলার উপর ছাদ। হজের মরশুমে ও জুমআর দিনে এই বিশাল আয়তনের তিনটি তলাতেও জায়গা হয় না। তখন হেরেম শরীফের চারদিকের রাস্তা এবং রাস্তা ছেড়ে দূরে অনেক স্থানে জামআতে নামায হয়। মানুষ জায়নামায নিয়ে রাস্তার উপরে, পাশের বাসগৃহের আঙিনায়, ছাদে এমনকি ঘরে বসে হেরেম শরীফের জামাআতে নামায

পড়েন। এক কথায় এ জামাআতের বিশালতা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কত লক্ষ মানুষ একত্রে নামায পড়েন তা হিসাব করে বলা সম্ভব নয়।

হেরেম শরীফের উপরের তলায় মাঝে মাঝে ছোটবড় কামরা আছে। এসব কামরায় বহু মূল্যবান গালিচা ও জাজিম পাতা আছে। হেরেম শরীফের প্রতিটি দেওয়াল, স্তম্ভ, মেঝে কারুকার্যময় মোজাইক খচিত। কিন্তু কাআবাঘরের দেওয়ালে কোথাও কোন কারুকার্য নেই। কাআবাঘরের দরজাটি স্বর্ণনির্মিত।

হেরেম শরীফের প্রথম তলাতে নামাযের স্থান সবচেয়ে বেশী। কাআবার দিকে অনেকখানি উন্মুক্ত। সেখানে কোন ছাদ নেই। পান করার জন্য সর্বত্র পাত্রে জমজমের পানি রাখা থাকে। হেরেম শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রয়েছে আলোকমালায় সুশোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রত্যেক নামাযের জামাআতে মুসল্লীতে ভরে যায় এ অংশ। হেরেম শরীফের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় জমজমের পানির ব্যবস্থা করা আছে। সেখান থেকে সাধারণ মানুষ জমজমের পানি সংগ্রহ করতে পারেন। সকাল থেকে এই মুক্ত প্রান্তর লক্ষ লক্ষ পায়রার ভরে যায়। অসংখ্য পায়রার খাওয়ার জন্য হাজিগণ শস্যদানা ছড়িয়ে দেন এ মাঠে।

হেরেম শরীফের সব কিছু বর্তমানে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত। মোয়াজ্জেন কাবাঘরের পূর্বদিকের দোতলার একটি ঘর থেকে আজান ও একামত পরিচালনা করেন। হজ্জের সময় ইমাম সাহেব কাআবাঘরের পাশে উন্মুক্ত স্থানে মাকামে ইব্রাহীমের পাশে মোলতাজেমের সামনে দাঁড়িয়ে এমামতী করেন। জুমআর দিনে কাআবা শরীফের দরজার পাশে মিম্বার দাঁড় করিয়ে ইমাম সাহেব জুমআর খোতবা পাঠ করেন। এই সমস্ত স্থানের সঙ্গে গোটা হেরেম শরীফের লাউডস্পীকারগুলির সংযোগ আছে। হেরেম শরীফের মাইক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও উন্নত। যে কোন দূরত্ব থেকে ইমামের নামায পাঠ পরিষ্কার শোনা যায়। স্পীকারগুলি এমন সুবিন্যস্তভাবে দেওয়ালের সঙ্গে সাজানো যে সেগুলিও স্থাপত্যশিল্পের কারুকার্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। সুউচ্চ সাতটি মিনারেই শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো আছে এমনি অসংখ্য স্পীকার। তাছাড়াও হেরেম শরীফের মসজিদের বহিঃপ্রাচীরের প্রস্তরবিন্যাসের সঙ্গে মিশে আছে অসংখ্য অনুরূপ স্পীকার। বহির্ভাগে কোথাও একটি তারের সংযোগও নজরে পড়ে না। অথচ সারা মক্কা শহর হেরেম শরীফের সুমধুর আজান ধ্বনির সুরলহরীতে

এক অপূর্ব উন্মাদনায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। একান্ত দূরে দাঁড়ানো নামাযীরও কোন অসুবিধা হয় না এই জামাআতের অংশীদার হয়ে নামায পড়তে বা কেরাত শুনতে। সারা পৃথিবীর জন্য হেরেম শরীফের আজান সৌদি রেডিও থেকে প্রচার করা হয়। যে কেউ সময় মিলিয়ে যে কোন দেশ থেকে এই আজান শুনতে পারেন।

হেরেম শরীফের তত্ত্বাবধান, শৃঙ্খলারক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কয়েকহাজার কর্মী সবসময় কর্মব্যস্ত থাকেন। পরিষ্কার করার জন্য পরিচ্ছন্ন-কর্মীরা দলবদ্ধভাবে অবিরাম পরিষ্কার করে চলেছেন। প্রতিদিনই সমগ্র হেরেম শরীফ ও হেরেম শরীফের উন্মুক্ত প্রান্তর ডেটল পানি দ্বারা পরিষ্কার করে মোছা হচ্ছে। হজের মরশুমে অবিরাম জনস্রোতের জন্য এই অঞ্চলটিতে কর্পেট বিছিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। হজের কয়েকদিন পর থেকে সমগ্র এলাকায় মহামূল্যবান কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি-দিনই কার্পেট উঠিয়ে সমগ্র এলাকাটি ডেটল পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। পরিষ্কার কাজের অধিকাংশ কর্মীই পাকিস্থান ও বাংলাদেশের। পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, ওখানকার কর্মীদের পরিচয় একেবারেই তা নয়। ওঁরা সব কাজই করেন অত্যাধুনিক যন্ত্রের যাহায্যে। চমৎকার সুদৃশ্য এঁদের পোষাক পরিচ্ছদ। আজানের সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা কাজ ছেড়ে জামাতের সামিল হয়ে যেতে পারেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হজে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দগুলির পরিচয়

এহরাম : এহরাম অর্থ কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করা। বিশ্ব সংসারের সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে সকল অন্যায় থেকে বিরত হয়ে এক আল্লাহ্‌র ধ্যান ছাড়া সব কিছু বিসর্জন দিয়ে থাকার সংকল্প করা হল এহরাম (এহরাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তালাবিয়াহ : তালাবিয়াহ হল বিশেষ কতগুলি আরবী শব্দের সমাহার। যেমন "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা শারিকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নেঅমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক্।" এই শব্দ সমষ্টিকে সর্বক্ষণ একান্ত নিবিষ্ট হয়ে পাঠ

করতে হয়। এই শব্দ সমষ্টি পাঠ করাকেই তালাবিয়াহ পড়া বলে। এহরাম শুরু করেই তালাবিয়াহর জেকের শুরু করতে হয়। তালাবিয়াহ দ্বারা একদিকে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করা এবং অন্যদিকে এই উপস্থিতির দ্বারা বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ ভিক্ষা করার দোওয়া করা হয়।

তাওয়াফ ঃ পবিত্র কোরআনে বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মক্কা শরীফে পৌঁছুলে প্রথমেই কাআবা ঘরকে তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফ অর্থ প্রদক্ষিণ করা। কাআবা ঘরের হজরুল আসওয়াদের কোণ থেকে সর্বদা বাঁ হাত কাআবা ঘরের দিকে রেখে এই তাওয়াফ করতে হয়। যেখান থেকে শুরু সেখান পর্যন্ত এলে এক চক্কর হয়। সাত চক্করের কম ঘুরলে তা তাওয়াফ বলে গণ্য হবে না। তাওয়াফ শেষে দুরাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। কোন কোন তাওয়াফে সায়ী করতে হয়। (তাওয়াফ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

তাওয়াফে কুদুম ঃ মক্কা শরিফ পৌঁছুলেই এই তাওয়াফ করতে হয়। এটা হজের ফরজ রোকন নয়। সুন্নত।

তাওয়াফে যিয়ারাত ঃ ১০ই যিলহজ্জ মীনাতে কোরবাণী দিয়ে বা ১১ অথবা ১২ তারিখে মীনা থেকে মক্কা শরীফ এসে যে তাওয়াফ করতে হয় তাকে তাওয়াফে যিয়ারাত বলে। এটি হজের ফরজ রোকন।

তাওয়াফে বেদা ঃ হজের সকল কাজ শেষ করে দেশে ফেরার বা মক্কা শরীফ ত্যাগ করার আগে যে তাওয়াফ করতে হয় তাকে তাওয়াফে বেদা বলে।

সায়ী ঃ সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ে পার হওয়াকে সায়ী বলে। সাতবার সাফা মারওয়া যাওয়া আসা করলে একটা সায়ী করা সম্পূর্ণ হয়। সায়ী অর্থ হাঁটা ও দৌড়ানর মাঝামাঝি রকম চল।

রমল ঃ যে সকল তাওয়াফের পর সায়ী করতে হয় সেই সকল তাওয়াফের প্রথম চক্করে বীর বিক্রমে কাঁধ হেলিয়ে সজোরে ঘন ঘন পা ফেলে দ্রুত পদে চলাকে 'রমল' বলে। রমল শব্দের অর্থ হল হাঁটা ও দৌড়ানর মাঝামাঝি অবস্থায় বীরদর্পে চলা।

এজতেবা ঃ যে সকল তাওয়াফের পর সায়ী করতে হয় সেই সকল তাওয়াফ শুরু করার আগে এহরামের যে কাপড়টি চাদরের মত গায়ে দেওয়া

আছে তাকে ডান বগলের নিচে থেকে পেঁচিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেওয়া ও ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখাকে এজতেবা বলে।

মাকামে ইব্রাহিম : কাআবা ঘরের পূর্ব দিকে হযরত ইব্রাহিমের পদচিহ্ন সম্বলিত একটি পাথর কাঁচের বেড়ির মধ্যে রাখা আছে এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহিম কাআবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এই রক্ষিত পাথরের আশপাশটাই হল মাকামে ইব্রাহিম।

হাতিম : কাআবা শরীফ সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার দেওয়াল ঘেরা জায়গাকে 'হাতিম' বলে। হাতিম প্রাচীন কালে কাআবা ঘরের অংশ ছিল। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাআবা ঘর পুনঃ নির্মাণের সময় নিশ্চিহ্নপ্রায় ⅔ অংশ নিয়ে কাআবা ঘর তৈরী করেন আর বাকী ⅓ অংশ খালি পড়ে থাকে। এই খালি ভিটিকেই হাতিম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং হাতিম হল কাআবা শরিফেরই একটা অংশ। এখানে নামায পড়লে কাআবা শরীফের মধ্যেই নামায পড়া হয়। এটি দোওয়া কবুলের জায়গা।

মিজাবে রহমত : হাতিমের মধ্যে একটি পাথরের উপর পবিত্র কাআবা ঘরের ছাদের পানি পড়ে। ছাদের পানি পাড়ার জন্য একটি সোনার নল আছে, এই সোনার নলটিকেই মিজাবে রহমত বলে। মিজাব আরবী শব্দ। মিজাব অর্থ নল। কখনও বৃষ্টি হলে এই পানি সংগ্রহের জন্য ভিড় আরম্ভ হয়। এই পানি পান করতে পারলে যাবতীয় রোগমুক্তি ঘটে।

মুলতাযিম : পবিত্র কাআবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখণ্ড বেহেশতি পাথর লাগান আছে। এখান থেকে কাআবা ঘরের দরজা পর্যন্ত দেওয়ালের অংশটিকে মুলতাযিম বলে। অর্থাৎ হজরে আসওয়াদ ও কাআবা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী অংশটি হল মুলতাযিম।

বাবুল সালাম : মসজিদুল হারামের পূর্বদিকের যে দরজা থেকে প্রিয়নবী বেশীর ভাগ সময় কাআবা শরীফে প্রবেশ করতেন তা হল বাবুস সালাম।

বাবুল বিদা : মসজিদুল হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিককার দরজা। বহিরাগত হাজিগণ সাধারণতঃ কাআবা ঘরকে সামনে রেখে এই দরজা দিয়ে বের হয়ে আসেন।

রুকনে ইয়েমেনী : আরবী রুকন শব্দের অর্থ হল 'কোণ' ইয়েমেন দেশের দিকের কোণকে রুকনে ইয়েমেনী বলে। কাআবা শরীফের দক্ষিণ

পশ্চিম কোণটি হল রোকনে ইয়েমেনী। রোকনে ইয়েমেনী থেকে হজরুল আসওয়াদ পর্যন্ত অংশটিতে প্রার্থনা করার জায়গা। প্রিয় নবী তাই করতেন।

অনুরূপ ভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের ইরাক ও সিরিয়ার দিকের কোণকে যথাক্রমে রোকনে ইরাকী ও রোকনে শামী বলা হয়।

বাবুস সাফা : তাওয়াফ শেষ করে এই দরজা দিয়ে সায়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়া হয়।

মীনা : মীনা বা মুনা আরবী শব্দ। মীনা অর্থ প্রবাহিত। মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে মাইল তিনেক দূরের একটি প্রান্তর। এখানে সকল হাজিকেই ৮ই যিলহজ পৌঁছুতে হয়। এখান থেকেই ৯ই যিলহজ আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হয়। ৯ই যিলহজ দিন গত রাত ছাড়া ১৩ তারিখ পর্যন্ত হাজিগণকে এখানেই থাকতে হয়। কোরবানী ও শয়তানকে কাঁকর মারার জায়গাও এখানে। এখানের মসজিদে কবসেই হযরত ইব্রাহিম হযরত ইসমাইলকে কুরবানীর জন্য ছুরি চালিয়ে ছিলেন।

মসজিদে খায়েফ : মীনাতে অবস্থিত এক প্রসিদ্ধ মসজিদ। এই মসজিদের মধ্যস্থলে হযরত মোহাম্মাদের (সাঃ) হজ মরশুমে অবস্থানের জায়গাটি একটি স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা আছে।

আরাফাত : মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে পর্বত বেষ্টিত এক বালুকাময় প্রান্তর। এখানেই ৯ যিলহজ যোহরের পরে অবস্থান করলেই হজের প্রথম ও প্রধান কাজ করা হয়। বেহেশত থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হযরত আদম ও হাওয়া এখানেই পরস্পরকে চিনতে পেয়েছিলেন। আরাফা আরবী শব্দ। আরাফা শব্দের অর্থ চিনতে পারা।

জাবালে রহমত : আরাফাতের মাঠের একটি পাহাড়। হজের সময় এরই সন্নিকটে অবস্থান করতে হয়। এই পাহাড়ের উপর হযরত আদম তিনশত বছর সেজদায় থেকে কাঁদাকাটা করে নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন এবং তা মঞ্জুর হয়েছিল। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিদায় হজের খোতবা পড়েছিলেন। আর দায়িত্ব পালনে পূর্ণতা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন।

উকুফে আরাফাত : অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানের অংশের মধ্যে হজের দিন অবস্থান করা। এই এলাকার মধ্যে অবস্থান না করলে হজ হবে না। এই জায়গা পিলার দিয়ে সীমা করা আছে। ৯ই যিলহজ জোহরের

পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থানকে ওকুফ বলে। এটা হজের মূল অঙ্গ।

মসজিদে নামেরা : আরাফাত ময়দানের সুবৃহৎ মসজিদ। এখানে ফেরেশতা জিব্রাইল (আ:) হযরত ইব্রাহিমকে হজের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া পরস্পরকে চিনতে পেরেছিলেন।

মুজদালেফা : মীনা ও আরাফাতের মাঝখানের একটা জায়গার নাম। আরাফাত থেকে ফিরে এখানে রাত্রি যাপন করতে হয়। হযরত আদম ও হাওয়া আরাফাত থেকে ফিরে এখানে রাত্রিবাস করেছিলেন।

মসজিদে মাশআরিল হারাম : মুজদালেফাতে একটা ছোট পাহাড়ের নাম জাবালে কোজাহ বা মাশআরিল হারাম। পরে এখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এখানে গোনাহ মাফ হয়ে থাকে।

মোহাসসর : আরাফাত থেকে মীনায় ফেরার পথে একটি প্রায় সাড়ে পাঁচশত হাত নীচু জায়গা। কাআবা ঘর ধ্বংস করতে আসা দাম্ভিক সম্রাট আবরাহা এখানেই আল্লাহ্‌র অভিশাপে আবাবিল পাখির কাঁকরের আঘাতে স্বদলে ধ্বংস হয়।

জোমারা : মীনাতে শয়তানকে কাঁকর মারার জন্য নির্দ্ধারিত স্থান। ছোট শয়তান, মেজ শয়তান ও বড় শয়তান নামে তিনটি জায়গায় তিনটি স্তম্ভ আছে। এখানে হাজিদের নিয়মমত কাঁকর মারতে হয়। যখন হযরত ইব্রাহিম হযরত ইসমাইলকে কোরবানীর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান এই তিন জায়গায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। সেই ঘটনা স্মরণ করে এখানে কাঁকর মারা হয়।

রমী : রমী শব্দের অর্থ ছোঁড়া। মীনায় শয়তানকে কাঁকর মারাকে রমী করা বলে।

জাবালে নূর : এই পাহাড়টিই বিখ্যাত গারে হেরা অর্থাৎ হেরা গুহাটি এই পাহাড়ের চূড়াতেই অবস্থিত। এখানেই হযরত নবুয়তের পূর্বে ছমাস নির্জনে ধ্যান করেছিলেন। এখানেই তিনি প্রথম আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ লাভ করেন। আল্লাহ্‌র পবিত্রবাণী কোরআনের প্রথম আয়াত এখানেই অবতীর্ণ হয় মর্ত্যবাসীর কল্যাণের দিশারী হিসাবে।

জাবালে সুর : এইটিই জাবালে নূর থেকে কিছু দূরের একটি পাহাড়।

নাম সুর পাহাড়। হিজরতের সময় হযরত আবু বকরের সঙ্গে প্রিয় নবী এই পর্বতের গুহাতেই শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন।

জাবালে আবু কোবায়েস: সাফা পাহাড়ের সংলগ্ন একটি সুউচ্চ পাহাড়। এটি মাসজেদুল হারাম থেকে দেখা যায়। এই পাহাড়ের নাম আবু কোবায়েস। আরবী জাবাল শব্দের অর্থ হল পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় হযরত বেলালের মসজিদ আছে। কাআবা গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ করে হযরত ইব্রাহিম আল্লার নির্দেশে এই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে লোকেদের হজের জন্য আহ্বান করেছিলে। হজরে আসওয়াদকে বেহেশত থেকে এনে প্রথমে এই পাহাড়ে রাখা হয়েছিল। নূহ নবীর যুগে প্লাবনের সময় পুনরায় এই পাথরকে এই পাহাড়েই গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। এই পাহাড়ে দাঁড়িয়েই প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জের উত্তর স্বরূপ অঙ্গুলি নির্দেশে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। হযরতের এই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করাকে শাক্কাল কামার বলে।

মাউলুদুন নবী: আব্দুল মোত্তালেবের বাড়ী। এখানেই মোহাম্মাদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

দারে আরকাম: সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী জায়গা। এখানে প্রিয়নবী আসহাব সহ অন্তরালে বাস করেছিলেন এখানেই হযরত ওমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

মসজিদে রায়া: মক্কা বিজয়ের পর এখানেই প্রথমে ইসলামী ঝাণ্ডা ওড়ান হয়েছিল।

মসজিদে দব: মক্কা শরিফে বসবাস কালে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অনেক সময় এখানে আশ্রয় নিতেন। সুরা ওয়াল মুরসেলাত এখানে অবতীর্ণ হয়।

মসজিদে আকাবা: হিজরতের পূর্বে মদিনার ৬০ জন তীর্থযাত্রী এখানে হযরতের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় গিয়ে তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এখানেই তাঁরা হযরতকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

আইয়ামে তাশরিক: ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত দিনগুলোকে একত্রে 'আইয়ামে তাশরিক' বলে।

তাকবীর-এ-তাশরিক : আরবী "আল্লাহো-আকবার, আল্লাহো-আকবার, আল্লাহো-আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ" এই বাক্যটিকে 'তাকবিরে তাশরিক' বলে।

হালাক্ : সায়ীর পর মস্তক মুণ্ডন করাকে হালাক্ করা বলে।

দম : এহরাম অবস্থায় কোন ক্রটি বিচ্যুতি বা নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় তাকে 'দম' বলে। ছাগল ভেড়া দুম্বা ইত্যাদি জানওয়ার কোরবানীর দ্বারা দম দেওয়া যায়। দম বলতে বকরী, দুম্বা অথবা গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির ⅐ অংশ বুঝায়। সাদকা বললে এক ফিতরার পরিমাণ দান বুঝায়। দম হেরেমের সীমানার মধ্যে দিতে হবে।

ওমরাহ : 'ওমরাহ্' আরবী শব্দ। ওমরাহ অর্থ যিয়ারাত। হজের নির্দিষ্ট দিনগুলি অর্থাৎ ৮ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ-এর দিনগুলি বাদ দিয়ে বাকী দিনে নির্দ্ধারিত পন্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করে তাওয়াফ ও সায়ী করাকে ওমরাহ বলে। শরীয়তী অর্থে এটাই ওমরাহ। মক্কা শরীফে থাকার সময় মক্কার অনতিদূরে 'তানয়িম' বলে একটি জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে এহরাম বেঁধে এসে তাওয়াফ ও সায়ী করলে একটি ওমরাহ করা হয়। হাদিসে আছে সাত ওমরাহ করলে একটা হজের সওয়াব (পুণ্য) পাওয়া যায়।

মিকাত : পবিত্র ভূমি মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য চতুর্দিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বিশেষ জায়গা থেকে এহরাম বাঁধার স্থান। হজ ও ওমরাহকারীদের এই স্থান অতিক্রম করার আগেই এহরাম বাঁধতে হবে। ভারতীয়দের মিকাত হল ইয়ালামলাম পাহাড়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাড়ি থেকে হজের ভ্রমণ শুরু

প্রথমে বাড়ী থেকে যাত্রা শুরুর আগেই পরিচিত পরিজন আত্মীয় বন্ধু সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, এই সময় প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিৎ। যে সকল ঋণ ও দায়দায়িত্ব আছে তার সুবন্দোবস্ত

করে দেওয়া দরকার। কারও কোন গচ্ছিত সম্পদ থাকলে তা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। এরপর সঙ্গী হিসাবে ধার্মিক সৎ ও বুদ্ধিমান লোককে নির্বাচন করে নেওয়া কর্তব্য। বাড়ী থেকে যাত্রা শুরুর আগে দুরাকাত নফল নামায পড়ে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে করুণাময় আল্লাহর কাছে সকল প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা উচিৎ।

তারপর একান্ত শান্ত সংযত হয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে অথবা দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছুতে হবে। হাওড়া ষ্টেশনে দেখা যায় অহেতুক অসংখ্য লোক গিয়ে ভিড় করে সকলের অপরিসীম কষ্টের কারণ হয়। যাতে এই কষ্ট না হয় তার জন্য ধৈর্য সহকারে সারিবন্দি হয়ে ট্রেনে ওঠার আয়োজন নিজেদেরই করে নেওয়া উচিৎ। তাতে নিজের যেমন আরাম হবে তেমনি অন্যের স্বাচ্ছন্দ্যেও সহায়তা করা হবে। মনে রাখতে হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ এবাদাতের জন্য রওয়ানা হতে গিয়ে শুরুতেই যেন কোন অন্যায় করা না হয়। হযরত ওমর একবার নবীজীকে বললেন "আমরা আর কতদিন কাআবা গৃহে নামায পড়া থেকে বিরত থাকব?" তখন প্রিয় নবী মুসলমানদের বললেন "তোমরা সারিবন্দি হও এবং সংযত ও ধীর পদক্ষেপে বিনয়াবনত ভাবে কাআবা ঘরে নামায পড়ার জন্য অগ্রসর হও।" তাই আজ যাঁরা কাআবা ঘরে আরাধনার জন্য প্রথম যৌথ সফর শুরু করছেন তাঁদের উচিৎ তেমনি করে সুশৃঙ্খল হয়ে যাত্রা শুরু করা। ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ এবাদাত হজের অনেক খানিই মানব জীবনের শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা।

এখানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেদিন ১৯৮৫ সালের ২৭ জুলাই, শনিবার। আমার যাওয়ার জন্য নির্ধারিত গাড়ী গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। যদিও ট্রেন আড়াইটা নাগাদ তবুও আমাকে পৌঁছুতে হল বেলা ১২টার আগে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাজিদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বেলা ১২টায় হাওড়া স্টেশন চত্বরেই একটি বিদায়ী সভার আয়োজন করেছেন। ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্যই বাড়ী থেকে ১১টায় বের হতে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি গোটা স্টেশন চত্বরই এক উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। যত্র তত্র জিনিসপত্রের পাহাড় হয়ে আছে। কোন নিয়ম নীতি কেউই মানছেন না। কয়েকবার স্টেশন সুপার বিষয়টার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমরাও মাইকে তারস্বরে সংযত হওয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকলাম।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক একজন হাজিকে ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে অসংখ্য উচ্ছৃঙ্খল জনতা বিদায় জানাতে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন। এতটুকু শালীনতাবোধ নেই। প্রায় মারদাঙ্গা করেই বীরত্ব সহকারে অশোভন আচরণ করে চলেছেন। অনেকটা কলকাতার বিজয়া দশমীর আর মহরমের দিনের মিছিলের উন্মাদনার সমান। আশপাশ থেকে সকল সভ্য মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছেন। নিরুপায় হয়ে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করছেন। বিধর্মীদের ধারণা হচ্ছে এঁরা মক্কা শহরে তাণ্ডব করতে যাচ্ছেন। আর এরকম তাণ্ডবই বোধহয় হজের অঙ্গ। রাগে দুঃখে আমার ভিতরটা জ্বালা করতে লাগল। সত্যিই তো এই অজ্ঞ উচ্ছৃঙ্খল জনতায় আচরণ অন্য সকল সহযাত্রীর অশেষ কষ্টের কারণ সৃষ্টি করছে। কত বড় প্রাপ্তির জন্য এরা চলেছেন মহানবীর দেশে মহাপ্রাপ্তির আশায়। হাজার মানুষের দৃষ্টিতে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি পালনের শুরুতেই এমনি স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন সকল বিধর্মী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে মুসলমানদের চলাফেরা আচার আচরণ দেখেই তো হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রোমান সভ্যতাও ম্লান হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। আর আজ সেই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একদল মানুষের আচরণে, চলাফেরায় ক্ষুব্ধ মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছেন, ঘৃণায় দূরে সরে যাচ্ছেন। নিজের কৃতকর্মের বেদনায় যখন ভারাক্রান্ত থাকার কথা, যখন তাঁদের আচরণ দেখে দূর থেকে মানুষের আবিষ্ট চিত্তে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে আকৃষ্ট হওয়ার কথা, তখনই তাঁদের আচরণে ক্ষুব্ধ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে এক তিতিবিরক্ত ধারণা তৈরী হচ্ছে। ভেবে দেখতে হবে আজকের এই আচরণ হজের পরিপন্থী কিনা। আমার তো মনে হয় এসব বিষয় শিক্ষা পাওয়ার আগে হজের প্রয়োজন নেই। ইসলামকে এভাবে সর্বসমক্ষে হেয় করে ফেলার অপরাধ মুক্ত হওয়া সহজ নয়।

তারপর যথাসময়ে সভা শেষ হল। এবার ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা উন্মাদনার চেহারা নিল। আমি বিস্ময়ে হতবাক। হযরত ওমরের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রথম মুসলমানদের কাআবা ঘরে নামাযের জন্য অগ্রসর হতে অনুমতি দেওয়ার সময় সারিবন্দি হয়ে সংযত ও ধীর পদক্ষেপে বিনম্রাবনত হয়ে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন আর সেই কাজ করতে চলেছেন আমাদের দেশের হাজিরা চরম উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার মধ্য দিয়ে। ব্যথায় মনটা কুঁকড়ে গেল।

আমাকেও যেতে হবে এই জনতা ভেদ করেই। আমি স্ত্রী পুত্র সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম উচ্ছৃঙ্খলতার চাপে। কে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। কোচ নম্বরটা জানা ছিল সেইমত কোনক্রমে গিয়ে অতি কষ্টে ট্রেনের কামরায় উঠলাম। এই কামরা সম্পূর্ণরূপে হাজিদের জন্য। ফলে অন্য যাত্রী নেই। আর একবার চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচা যাবে। চরম অশালীনতা ভেদ করে কোনক্রমে নিজের সিটের কাছে গেলাম। সেখানে দেখলাম আমার অ্যাটাচি আর কাঁধের ব্যাগটা আমার ছেলে, শ্যালক ও নূরুল সাহেব মিলে কোনক্রমে পৌঁছে দিয়েছেন। সকলেই ঘর্মাক্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত। গোটা প্লাটফর্মে তখনও তাণ্ডব চলছে সমানে। ট্রেনের ভেতর গিয়ে দেখি দড়ির জালের মধে বড় বড় ট্রাঙ্ক। বিস্ময়ে অবাক হলাম। এ সবে কি হবে। জানলাম এতে এক এক জন হাজি সাহেবের জিনিসপত্র আছে। এতে মনে হল এরা ঐ দেশে স্থায়ী বসবাস করার জন্য সংসারের সব জিনিস গুছিয়ে নিয়ে চিরকালের মত দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। নির্বাক হয়ে দেখলাম। আর দেখলাম তাঁদের বাড়ীর লোকজন উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে বীরত্ব প্রকাশ করতে পারায় রীতিমত গর্বিত। কত লোকের কষ্টের, দুঃখের, ক্ষোভের ও ঘৃণার কারণ তিনি ঘটালেন তা বোঝার মত ক্ষমতা, মানসিকতা, শিক্ষা কোনটাই নেই। এমনি এক অস্বস্তিকর মন নিয়েই সকলকে বিদায় জানাতে হলো। নির্দিষ্ট সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। তখন ঘড়িতে ২-৩৫।

ট্রেনে উঠে নিজের নির্দ্ধারিত আসনে বসে বিশ্রাম করা এবং সময়মত নামায আদায় করা উচিৎ। তবে অনেকেই ট্রেনের যেখানে সেখানে বসে ওজু করতে শুরু করে দেন। ফলে ট্রেনের কামরা পানিতে নোংরা হয়ে যায় এবং অন্যের কষ্টের কারণ হয়। একাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হতে হবে। ট্রেনের বাথরুম ছাড়া কোথাও পানি ফেলা উচিত নয়। এইভাবে পৌঁছুতে হবে বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে। সেখান থেকে ট্যাক্সি, অটো ইত্যাদিতে সোজা মোসাফির খানায়। এখানে সমুদ্র পথে বা আকাশ পথে যাত্রা শুরুর ৩/৪ দিন আগেই পৌঁছে যাওয়া দরকার। এখানেই কেন্দ্রীয় হজ্ব কমিটির অফিস। এই অফিস থেকে টিকিট টাকা ইত্যাদি সবই ঠিকঠাক করে নিতে হবে। সমুদ্রপথের যাত্রীদের জন্য কুলি নির্বাচন বাধ্যতামূলক। এখানে কুলির লোকজনই রেল ষ্টেশনে দেখা করে থাকেন। পাসপোর্ট, ভিসা সবই কুলিরা ব্যবস্থা করে দেবেন। জিনিষপত্রে কুলির নম্বর লাগিয়ে

নিতে হবে। কুলির নম্বর অনুযায়ী জাহাজে সিট নম্বর থাকবে ও এই নম্বরের লোকজনই সমস্ত মালপত্র জাহাজে উঠিয়ে ঠিক ঠাক করে দেবেন।

পাসপোর্ট, বসন্তের টিকা, কলেরার ইনজেকশন ইত্যাদির জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট রাজ্য হজ্জ দফতর থেকে সংগ্রহ না করে থাকলে এখানে সেটা সংগ্রহ করে নিতে হবে। যাঁরা বিমানে যাবেন তাঁদের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর থেকে বিমানে উঠতে হবে। আর যারা সমুদ্র পথে জাহাজ যোগে যাবেন তাদের বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহাজে আরোহণ ও অবস্থান

নির্দিষ্ট দিনে নিজের পাসপোর্ট, জাহাজের টিকিট বিদেশী মুদ্রার ড্রাফট, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চেক করে নিয়ে জাহাজে ওঠার জন্য সকাল সকাল জাহাজ ঘাটায় রওয়ানা দিতে হবে। এখানে প্রত্যেকের মালপত্র চেকিং হবে। তারপর নিজ নিজ নম্বরের কুলি ঐ সকল মালপত্র সহ হালকা জিনিসপত্র প্রত্যেকের সিটের কাছে রেখে দেবেন। বাকি মালপত্রও তাঁরাই ক্রেন যোগে জাহাজে তোলার ব্যবস্থা করবেন। নিজের নিজের সিটে গিয়ে বিশ্রাম করা ও আল্লাহ্‌র আরাধনা করা ছাড়া কোন কাজ নেই কারো। এসব কাজ সেরে জাহাজ ছাড়তে প্রায় রাত ১০/১১টা হয়ে যায়।

আরব সাগর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর। এই উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে জাহাজ এগিয়ে চলবে। প্রতি মুহূর্তের ক্ষিপ্ত বিরাট তরঙ্গাঘাতে জাহাজ টলমল করতে থাকবে। এই সময় প্রায় যাত্রীই সী সিকনেসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এইভাবে আরব সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রায় সপ্তাহ কাল পরে জাহাজ এডেন বন্দরের সামনে আসবে। জাহাজ থেকে এডেন বন্দর দেখা যাবে। এসময় যাত্রীরা অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বিরাট জাহাজ খানিতে প্রথম শ্রেণী ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রকোষ্ঠ থাকবে। এর বিভিন্ন নম্বর থাকবে যেমন এফ জি ইত্যাদি। আর, থাকবে সিট নম্বর। এখানে সবকিছুই নিয়মে বাঁধা। পানীয় জল নির্দিষ্ট সময়

সময় থাকবে। জাহাজে মাইক যোগে সেই সময়সীমা জানান হবে। নির্দিষ্ট সময় খাবার জন্য ঘোষণা হবে সেই সময় নিজ নিজ সিটে থাকতে হবে। জাহাজের কর্মীরা প্রত্যেক সিটে খাবার পরিবেশন করবেন। সকালে চা বিস্কুট, একটু পরেই সকালের নাস্তা, তারপর দুপুরে ভাত, বিকেলে চা বিস্কুট এবং রাতে রুটি সরবরাহ করা হয়।

প্রত্যেক যাত্রীকে ধৈর্য্য সহকারে পানি ও খাবার নিতে হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলেই বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং তা অন্যেরও কষ্টের কারণ হবে। এই সময় কেউ যেন অহেতুক তাড়াহুড়ো না করেন। এরকম করলে যেমন অশোভনীয় হয় তেমনি অসুবিধার কারণ ঘটে।

গোসলের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্নানাগার ও মলমূত্র ত্যাগের জন্য শৌচাগার আছে। নারী পুরুষ প্রত্যেকের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। ডেক শ্রেণীর জন্য সর্বক্ষণ সমুদ্র জল চালু থাকে আর স্নানের জন্য নির্দিষ্ট সময় মিষ্টি জল চালু থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তার প্রতিকারের দায়িত্ব আমিরুল হজের। তাই যাত্রীদের যেমন সহযোগিতা কাম্য তেমনি সচেতনতাও দরকার। অসুবিধাগুলির প্রতিকারের জন্য আমিরুল হজকে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাতে হবে যাত্রী সাধারণকেই।

জাহাজের গোসল খানায় কারোর প্রস্রাব করা উচিৎ নয়। ওজুর সময় এমন এমন জায়গায় বসা দরকার যেখানে পানি জমে থাকবে না। জাহাজে ক্যানটিন ও সেলুন আছে। তবে জাহাজে কোন ভারতীয় মুদ্রা চলবে না। কেবলমাত্র মোগল লাইনের কুপন ও সৌদি রিয়াল চলবে। তাই জাহাজে চড়ার আগেই মোসাফির খানায় মোগল লাইনের অফিস থেকে যথেষ্ট সংখ্যক কুপন ক্রয় করে নেওয়া দরকার। ক্যানটিনে রুটি, ডিম, নানারকম ফল, সিগারেট ও ঠাণ্ডা পানীয় পাওয়া যাবে। তাছাড়া চা পাওয়া যায়।

এই সময় অখণ্ড অবসর। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই জাহাজের যেখানে জামাআত হয় সেখানে নামায পড়া দরকার। কারণ প্রত্যেক নামাযের পরই হজ বিষয়ে নানা রকম শিক্ষামূলক আলোচনা হয়ে থাকে।

আরব সাগরের স্বচ্ছ লবণাক্ত নীল জল। কদিন যাবৎ কোথাও কিছুই দেখা যাবে না। শুধু জলরাশি। অফুরন্ত জলরাশির বুক চিরে চলেছে জাহাজ। যারা সুস্থ থাকবেন তারা ডেকে গেলে নানারকম নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পাবেন। বিশেষতঃ সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। আরব সাগরে এক ধরনের মাছ দেখা যাবে যারা ছোট ডানার সাহায্যে ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের

জলরাশি ভেদ করে বেশ কিছুটা শূন্যে উড়ে গিয়ে আবার সমুদ্রের জলরাশিতেই নিমজ্জিত হবে। দেখতে সুন্দর এই উড়ন্ত মাছ। সাদা ধবধবে একটু চ্যাপ্টা ছোট পারশে মাছের মত দুটি ডানাওয়ালা মাছ। তাছাড়া বড় বড় মাছের ঝাঁকও দেখা যাবে স্বচ্ছ জলরাশিতে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এডেন বন্দর ছাড়িয়ে জাহাজ লোহিত সাগরে প্রবেশ করবে। লোহিত সাগরের পানির রং ঈষৎ সবুজ ও বহু চোরা পাহাড় আছে। তাছাড়াও দেখা যাবে লোহিত সাগরের জলরাশি ভেদ করে বহু পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করছে। দেখতে দেখতে দুদিন কেটে যাবে। জাহাজ কামরান দ্বীপের ইয়ালামলাম পাহাড়ের কাছে পৌঁছে যাবে। ভারত ও পূর্বদেশীয় লোকেদের জন্য এটি হল মিকাত। এই পাহাড় অতিক্রম করার আগেই এহরামের কাপড় পরতে হবে। এই জায়গায় পৌঁছানর আগেই জাহাজ থেকে আমিরুল হজের অফিস থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হতে থাকবে এবং প্রত্যেক রাজ্যের অফিসার মারফৎ নিজ নিজ ভাষায় ও ইংরেজীতে করণীয় বিষয় এবং সময় সবই জানান হবে। ঘোষণামত সকল হজ যাত্রীকে এহরাম বাঁধার জন্য তৈরী হতে হবে। হাজামতের যাবতীয় কাজ শেষ করে গোসল করে তৈরী হতে হবে এহরাম বাঁধার জন্য। আজকে এহরামের জন্য ৬/৭ ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সর্বক্ষণ মিষ্টি পানি চালু থাকবে সব গোসল খানাতেই। ইতিপূর্বে এহরামের কাপড় পরার যাবতীয় নিয়ম অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। তার পরই এহরামের নিয়ত করে তালাবিয়াহ পড়া আরম্ভ করতে হবে। এহরামের অধ্যায়ে তালাবিয়াহ ও এহরাম উল্লিখিত হয়েছে।

জাহাজের অনেকেই আলেম সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে নামাযের যাবতীয় নিয়ম কানুন জেনে নেওয়া যাবে। এখন থেকে বিশ্ব সংসারের সকল মায়া মমতা ত্যাগ করে একমাত্র লাব্বায়েককে জপমালা করে সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। এডেন বন্দর ছাড়ার পর তৃতীয় দিনে জাহাজ জেদ্দা বন্দরে পৌঁছে যাবে। এবার পবিত্র ভূমি স্পর্শ করার পালা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমান পথে হজ যাত্রা

বিমানে আরোহনের প্রস্তুতি, অবস্থান ও অবতরণ।

যাঁরা বোম্বাই থেকে আকাশ পথে বিমানে হজে যাবেন তাঁদের বোম্বাই কেন্দ্রীয় হজ অফিস থেকে নিজে বা কুলি মারফত পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট, সৌদি রিয়েলের ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য বিমান ছাড়ার তারিখের অন্তত দু তিন দিন আগেই বোম্বাই পৌঁছে মোসাফিরখানায় বা নিজ ব্যবস্থায় কোন হোটেলে থাকতে হবে। বিমান ছাড়ার দিন সকালের জন্য কোন কাজ ফেলে রাখা যাবে না। তার আগেই সব কাজ শেষ করে জিনিসপত্র গোছগাছ করে তৈরী করে নিতে হবে।

বিমান ছাড়ার দিন সকালে গোসল করে দুরাকাআত নফল সালাত (নামায) আদায় করে এহরামের কাপড় পরে তৈরী হয়ে যেতে হবে। বিমান বন্দরের জন্য যাত্রা শুরুর আগেই দুরাকাআত সালাতুল এহরাম আদায় করে নিয়ত করে নিতে হবে। এখন থেকেই শুরু হল তালাবিয়াহ পড়া। অর্থাৎ এহরাম অবস্থা শুরু হয়ে গেল। এ কাজটা এখান থেকে করতে হবে এজন্য যে আকাশ পথে মিকাতের সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয় কিম্বা দ্রুতগতি সম্পন্ন বিমান কোন মুহূর্তে মিকাত অতিক্রম করবে তা বোঝাও সম্ভব নয়। তাছাড়া বিমান বন্দরে বা বিমানে সালাতুল এহরাম আদায়ের সুযোগ পাওয়াও সম্ভব নয়। এজন্যই নিজের থাকার জায়গা থেকেই এহরাম বেঁধে নিয়ত করে নেওয়া দরকার। এহরাম পরার পর থেকে সর্বক্ষণ তালাবিয়াহ পড়তে হয়। এটাই হজের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মক্কা শরিফ রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এহরাম পরে নিয়ত করলেই খেতে শুতে, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, সাক্ষাতে বিদায়ে, স্থান পরিবর্তনে এক কথায় সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে তালাবিয়াহ পড়া বাধ্যতামূলক।

বোম্বাই শহর থেকে বিমান বন্দর বেশ দূরে। গাড়ীতে প্রায় ঘন্টাখানেকের পথ। তা ছাড়া গাড়ী ঘোড়া বিকল হওয়ার সম্ভবনাতো থাকেই। এয়ার পোর্টে উপস্থিত হয়ে যথাসময় রিপোর্ট করে—'বোডিং পাস' সংগ্রহ করতে হবে। তাই আগে ভাগে হাতে সময় নিয়ে যাত্রা শুরু করা ভাল। বিমান বন্দরে পৌঁছে নির্দিষ্ট নম্বরের বিমানের (নম্বর প্রত্যেক টিকিটে লেখা

আছে) জন্য পৃথক পৃথক লাইন আছে। সেইমত লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের সব জিনিষপত্র ওজন করিয়ে এখানে দিয়ে দিতে হবে। কেবল সঙ্গে রাখার জন্য ফোলিও ব্যাগ, কিট ব্যাগ, বা ছোট এ্যাটাচি জাতীয় একটি ব্যাগে বিমানে অবস্থান সময় দরকার হতে পারে এমন জিনিষ নিজের কাছে রাখা যাবে। তাছাড়া সব জিনিষ ওজন করিয়ে লাগেজে দিয়ে দেওয়াই উত্তম। এভাবে লাইন দিয়ে জিনিষ পত্র বিমানে ওঠানর জন্য লাগেজে দিয়ে দিলে বিমান কর্তৃপক্ষই জিনিষ পত্রের উপর নম্বর যুক্ত 'ট্যাগ' লাগিয়ে দেবেন। আর তার অপর অংশে ঐ নম্বর লেখা সহ আপনাকে ফেরত দেবেন। এটা যত্ন করে রাখতে হবে। বিমান থেকে নেমে জেদ্দায় এই নম্বর মিলিয়ে আপনার জিনিষ পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। হাতের জিনিষের জন্যও একটা কেবিন ব্যাগেজ ট্যাগ নিয়ে সঙ্গের জিনিষে লাগিয়ে নিতে হবে। এতে এবং বোর্ডিং পাসের কার্ডের উপর সিকিউরিটি অফিসার সই করে ছাপ দিয়ে না দিলে বিমানে উঠা যাবে না। তাছাড়া এই সিকিউরিটি অফিসারের সামনে থেকে ছাড়া বিমানে উঠতে যাওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সিকিউরিটির মধ্য থেকেই যেতে হবে। এছাড়া সঙ্গের সব জিনিষই খুলে তন্ন তন্ন করে করে চেক করা হবে এবং সারা শরীরও বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে চেক করা হবে। সুতরাং যত কম জিনিষ সঙ্গে থাকবে তত সুবিধা হবে। জিনিষের সঙ্গে কোন ছুরি জাতীয় কিছু রাখা যাবে না। ছুরি কাঁচি যা আছে তা লাগেজের জিনিষের সঙ্গে রাখতে হবে।

প্রথমে যেখানে নির্দিষ্ট বিমানের রিপোর্ট-এর জায়গা সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের জিনিষপত্র ওজন করিয়ে টিকিট দেখিয়ে বোর্ডিং-কার্ড সংগ্রহ করে নিতে হবে সেই সঙ্গে যে জিনিষ সঙ্গে নিয়ে বিমানে উঠবেন তার জন্য কেবিন ব্যাগেজ ট্যাগ নিয়ে সঙ্গের জিনিষে লাগিয়ে নিতে হবে। ম ল-পত্রের উপর যে নম্বর লাগান হয়েছে সেই নম্বরের অবশিষ্ট অংশ বিমান কর্তৃপক্ষই আপনাকে দিয়ে দেবেন সেটা সযত্নে রাখতে হবে। জেদ্দা বন্দরে ঐ নম্বর মিলিয়ে নিজের জিনিষ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। এখান থেকে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সোজা চলে যান অপেক্ষা করার জায়গায়। এবার যখন বিমানের নম্বর অনুযায়ী ঘোষণা হবে যে প্রত্যেকে সিকিউরিটি চেকিং এর জন্য এগিয়ে যান তখন একে একে হাতের জিনিসটি নিয়ে সিকিউরিটি অফিসারদের সামনে যেতে হবে। এখানে সঙ্গের জিনিষগুলি সবই খুলে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হবে এবং এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে সারা শরীর

পরীক্ষা করে সঙ্গের জিনিষে যে 'ট্যাগ' লাগান আছে তাতে এবং বোর্ডিং কার্ডের উপর ছাপ মেরে সই করে দেবেন ঐ সিকিউরিটি অফিসার। এবার ভিতরে প্রবেশ করে যেকোন চেয়ারে বসে অপেক্ষা করুন আর 'লাব্বায়েক' পড়তে থাকুন। বিমানবন্দরে বোম্বাই হজ্জ অফিসের লোক নানা ভাবে সাহায্য করেন। এবার সব চেকিং শেষ হয়েছে। নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করুন। ঠিক সময় মত ঘোষণা হবে। তার আগে কোন ভাবেই উদগ্রীব হওয়া বা অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এবার বিমানে ওঠার ঘোষণা হলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। যদি বিমান দূরে অপেক্ষারত হয় তবে ভিতরেই আবার বাস আছে তাতে উঠে বসুন। বাস আপনাকে একেবারে বিমানের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে দেবে। প্রথমে বিমানের কাছে পড়ে থাকা আপনার জিনিষপত্রগুলি বিমান কর্মীকে চিনিয়ে দিতে হবে। জিনিষের মালিক দেখিয়ে দিলে তবেই তা বিমানে ওঠান হবে। জিনিষপত্র চেনানর কাজ শেষ করে আপনার বোর্ডিং পাসের কার্ডটা হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে লাব্বায়েক পড়তে পড়তে এগিয়ে চলুন। সিঁড়ির মুখেই একজন বিমান কর্তৃপক্ষের লোক আপনার বোর্ডিং কার্ডের কিছু অংশ কেটে নেবেন বাকি অংশ হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বিমানের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। বিমানে জেদ্দা পৌঁছুতে প্রায় চার থেকে ছয় ঘণ্টা লাগতে পারে। এয়ার বাস হলে চার ঘণ্টাতেই পৌঁছে যাবে আর বোয়িং হলে এয়ার বাসের তুলনায় একটু বেশী সময় লাগবে জেদ্দা পৌঁছুতে।

বিমানের ভেতরটা নয়নাভিরাম। মূল্যবান কার্পেট মোড়া বিমানের মেঝে। অভিজাত সিট এবং অন্যান্য জিনিষপত্র। সাধারণতঃ এয়ার বাস যাতায়াত করে। বিশাল বিমান। প্রায় চারশতের মত যাত্রী বহনোপযোগী। হাতের বোর্ডিং কার্ডের উপর নম্বর আছে। বিমানের সিটের ঠিক উপরে ছাদের অংশে A, B, C, D, E, F-এর সঙ্গে ১, ২ করে নম্বর আছে। সেই নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের সিট নিয়ে বসতে হবে। সিট খুঁজে না পেলে কোনরকম হুড়োহুড়ি করা বা ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিমান সেবিকা প্রত্যেককে সাহায্য করবেন। সিট দেখিয়ে দেবেন। ধীরস্থিরভাবে ধৈর্য্য সহকারে নিজের নিজের সিটে গিয়ে বসে লাব্বায়েক পড়তে হবে। সিটে বসে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে প্রত্যেক সিটের দুপাশে বেল্ট আছে। দুপাশ থেকে দুটো বেল্ট তুলে নিয়ে কোমরের ওপর একটার মধ্যে আর একটা দিয়ে একটু চাপলেই আটকে যাবে। আবার তালার মত দিকটার

ঢাকনা একটু টেনে ধরলেই বেল্ট খুলে যাবে। এবার বসে থাকতে হবে। বিমানের মধ্যে অক্সিজেন কম হলে বা অসুবিধা হলে কি করতে হবে তা একজন বিমান সেবিকা বা সেবক দেখিয়ে দেবেন এবং করণীয় বিষয় বিমানের মাইকে ঘোষণা হবে। তবে বাংলায় কোন ঘোষণা হবে না। নিজেদের কেউ উদ্যোগ নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় ঘোষণা করে দিলে সকলের পক্ষে সহায়ক হবে। এগুলি বিশেষ বিমান হিসাবে কেবলমাত্র হজযাত্রীদেরই নিয়ে যাবে। এই বিমানে অন্য কোন যাত্রী থাকবে না। ফলে নিজেদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ বিমানের মাইক মারফত সকল যাত্রীকে এক যোগে লাব্বায়েক পড়ানর আয়োজন করে দেবেন। এতে বিমান কর্তৃপক্ষ বাধা দেবেন না। এমনি করে লাব্বায়েক মুখরিত বিমান আরব সাগর পাড়ি দিয়ে জেদ্দার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের হজ যাত্রীদের জন্য নির্দ্ধারিত বিমান বন্দর 'মাতার'-এ অবতরণ করবে।

বিমানের জানালা থেকে মেঘের দৃশ্য অতি মনোরম। তুলোর পেঁজা যেন ছড়িয়ে রয়েছে মহাশূন্যের বুকে। আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব সৃষ্টি এই প্রকৃতি জগৎ। বোয়িং বা এয়ার বাসগুলি সাধারণতঃ একটু বেশী উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। অনেক সময় নীচের জগৎ কিছুই দেখা যাবে না শুধু সাদা মেঘে ঢাকা এক মনোরম দৃশ্য। তার উপর ভেসে চলেছে বিমানখানা। উপরে তখনও নির্মল স্বচ্ছ নীল আকাশ। আবার বিমান একটু নীচে নেমে এলে কিংবা মেঘমুক্ত আকাশ হলে নীচের পাহাড় পর্বত ঘরবাড়ী সবই দেখা যাবে। মনে হবে যেন নানা রঙের সতরঞ্জি বিছান এক দেশের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি আল্লাহর নবীর দেশের মাটিতে।

বিমানের মধ্যেই প্রথমে বিমান সেবিকা ট্রেতে সাজিয়ে চকোলেট নিয়ে আপনার সামনে পরিবেশন করবেন। আপনার ইচ্ছেমত চকোলেট এর থেকে তুলে নেবেন। এই সময় অনেককে হুড়োহুড়ি করে চকোলেট নিতে হাত বাড়াতে দেখা যায়। এটা লজ্জাজনক। শান্ত হয়ে নিজের জায়গায় বসে লাব্বায়েক পড়তে থাকুন। বিমান সেবিকা প্রত্যেকের সামনেই পরিবেশন করবেন। কোন রকম অস্থিরতা বা আকুলতা দেখিয়ে নিজেকে ছোট করা বা হেয় করা অনুচিৎ। মনে রাখতে হবে সারা জীবনের শত অপরাধ মাথায় নিয়ে নিজের প্রভুর দরবারে হাজির হতেই এই যাত্রা। হয়ত বা এই উপস্থিতি মঞ্জুর হবে নয়ত নামঞ্জুর হবে। না মঞ্জুর হলে সব আশা সব আকাঙ্খাই ব্যর্থ হবে। তাই এই উপস্থিতি কবুল হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে

একান্ত বিনম্র ভাবে সর্বক্ষণ লাব্বায়েকের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। যে মহিমান্বিত দরবারে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে সে জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইসলামের মহান আদর্শের মর্যাদা রক্ষার বিষয় সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। বিমানের মধ্যে সময়মত দুপুর বা রাতের খাবারও পরিবেশন করা হবে। এখানে এসবের জন্য উদগ্রীব হওয়া মূর্খতার সামিল। সকলকেই সব জিনিষ শৃঙ্খলা সহকারে পরিবেশন করা হবে। বিমান বন্দরে অবতরণের আগেই সিট বেল্ট বেঁধে নেওয়ার ঘোষণা হবে সেইমত বেঁধে নেওয়া নিরাপদ। বিমান রানওয়ে ছুঁয়ে এগোতে এগোতে এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এবারও চঞ্চল হয়ে ওঠেন যাত্রীরা। নামার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। এরকম করার প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে কাউকে কোন রকম ধাক্কা না দিয়ে কারও কষ্টের বা মনোবদনার কারণ না ঘটিয়ে সংযত হয়ে শৃংখলাসহকারে নামতে হবে। ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা যে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির মনযিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ দিয়েছেন। সেজন্য বিনম্র ভাবে লাব্বায়েকের মধ্যে আত্মস্থ থেকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। ভক্তি সম্ভ্রমে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর। ইসলামের কত নবীর পদধূলি রয়েছে আরবভূমিতে। সেখানেই পা রাখতে চলেছেন। মনে রাখতে হবে যেন কোন বেআদবি না হয়।

জেদ্দা সর্বাধুনিক বিমান বন্দর। বিমানের দরজার সঙ্গে লেগে যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক সুড়ঙ্গ পথ যুক্ত সিঁড়ি। বাইরে আগুন ঝরা গরম। তা অনুভব করা এখনও সম্ভব নয়। সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে প্রত্যেকেই পৌঁছে যাবেন বিশ্রামাগারে। জেদ্দা বিশ্বের বিশালতম বিমানবন্দরও বটে। আসলে এটি তিনটি বিমান বন্দরের সমন্বয়ে বিশেষভাবে তৈরী। তিনটির পৃথক পৃথক নাম হল সৌদি, জুনাবি আর মাতার। সৌদি টারমিনাস থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ বিমানগুলি যাতায়াত করে। জুনাবি হল আন্তর্জাতিক টার্মিনাল। এখান থেকে গোটা বিশ্বের বিমানগুলি অহরহ ওঠানামা করছে। মাতার ক্ষেত্রটি হাজিদের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে কেবল মাত্র হজ যাত্রী-বিমানই ওঠানামা করে। যারা রমজানে ওমরাহের জন্য আসেন তারাও এই টার্মিনালেই নামেন। মার্কিন ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে অদ্ভুতভাবে তৈরী এই বিলাসবহুল বিমান বন্দর। সর্বদা হাজার হাজার লোক যাতায়াত করছেন। কোথাও সামান্য ময়লা ধুলো দেখা যাবে

না। সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে। হাটবাজার দোকান পসরা সবই এর মধ্যে। একটা সুচ পড়ে থাকলেও তা দূর থেকে দেখা যায়। এখানে সাফাই কর্মীরা আধুনিক বৈদ্যুতিক সাফাই যন্ত্র হাতে নিয়ে সদা প্রস্তুত। সিগারেটের সামান্য ছাই পড়লেও তা সেই মুহূর্তে পরিষ্কার করা হয়। আর আশ্চর্য যে এই কর্মীরা বেশীর ভাগই বাংলাদেশের নাগরিক। এঁরা বাংলায় কথা বলেন। এদেশে এঁদের নাম 'দাল্লাহ'। কত সহজে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মাত্র চার ঘণ্টায় সুদূর ভারত থেকে নবীভূমি জেদ্দায় পৌঁছান গেল। একেবারে ঝকঝকে মেঝে। চারিদিকে চাইলেই কেমন তৃপ্তি।

আমাদের দেশের অনেক হাজিসাহেবই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। যত্রতত্র নাক ঝাড়ছেন, পানি ফেলছেন, থুতু ফেলছেন, সামান্য বোধও তৈরী হয়নি। কেবলমাত্র অর্থব্যয় করেই হজ সমাধা করতে এসেছেন। ইসলামের কোন শিক্ষা, কোন আদর্শই তাঁর মধ্যে নেই। বিমানযাত্রা এটাই হয়ত অনেকের জীবনে প্রথম কিন্তু তবুও বিবেককে সজাগ রেখে শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে কোন কিছু অর্জন করা কঠিন নয়। যথেষ্ট বাথরুম থাকলেও এই সময়ে ভিড়ের দরুন বাথরুমে ভিড় থাকে। একটু ধৈর্য ধরলে বা নিজে প্রবেশ করে পরের লোকের কথা স্মরণ রাখলেই শৃংখলার সঙ্গে সবকিছু হওয়া সম্ভব। তাই যিনি বাথরুমে গেলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের কাজ সেরে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে বাথরুমে আপনার বিলম্বিত অবস্থান আরও বহু মানুষের অসুবিধার কারণ হবে। আবার বাইরের লোককেও মনে রাখতে হবে যে অহেতুক অধৈর্য হয়ে যত্রতত্র নোংরা না করে ফেলা; যেখানে সেখানে পানি না ফেলা উচিৎ। এটা হাজার মানুষের অসুবিধার কারণ হবে। যা কিছু ফেলার দরকার এখানে ফেলার জন্য যেসব জায়গা দেওয়া আছে কেবলমাত্র তাতেই ফেলবেন। তাছাড়া কোথাও ফেলবেন না। প্রায়ই দেখা যায় এই সুসজ্জিত বিশ্রামাগারটি ভারতীয় হাজিগণের অজ্ঞতার জন্য মুহূর্তে নোংরা হয়ে যায়।

এখানে ধীরস্থির ভাবে বাথরুমে ওজু করে সময়মত সালাত আদায় করতে গিয়ে যেন নবীর আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ না হয়ে যায়। এখান থেকে কাস্টম চেকিংএর মধ্য দিয়েই বাইরে যাবার পথ। সামনেই সৌদি অফিসার প্রথমে পাসপোর্ট নিয়ে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছাপ মেরে সই করে দেবেন। খুব দ্রুত কাজ হয়ে যায়। আমাদের দেশের মত দীর্ঘ সময় লাগবে না, সুতরাং অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। এখান থেকে পাসপোর্ট নিয়ে কাস্টম

চেকিংএর জন্য এগিয়ে যেতে হবে। প্লেনে যার যা জিনিস ছিল তা এখানে নামিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে নিজের জিনিসগুলিকে একত্রিত করে কাস্টম অফিসারকে দেখিয়ে নিতে হবে। এই সময় দেখা যায় চাল, ডাল, ঘি, তেল সবই বাজেয়াপ্ত করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে অহেতুক বোঝা বাড়িয়ে কোন জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের হাজিরা অনেকে নানা মাদক দ্রব্য চোরাকারবার করার জন্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লুকিয়ে নবীর দেশে নিয়ে যান। তাই সরকার এই ব্যবস্থা করে থাকেন। কাস্টম চেকিংএর পর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে যেতে হবে। বিমান টার্মিনালের বাইরে সরকারী গাড়ি অপেক্ষা করছে, কোন ভাড়া লাগবে না। এই গাড়ীই মক্কা বা মদিনায় নিয়ে যাবে।

এখানে মালপত্র গুছিয়ে রেখে ব্যাঙ্ক-এ যেতে হবে। সবই হাতের কাছে আছে। ভারতে জমা দেওয়া টাকার যে ড্রাফ্‌ট এনেছেন তার বিনিময়ে ওখান থেকে সৌদি রিয়েল নিতে হবে। একটা টিপ দিয়ে জমা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করে বেঁধে রাখা রিয়েলের বাণ্ডিল পাওয়া যাবে। এবার এসে নিজের জিনিসপত্র বাসের মাথায় তুলে দিতে হবে। এদেশে কোন কুলি নেই। নিজেদেরই ব্যবস্থা করে বাসের মাথায় সাজিয়ে দিতে হবে। এবার নিশ্চিন্তে বসে বসে লাব্বায়েক পড়তে থাকুন বাস ঠিক ঠিক গিয়ে মোয়াসসেসার অফিসে পৌঁছুবে। এখন আর নিজের ইচ্ছেমত মোয়াল্লেম হয় না, সৌদি সরকারই মোয়াসসেসা নির্দ্ধারণ করে দেবেন। সেইমত বাস সেই মোয়াসসেসার অফিসে আগে পৌঁছুবে। মোয়াসসেসায় পৌঁছুলে ওঁরা আপ্যায়নের জন্য একবেলার খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবেন। এবার শুরু হবে মক্কায় পৌঁছে করণীয় কাজ। তার আগে মিকাত সম্পর্কে একটু পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাওয়া দরকার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্বের মুসলমানদের মিকাত

মিকাত : হজযাত্রীদের যে স্থানে পৌঁছুলে এহরাম না বেঁধে অগ্রসর হওয়া নিষেধ সেই স্থানকে মিকাত বলে।

(১) ইয়ালামলাম : মক্কা শরিফ থেকে প্রায় ৪৮ কিঃ মিঃ দক্ষিণে একটি পাহাড়ের নাম। ইয়েমেন, বাংলাদেশ, জাপান, চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ইত্যাদি দেশের হজ্জ যাত্রী অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে সমুদ্রপথে মক্কাশরীফ যাঁরা যান তাঁদের এই স্থানে এহরাম বাঁধতে হয়। ভারতীয় হজযাত্রীদের এই স্থান অতিক্রম করার পূর্বে এহরাম না বাঁধলে হজ হবে না।

(২) জুল হোলায়ফা : মদিনা শরীফের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মদিনাবাসী হজযাত্রীগণ বা মদিনা থেকে হজের জন্য যাত্রাকারী-গণকে এখান থেকে এহরাম বাঁধতে হবে। এখানে একটি মসজিদ আছে। এটি মদিনার মিকাত।

(৩) যাতে-এরাক : মক্কা শরিফের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। ইরাকবাসী এবং ইরাক দেশের উপর দিয়ে গমনকারী হজযাত্রীদের মিকাত এই স্থান। এখান থেকে তাঁদের এহরাম বাঁধতে হবে।

(৪) যোহ্‌ফা বা রারাক : মক্কা শরিফের পশ্চিমে তাবুক যাওয়ার পথে অবস্থিত। সিরিয়া দেশ থেকে আগত হজযাত্রীগণের মিকাত এই স্থানটি।

(৫) করণ : আরাফাত পাহাড়ের কাছে অবস্থিত একটি ডিম্বাকৃতি পাহাড়। নজদবাসী বা নজদ-এর উপর দিয়ে আগত হজযাত্রীগণের মিকাত এটি।

আমাদের দেশের হজযাত্রীগণ দুভাবে হজে যান। (১) জলপথে—জাহাজ যোগে (২) আকাশপথে—উড়োজাহাজে। জলপথে যাঁরা যান তাঁরা বোম্বাই বন্দর থেকে জলজাহাজযোগে জেদ্দা পৌছান। জলপথে যাত্রাকারীগণের জন্য মিকাত হলো ইয়ালামলাম পাহাড়। তাই ইয়ালামলাম পাহাড় আসার আগেই হজযাত্রীগণ নিজ নিজ চুল গোঁফ, নখ, বগল ইত্যাদির হাজামত করে, গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তৈরী থাকবেন। ঐ পাহাড় আসার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন বাজবে। তখনই এহরাম বাঁধতে হবে। এর পর এহরাম বাঁধলে হজ হবে না। বিনা এহরামে মক্কাশরীফ যাওয়া নিষেধ। স্মরণ রাখা ভাল মিকাতের সীমানায় পৌছানর পূর্বে এহরাম বাঁধা নিষেধ নয় বরং উত্তম। শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসের ১০ দিনকে হজের মাস বলে। হজের যাবতীয় কাজ এই নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে করতে হবে। আগে বা পরে করলে হজ্জ হবে না। আমাদের দেশের হজ্জযাত্রীগণ ১০ই যিলহজ্জ মাসের মধ্যে হজ্জ করার জন্য যাত্রা করেন।

যাঁরা আকাশপথে বিমানযোগে যাবেন তাঁদের বিমানে আরোহণের পূর্বে বিমান বন্দর থেকে বা বোম্বাই মোসাফিরখানা থেকেই এহরাম বেঁধে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞাতব্য বিধান বা মাসায়েল ঃ

(১) হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধা মাকরূহ।

(২) মিকাতের এলাকার বাইরে থেকে মক্কাশরীফে অথবা হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে যে কোন উদ্দেশ্যে তা হজ্জ, ওমরাহ বা ব্যাবসা যাই হোক না কেন প্রবেশ করার জন্য মিকাত থেকে এহরাম বাঁধা ওয়াজেব।

( ) মিকাতে পোঁছানর পূর্বেই এহরাম বাঁধা জায়েজ। নিজের বাড়ী থেকেও এহরাম বাঁধা যায়।

(৪) যাঁরা ভারত থেকে জেদ্দা বন্দর হয়ে মক্কা শরীফে না গিয়ে মদিনা শরীফ যাবেন তাঁদের জন্য ইয়ালামলাম পাহাড় দেখলে এহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বিনা এহরামে মদিনা শরিফ যেতে পারেন। মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ আসার সময় জুল হোলায়ফা নামক স্থানে এহরাম বাঁধবেন।

(৫) হজ্জের আগে মদিনা শরীফ না গিয়ে হজ্জের পরে যাওয়া উত্তম। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যাঁদের উপর হজ্জ ফরজ বা যাঁরা বদলা হজ্জ করতে চান তাঁদের হজ্জের আগে মদিনা যাওয়া মাকরূহ। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র হজ্জের মাসগুলিতে হজ্জের পূর্বে মদিনা যাওয়া মাকরূহ। আবার অনেকে বলেন হজ্জ ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে হজ্জের মাসে হলেও মক্কা শরীফের পূর্বে মদিনা শরীফ যাওয়া মাকরূহ নয়। অবশ্য হজ্জের পরেই মদিনা শরীফ যাওয়া উত্তম।

(৬) যদি কেউ মক্কা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মিকাত অতিক্রম করার পূর্বে এহরাম পরিধান না করেন এবং পরে মত পরিবর্তন করে সোজা মদিনা চলে যান তাহলে বিনা এহরামে মিকাত অতিক্রম করার জন্য দম (দুম্বা কোরবাণী) দেওয়া ওয়াজেব। যদি পূর্ব হতেই মদিনা যাওয়ার নিয়েত করে থাকেন তাহলে তাকে এহরাম বাঁধতে বা দম দিতে হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এহরাম বাঁধার স্থান, প্রস্তুতি ও নিয়ম

এহরাম পবিত্র হজের প্রথম পর্ব ফরজ বা (অবশ্য করণীয়) কাজ। মিকাত অতিক্রম করার পর এহরাম পরলে হজের একটি ফরজ কাজ বাদ পড়ে যাবে। তাই হজযাত্রীগণকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনভাবে যাতে এহরাম পরার আগে মিকাত অতিক্রম করা না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। এহরাম পরিধানের পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবতীয় হাজামত (ক্ষৌরকর্ম) করে গোসল করে নিতে হবে। যদি আপনি জলজাহাজের যাত্রী হন তবে জাহাজেই ইয়ালামলাম পাহাড় আসার আগেই এহরামের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেবেন। জাহাজ কর্তৃপক্ষ ও সরকার নিযুক্ত হজসেবক (ওয়েলফেয়ার অফিসার) আপনাকে এ বিষয় জানাবেন। সেইমত নির্দিষ্ট সময় সাদা সেলাই বিহীন (কাফন সদৃশ) একখানা কাপড় পরবেন এবং আর একখানা গায়ে দেবেন।

প্রথমে হাজামতের কাজ শেষ করে ওজু ও গোসল করতে হবে। খাঁটি আতর, সুরমা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। গোসল ও ওজু থাকা অবস্থায় এহরামের কাপড় পরতে হবে। বিশেষ সতর্ক হতে হবে এহরামের কাপড় যেন কোনরকম কটুগন্ধযুক্ত না হয়। বিনা ওজু ও গোসলে এহরাম বাঁধলে মাকরূহ হবে। এহরামের কাপড় পরে শরীরে সুগন্ধি লাগানো মোস্তাহাব। কিন্তু কোন রংযুক্ত সুগন্ধি কাপড়ে লাগানো উচিত নয়। এহরামের পর কোন সেলাই করা কাপড় পরা চলবে না। এহরামের চাদর ও তহবন্দ উভয়ের কোন স্থানে বোতাম, কাঁটা বা সেফটিপিন দেওয়া দোষনীয় তবে এজন্য কোরবাণী ওয়াজেব হবে না।

এহরামের জন্য কাপড় পরে তৈরী হয়ে মিকাত অতিক্রম করার আগেই দুরাকাআত সালাতুল এহরাম নামায পড়তে হবে। এই নামাযের প্রথম রাকাআতে সুরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা এখলাস পড়া উত্তম। এরপর মাথার কাপড় বা টুপি খুলে মোসাললায় বসেই তামাত্তো, কেরান বা এফরাদ যে কোন একরকম হজের নিয়ত করে তালাবিয়াহ পড়তে হবে। তালাবিয়াহ পড়া মাত্রই এহরামের অবস্থা শুরু হয়ে গেল। মহিলাগণ

মাথার কাপড় না খুলে নিয়ত করবেন, তবে মুখের উপরের কাপড় সরিয়ে ফেলতে হবে। এখন থেকে তালাবিয়াহ (লাব্বায়েক), তাহলীল সর্বদা মুখে উচ্চারণ করতে হবে। এটাই তখন হজযাত্রীর একমাত্র সাধনা। মনে রাখতে হবে এখন থেকেই আল্লাহ্‌র কাছে হজ কবুলের জন্য প্রার্থনা শুরু করতে হবে।

তালাবিয়াহ :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَا شَرِيْكَ لَكَ ٥

উচ্চারণ : লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা শারিকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা অন্‌নেঅমাতা লাকা অল মুলক, লা শারিকা লাক্‌।

বাংলা : হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরজায় উপস্থিত। তোমার কোন অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত (দান) ও রাজত্ব তোমারই জন্য। তোমার কোন অংশীদার নেই।

পুরুষগণ জোরে এবং মহিলাগণ আস্তে সর্বক্ষণ এই তালাবিয়াহ পড়বেন। অধিক মাত্রায় তালাবিয়াহর সঙ্গে যিকের (আল্লাহ্‌র স্মরণ) ও এসতেগফার (তওবা) পড়তে হবে এবং সৎকাজের উপদেশ দেওয়া অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এহরাম বাঁধার পর এইভাবে প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। "হে আল্লাহ আমি হজের নিয়ত করছি, তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং তার যাবতীয় ফরজ আদায় করার জন্য আমাকে সাহায্য কর এবং আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ কর। হে আল্লাহ হজে তোমার আদেশ পালনের নিয়ত করছি। যারা তোমার কাছে প্রার্থনা করে এবং তোমার উপাসনায় আস্থা রাখে, তোমার নির্দেশের অনুসরণ করে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে তাদের শ্রেণীভুক্ত কর যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট; আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আল্লাহ! আমি হজের নিয়ত করেছি আমায় তা করার ক্ষমতা দান কর। আমি তোমার জন্য এহরাম বেঁধেছি। আমার মাংসকে, আমার কেশকে, আমার রক্তকে, আমার অস্থিকে, আমার হৃদয়তন্ত্রীকে তোমার এই হজের জন্য উৎসর্গ করলাম। স্ত্রী, সুগন্ধি, সেলাই করা কাপড়, তোমার সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে আমার জন্যে হারাম করেছি।" এরপর দরূদ শরীফ পড়ে প্রার্থনা কবুলের আশা করতে হবে।

এহরাম অবস্থায় যা করা নিষেধ :

১) এহরাম অবস্থায় ঝগড়া বিবাদ ও কোন প্রকার পাপ কাজ করা নিষেধ। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন "হজ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, যে এই সময়ের মধ্যে হজ করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে সে যেন অশ্লীলতা, পাপ কাজ এবং ঝগড়া বিবাদ পরিত্যাগ করে।"

২) সেলাই করা কাপড় পরা নিষেধ। স্ত্রীলোকদের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা জায়েজ (বৈধ)।

৩) পুরুষদের মাথা, মুখমণ্ডল কোন কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে না। যেমন টুপি, পাগড়ি, রুমাল দিয়ে মাথা ঢাকবেন না। স্ত্রীলোকগণ মাথায় কাপড় দেবেন তবে মুখ খোলা রাখবেন। স্ত্রীলোকেদের মুখমণ্ডলে একটি শক্ত আবরণের উপর বোরখা পরা জায়েজ আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বোরখার কাপড় যেন মুখের উপর না লাগে।

৪) কোন প্রকার জীব হত্যা, মশা, মাছি ইত্যাদি এমনকি কোন শিকারের পশুর সন্ধান বলে দেওয়া বা পশু জবাই করা ও তার মাংস রান্না করা বা খাওয়া যাবে না।

৫) সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করতে পারা যাবে না।

৬) এহরাম পরা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ও সহবাসের আনুষঙ্গিক কোন কাজ করা যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি বা অনুরূপ কোন কথাবার্তা স্ত্রীকে বলা বা ইশারা করা নিষেধ।

৭) কোন প্রকার পাপ কাজ বা ফাসেকী (গর্হিত) কাজ করা নিষিদ্ধ।

৮) নখ, চুল ও সর্বশরীরের একটি লোমও কাটা বা ছেঁড়া নিষেধ। সাবধানতার জন্য শরীর রগড়ানো যাবে না।

৯) মাথা বা কাপড়ের উকুন মারা বা হেরেমের সীমানার মধ্যে কোন তাজা ঘাস কাটাও নিষিদ্ধ।

মাসায়েল বা বিধান : (১) এহরাম অবস্থায় কাপড় বা চামড়ার মোজা ব্যবহার করা নাজায়েজ। পায়ের পাতার উপরিভাগের মাঝখানের গিরা (হাড়) ঢেকে যাওয়ার মত জুতা ব্যবহার করা না জায়েজ।

২) এহরাম অবস্থায় শরীরের ময়লা দূর করা মাকরূহ। চুল, দাড়ি বা শরীরের সাবান লাগানও মাকরূহ।

৩) এহরাম অবস্থায় চুল, দাড়ি বা পশম ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমনভাবে চুলকানো বা রগড়ানো মাকরূহ।

৪) এহরাম অবস্থায় পরনের লুঙ্গি বা চাদর গাঁট দিয়ে বাঁধা বা পিন লাগান বা সূতা দিয়ে আটকান মাকরূহ।

৫) এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি দ্রব্য স্পর্শ করা বা ঘ্রাণ লওয়া মাকরূহ।

৬) এহরাম অবস্থায় মুখে বা মাথায় পট্টি বাঁধা নিষেধ কিন্তু শরীরের অন্যস্থানে প্রয়োজনবোধে পট্টি বাঁধা নিষেধ নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাকরূহ।

৭) এহরাম অবস্থায় কাআবা শরীফের গেলাফের ভিতর প্রবেশ করতে হলে এমনভাবে করতে হবে যাতে গেলাফ মাথায় বা মুখে না লাগে।

৮) এহরাম অবস্থায় পানের সঙ্গে লং, এলাচি, দারুচিনি, ধনিয়া, জর্দা ইত্যাদি খোসবুদার মসলা খাওয়া নিষেধ। এইভাবে শরবতের সঙ্গে কেওড়া গোলাপ ইত্যাদি খোসবুদার জিনিস পান করা নিষেধ। কিন্তু পান খাওয়া নিষেধ নয়।

৯) বালিশের উপর চিৎ হয়ে বা কাত হয়ে শোয়া নিষেধ নয়।

১০) খোসবুদার মসলা দিয়ে যদি কোন ঔষধ, পোলাও বা জর্দা রান্না হয় তবে তা খাওয়া জায়েজ; নইলে সুগন্ধি জিনিস খাওয়া নিষেধ।

১১) এহরাম অবস্থায় আতর বা অন্য কোন সুঘ্রাণ লাগিয় কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ।

১২) এহরাম অবস্থায় গোসল করা জায়েজ তবে শরীর রগড়ান বা সাবান লাগান জায়েজ নয়।

১৩) এহরাম অবস্থায় কোমরে বেল্ট বা টাকা রাখার থলি ব্যবহার করা জায়েজ।

১৪) এহরাম অবস্থায় ছাতা ব্যবহার করা তাঁবু বা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া জায়েজ আছে।

১৫) এহরাম অবস্থায় শীত লাগলে মুখ এবং মাথা ছাড়া অপর সব অঙ্গ কম্বল বা লেপ দিয়ে ঢাকা জায়েজ।

১৬) এহরাম অবস্থায় আয়নায় মুখ দেখা, মেসওয়াক করা, নড়াদাঁত ও

নখ ফেলে দেওয়া, সুগন্ধি বিহীন সুরমা লাগান, শরীরের ফোঁড়া ও ফোসকা গালিয়ে দেওয়া জায়েজ।

১৭) এহরাম অবস্থায় গৃহপালিত হাঁস, মুরগী, বকরী, দুম্বা, গরু, মহিষ ইত্যাদি জবাই করা বা তার মাংস ভক্ষণ জায়েজ। কিন্তু কবুতর ও হরিণ গৃহপালিত হলেও তা জবাই করা বা ভক্ষণ করা জায়েজ নয়। তবে হেরেমের এলাকার বাইরে যদি এহরাম অবস্থার লোকের কোন রকম সাহায্য ছাড়া এহরাম বিহীন লোক অনুরূপ কোন প্রাণী শিকার করে আনেন বা জবাই করে দেন তাহলে এহরাম ওয়ালা লোকের তা খাওয়া বৈধ। কিন্তু জবাই না করা কোন জন্তু হেরেমের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলে কারও পক্ষে তা জবাই করা বা ভক্ষণ করা জায়েজ নয়।

১৮) এহরাম অবস্থায় তেল ব্যবহার করা মাকরূহ।

১৯) এহরাম অবস্থায় পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখী মারা কোন অবস্থাতেই জায়েজ নয়। তবে হেরেমের মধ্যে সাপ, বিছে, চিল, ইঁদুর, ভীমরুল, বোলতা, পাগলা কুকুর মারা জায়েজ। মশা, মাছি, ছারপোকা এহরাম অবস্থায় না মারা ভাল।

এইভাবে এহরামের নিয়ম পালন করে ক্রমশঃ যতই আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই অন্তরে আল্লাহর প্রেম বাড়তে থাকবে। সেই সঙ্গে হৃদয়ে এক মহৎ চরিত্রের চিন্তা নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং হজের নিয়ম কানুন বিশুদ্ধভাবে পালনের সংকল্প নিয়ে হেরেম শরীফের দিকে অগ্রসর হতে হবে। মুখে থাকবে সর্বক্ষণ তালাবিয়াহ আর হৃদয়ে ঐশী প্রেমের জ্বলন্ত আবেগ।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের কাফ্‌ফারা বা দম ঃ

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করে ফেললে তার জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এমনকি ভুলবশতঃ হোক বা জেনে কিম্বা অজানা হওয়ায়, স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে, সুস্থ বা অসুস্থ যে কোন অবস্থায় যা নিষিদ্ধ তা করে ফেললে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে এহরাম ভঙ্গ হয়ে যাবে না। এহরামের কাফ্‌ফারা মক্কা শরীফের পবিত্র এলাকার চিহ্নিত সীমানার মধ্যেই আদায় করতে হবে। হেরেমের সীমানার বাইরে এই কাফ্‌ফারা বা দম দিলে তা আদায় হবে না বরং আবার হেরেমের এলাকার মধ্যে গিয়ে দম দিতে হবে।

কখন কাফ্ফারা বা দম দিতে হবে ঃ

১. এহরাম না বেঁধে মিকাতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলে। ২. এহরাম অবস্থায় হেরেমের সীমানার মধ্যে কোন পশু পাখী শিকার করলে, গাছ বা ঘাস ছিঁড়ে ফেললে, গাছের কাঁটা ভেঙ্গে দিলে বা দাঁতনের জন্য কোন গাছের ডাল ভাঙ্গলে। ৩. এহরাম অবস্থায় পুরো একদিন বা একরাত মুখ কিংবা মাথা ঢেকে রাখলে, সেলাই করা কাপড় পরলে। তবে সামান্য পরিমাণ বা এক আধ ঘন্টা এ কাজ করে ফেললে সাদকা দিলেই চলবে। ৪. এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি খাবার খেলে, তবে গরম মসলা জাতীয় কিছু দিয়ে খাবার খেলে দম দিতে হবে না। এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি তেল বা আতর লাগালে দম দিতে হবে। এহরামের পূর্বে লাগান আতরের সুগন্ধ থাকলে ক্ষতি নেই। এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার না করে কাছে রাখাও নিষিদ্ধ। ৫. এহরাম অবস্থায় পানের সঙ্গে লং, এলাচি বা শরবতের সঙ্গে গোলাপ, কেওড়া প্রভৃতি ব্যবহার করলে দম দিতে হবে। ৬. এহরাম অবস্থায় দাড়িতে মেহেদি বা কলপ লাগালে বা দাড়ি ছাঁটলে বা কামালে দম দিতে হবে। ৭. এহরাম অবস্থায় পাঁচটি বা ততোধিক নখ কাটলে মাথা বা দাড়ির চুল এক চতুর্থাংশের ($\frac{১}{৪}$) কম কাটলেও দম দিতে হবে। ৮. হজের পরের ফরজ তাওয়াফ ১২ যিলহজের পর আদায় করলে দম দিতে হবে। ৯. বিনা ওজুতে ফরজ তাওয়াফ করলে দম দিতে হবে। তবে ওজু করে পুনরায় ঐ তাওয়াফ করলে আর দম দিতে হবে না। ১১. আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে চলে এলে বা আরাফা থেকে মীনায় ফেরার সময় মুজদালেফাতে রাত্রি অতিবাহিত না করলে। ১২. একদিনের রামি না করলে।

বিশেষভাবে স্মরণীয় হজের মাসায়েল ঃ

১. মনে রাখতে হবে এহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। পরের বছর আবার হজ করা বাধ্যতামূলক গণ্য হবে। দম দেওয়ার প্রয়োজন হলেই হেরেমের সীমানার মধ্যে দম দেওয়ার কাজ করতে হবে। দম দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ৩. এহরামের উপরোক্ত শর্ত ভঙ্গ করলে কেরান হজকারীকে দুটি দম দিতে হবে। ৪. এহরাম অবস্থায় কেউ পশু শিকার করলে বা শিকারীকে সরাসরি বা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে হেরেম এলাকার মধ্যে ঐ শিকারী প্রাণীর মূল্যের সম পরিমাণ সাদকা

দিতে হবে। ৫. এহরাম বাঁধার সময় কিংবা হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করার সময় কারো কাছে কোন তোতা, ময়না, টিয়া, হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি থাকলে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। ঐগুলিকে সঙ্গে নিয়ে হেরেম এলাকায় প্রবেশ করা জায়েজ নয়। ৬. কেরান ও তামাত্তো হজের নিয়ত করে যাঁরা হজ করেছেন তাদের ১০ই যিলহজ্জ কোরবাণী দিতে হয়। এই কোরবানী বা দম না দিয়ে এহরাম খোলা যাবে না। ৭. হজের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধার পর যদি কেউ অসুস্থ হয়ে বা কোন কারণে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হতে না পারেন তাহলে পরের বছর এই হজের কাযা আদায় করতে হবে। ৮. নিজের আমল, সালাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদির সাওয়াব নিজ পিতামাতা, নবী, রসূল কিংবা অন্য মৃত বা জীবিত লোকের জন্য বখশিয়ে দেওয়া জায়েজ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র পথের যাত্রীদের জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছে করণীয়

এহরাম বাঁধার পর সমুদ্রপথের যাত্রীদের প্রায় দুদিন জাহাজে থাকতে হয়। জেদ্দা বন্দরের অনেক দূর থেকেই দেখা যাবে সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করে বহু পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আবার বহু পাহাড় সমুদ্র জলের অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে নিমজ্জমান আছে। স্বচ্ছ জলরাশির আরশিতে তাদেরও দেখা যায়। এই সকল লুকায়িত ও দৃশ্যমান পাহাড়ের জন্য জাহাজ খুব সাবধানে এগোতে থাকে। জেদ্দা বন্দরের বেশ কিছু দূরে জাহাজ নোঙর করে। সৌদী স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাক্তার দল এসে গোটা জাহাজ পরীক্ষা করেন। তাঁরা ছাড়পত্র দিলে তবেই জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারবে। এই সময় হতেই জাহাজ কর্তৃপক্ষ ও আমিরুল হজের অফিস থেকে জেদ্দা বন্দরে নামার ব্যাপারে ঘোষণা হতে থাকবে। সকল যাত্রীই বন্দর দেখতে

পাবেন। জেদ্দা বন্দর অত্যন্ত মনোরম। পৃথিবীর উন্নত বন্দরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। একটি সুপরিকল্পিত সর্বাধুনিক বন্দর শহর জেদ্দা।

জেদ্দা বন্দরে পৌঁছে যাবতীয় ভারি মালপত্র যা নিজের কাছে বা সিটের কাছে, জাহাজের ছাদে আছে সেগুলো ভালভাবে বেঁধে সিটের উপরে বা ছাদের প্রকাশ্য জায়গায় রেখে খুব হাল্কা মাল সঙ্গে নিতে হবে। নামার আগে নিজের পাসপোর্ট ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিজের কাছেই রাখতে হবে। এইবার হাতে হালকা জিনিসপত্র নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে জাহাজ থেকে নামতে হবে।

জাহাজ ও বিমান থেকে জেদ্দা বন্দর দৃষ্ট হলে পড়ার দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ

اَعُوْذُ بِكَ شَرِّهَا مَا فِيْهَا

(উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইননি আস-আলোকা খায়রা হাজিহিল কারিয়াতে অ খায়রা মা ফিহা অ আউজোবেকা শাব্বেহা মা ফিহা)।

বাংলায় : হে আল্লাহ! এই ভূভাগ থেকে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এখানে যা মঙ্গল আছে তা আমাকে দান কর এবং এখানকার সমস্ত অশুভ থেকে পরিত্রাণ চাইছি। এখানকার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করো।

বিমান বা জাহাজ থেকে নেমে জেদ্দা বন্দরের মাটিতে পদার্পণ করে একাগ্র-চিত্তে নিবিষ্ট হয়ে পড়ার দোওয়া :

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ٥

(উচ্চারণ : রাব্বে আদখেলনী মুদখালা সিদকেও ওয়া আখরেজনী মুখরাজা সিদকেওঁ ওয়াজ আল্লী মিঁল্লা দুনকা সুলতানান নাসীরা।)

বাংলায় : ওগো আমার প্রতিপালক ! আমাকে মঙ্গলের সঙ্গে প্রবেশ করতে ও মঙ্গলের সঙ্গে বের হতে দাও। এবং তোমার পক্ষ থেকে তোমার সাহায্য দিয়ে আমাকে প্রাধান্য দাও। ঐ সঙ্গে আরও তিনবার পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

(উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফীহা।)

বাংলায় : ওগো দয়াময় আল্লাহ্ আমি যা চাইছি তা বরকতপূর্ণ কর।

তারপর পড়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মার যুকনা জানাহা ওয়া হাববেবনা এলা অহলেহা হাব্বেব স্বালেহী অহেলেহা ইলাই না।"

বাংলায় : হে আল্লাহ! আমাকে পূর্ণ রিযিক দান কর। আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তেমনি করে তুমি ভালবেসো যেমন করে তুমি সালেহ্ (পুণ্যবান) বান্দাদের ভালবেসে থাক।

কোন ভারী মালপত্র কাউকেই নামাতে হবে না। জাহাজে সরকারী কুলি এসে মালপত্র নামাবে এবং ডেকের ভিতরের মালপত্র সরকারী ব্যবস্থায় ক্রেনের সাহায্যে নামান হবে। এইভাবে সরকারী কুলিরা সকলের মালপত্র নামিয়ে নাবিকুল ওকালার (কাস্টম সেডের) নীচের বিরাট হলঘরে সাজিয়ে রাখবে। জাহাজ থেকে নেমে হজযাত্রীগণ সামনে বিরাট এক দোতলা সুসজ্জিত বাড়ী দেখতে পাবেন। সাবধান! কেউ যেন জাহাজ থেকে নামার জন্য তাড়াহুড়ো ঠেলাঠেলি না করেন। ধীরস্থির ভাবে সারিবন্দি হয়ে মুখে তালাবিয়াহ্ (লাব্বায়েক) পড়তে পড়তে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। কাউকে ধাক্কা দেওয়া বা ঠেলাঠেলি করা গোনাহর কাজ। এ কথা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা দরকার। এই সময় জিনিষ পত্রের জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে কোন জিনিস পত্রের গণ্ডগোল হয় না। সরকারী লোকজন তা সুন্দর ভাবে নামিয়ে নিয়ে যাবেন। সামনের সুসজ্জিত বাড়ীটির দোতলায় হজ যাত্রীদের পাসপোর্ট ইত্যাদি চেকিং হওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক যাত্রীকেই সেখানে হাতের ছোটখাট সামান্য জিনিষ সহ লাইনে দাঁড়িয়ে পাসপোর্ট চেকিং করাতে হবে। পাসপোর্ট চেকিং-এর পর অপর দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে বিরাট হলঘর পড়বে। উপরের

তলাতেই ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা থাকেন। তাঁরা ও সরকার প্রেরিত অফিসার সব কাজেই সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। নীচের হল ঘরে প্রায় ষোল সতেরো শত যাত্রীর মালপত্র সাজান আছে। এখানে বহু কাস্টম অফিসারকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। যাত্রীদের হলঘর ঘুরে নিজ নিজ মাল পত্র খুঁজে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। সবকটি জিনিসপত্র একত্রিত হলে যে কোন কাস্টম অফিসারকে ডেকে জিনিস পত্র চেক করে দিতে বলতে হবে। মনে রাখবেন এখানে কোন অফিসারই নিজে থেকে কোন মালপত্র পরীক্ষার জন্য আসবেন না। মালের মালিককেই অফিসারকে ডেকে চেক করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অফিসার মালপত্র চেক করার পর একটা করে টিকিট জিনিষ পত্রের উপর লাগিয়ে দেবেন। এই ভাবে মালপত্রের পরীক্ষা কাজ শেষ হলে সঙ্গের হাল্কা মালপত্র সঙ্গে নিয়ে রাস্তার দিকে বের হতে হবে। অবশিষ্ট মালপত্র সরকারী কুলি লরিতে করে নিয়ে যাবে মদিনাতুল হোজ্জাজে। কাউকেই তার জন্য কোনভাবেই চিন্তিত হতে হবে না।

হাতের জিনিস নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যে কোন বাসে বসতে হবে। এই বাসে কারো কোন ভাড়া লাগবে না। বাস ড্রাইভার হজ যাত্রীদের জন্য নির্দ্ধারিত মোসাফিরখানা 'মদিনাতুল হোজ্জাজ' এ নিয়ে যাবে। ওখানে পৌছুলে বিরাট বালাখানা দেখা যাবে। এর মধ্যে বাজার, দোকান, হোটেল সবই আছে। মোসাফির খানার যে কোন দরজা দিয়ে ভিতরে গেলেই দারোয়ান দেখিয়ে দেবেন কোন ঘরে কোথায় থাকার ব্যবস্থা আছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেই গদি বালিশ দেওয়া বিছানা দেখতে পাওয়া যাবে। যাত্রীগণ নিজ নিজ পছন্দমত বিছানা বেছে নিয়ে সঙ্গের জিনিষপত্র রেখে দেবেন। জেদ্দা বন্দরে রেখে আসা জিনিষ পত্রের জন্য অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারী ব্যবস্থাতে সব জিনিষই এখানে পৌছে যাবে। এই মোসাফির খানায় পানির কোন কষ্ট নেই। যথেষ্ট পরিমাণ পায়খানা ও গোসলখানা আছে। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

এবার মুখ হাত ধুয়ে বের হয়ে এর মধ্যেই যে কোন হোটেলে গিয়ে প্রয়োজনীয় আহারাদি করে নিতে হবে। তারপর বোম্বাই থেকে আনা বিদেশী মুদ্রার ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ নিয়ে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়াতে হবে। ব্যাঙ্ক মদিনাতুল হোজ্জাজের ভিতরেই। এখানে ড্রাফট্ ও পাসপোর্ট দেখালেই

বিনিময়ে রিয়েল পাওয়া যাবে। রিয়েল সংগ্রহ করে নিশ্চিন্তে লাব্বায়েক পড়তে থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্‌র দরবারে করুণার আশা পোষণ করা কর্তব্য। জিনিষপত্র বা এখানের মনোমুগ্ধকর বিপণীর বিপনন সামগ্রীতে কারও আকৃষ্ট হওয়া উচিত হবে না। সঙ্গের জিনিষপত্র যত কম হয় ততই সব কাজ নিশ্চিন্তে করা সহজ হয়। মনে রাখতে হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ এবাদাত (আরাধনা) হজব্রত পালন করার জন্য আত্মাকে সংযত রেখে এই পবিত্র ভ্রমণে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের নামের যেকের (স্মরণ) একমাত্র ধ্যান। অন্তরে থাকবে কামনা, মুখে লাব্বায়েকের সুমধুর বাণী. দৃষ্টিতে পবিত্র ভূমি আর পদদ্বয় পবিত্র ভূমির স্পর্শে ধন্য। এই মুহূর্তে কত আনন্দ! কত তৃপ্তি! কী প্রাপ্তির আস্বাদন! কত শান্তি। মানবাত্মার চরম প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্তের উত্তেজনায় হৃদয় পুলকিত, শিহরিত। এই সময় নিজেকে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই মানব হৃদয়ের একান্ত কর্তব্য।

এই মুহূর্তে অতিরিক্ত জিনিষপত্র কেনার জন্য আকুল ও অস্থির হলে তা হবে নিজের জন্য নিজের উদ্দেশ্যের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। একটু একটু করে মানসিক প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই তো পৌঁছুতে হবে আল্লাহ্‌র দরবারে। হৃদয়ে সদা জাগরূক রাখতে হবে আল্লাহ্‌ ভীতিকে। হাদিস শরীফে আছে একবার জয়নাল আবেদিন হজের জন্য তৈরী হয়ে এহরাম পরলেন এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাব্বায়েক পড়তে গেলেন, কিন্তু পড়তে পারলেন না, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এই ভয়ে যে যদি আল্লাহ্‌ তাঁর হাজিরাকে নামঞ্জুর করে দেন। শুধুমাত্র এই ভয়ে 'আমি হাজির' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আর এহেন দরবারে উপস্থিত হতে যাওয়ার পূর্বে যদি কেউ জিনিষপত্র কেনার জন্য অস্থির হন তার চেয়ে পরিতাপের ও দুর্ভাগ্যের কি হতে পারে!

অত্যন্ত বিনম্রভাবে নামায আদায় করে তারপর যেখানে কাস্টম শেড থেকে জিনিষপত্র এনে রাখা আছে সেখানে যেতে হবে। সেখান থেকে নিজের নিজের জিনিষপত্র এনে যে বাড়ীতে যিনি থাকবেন তার সামনে রেখে দিতে হবে। এখানে কারো জিনিষপত্র হারাবার ভয় নেই। নিজ নিজ মালের উপর নাম ঠিকানা ও কুলির নম্বর লিখে রাখতে হবে। এই মোসাফিরখানায় এক রাত্রি কাটাতে হবে। পরদিন মক্কা শরীফ রওয়ানা হতে হবে। তাই মালপত্র বেশী টানা টানি করার কোন প্রয়োজন নেই। পরদিন মক্কা শরীফ যাওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত বাস আসবে। তার জন্য কোন

যাত্রীকেই কোন ভাড়া দিতে হবে না। এই বাসের ছাদের উপর জিনিস পত্র তুলে দিতে হবে। এখানে কোন কুলি পাওয়া যাবে না। নিজের মালপত্র নিজেকেই বাসে তুলে দিতে হবে বা নামাতে হবে। সরকারী কুলি কাজ করবে কেবলমাত্র কাস্টম শেডে ও মদিনাতুল হোজ্জাজে মালপত্র নামানোর সময়। এজন্য কাউকে কোন মজুরি দিতে হবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা

জল জাহাজের যাত্রীদের একটি রাত মদিনাতুল হোজ্জাজ নামক জেদ্দার সুসাজ্জিত মোসাফের খানায় থাকতেই হয়। কিন্তু বিমান যাত্রীদের তা হয়না তারা প্রায়ই একই দিনে মক্কা শরীফ রওয়ানা হয়ে যান। যারা মদিনাতুল হোজ্জাজে আশ্রয় পাবেন তাদের পরদিন সকালে তৈরী হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। সরকারী নির্দ্ধারিত বড় বড় বাস সময় মত আসবে। প্রত্যেক বাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্নটি সিট আছে। সিটের বেশী একজনও যাওয়া যাবে না। বাস এলেই বহু লোক অস্থির হয়ে বাসে উঠতে ছুটে যান। এবং অসম্ভব রকম ধাক্কা-ধাকি করে বাসে ওঠার চেষ্টা করেন। চালক ও তার সহযোগী এসব দেখে হাসাহাসি করে। বিস্ময়কর ব্যাপার? যা সিট তাই লোক যাবে এবং পরপর বাস এসে প্রত্যেককেই নিয়ে যাবে তবুও শুধু মাত্র অজ্ঞতার জন্যই এই অশোভন আচরণ শুরু হয়ে যায়।

বাস এলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যে বাসে সিট পাওয়া যাবে সেই বাসের মাথায় নিজেদের জিনিষ পত্র নিজেদেরই উঠিয়ে দিতে হবে। জিনিষ পত্র ভালভাবে উঠিয়ে দিয়ে বাসের মধ্যে গিয়ে বসে সাধ্যমত লাব্বায়েক পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে এইসব কাজ যেন কোন ভাবে 'লাব্বায়েক' ভুলিয়ে না দেয়। বাসে জিনির পত্র উঠে গেলে এবং সিট অনুযায়ী লোক উঠে গেলেই বাস মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা দেবে।

বাস ছাড়ার আগে বাসের লোক সব পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ড্রাইভারের কাছে দেবেন। ড্রাইভার পাসপোর্ট গুনে যাত্রীর সংখ্যা মিলিয়ে নিয়ে বাস ছেড়ে দেবেন। এই ভাবে শুরু হবে জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ প্রবেশের

যাত্রা। তীব্র বেগে বাস চলবে। ঘণ্টা খানেকের পথ। তবে কোন কোন সময় মক্কা শরীফ যেতে দেড় থেকে দু ঘণ্টাও লেগে যায়। চমৎকার রাস্তা। আমাদের দেশের মত ময়লা নোংরা, অসংখ্য গর্ত ইত্যাদি কোথাও কিছু নেই। একে বারে মসৃণ একমুখী চিহ্ন দেওয়া রাস্তা। এখানের চালকগণ কোন ভাবে নিয়ম ভঙ্গ করেন না। তাছাড়া নিয়ম ভঙ্গের শাস্তিও কঠোর।

পবিত্র হেরেমের সীমানা ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর সময় থেকেই পবিত্র মক্কা শরীফের সম্মানার্থে জোড়া খুঁটি পুঁতে সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। মক্কা শরীফ থেকে পূর্বে ১৲'৪৮ কি. মি., পশ্চিমে ১৬'০৯ কি. মি., উত্তরে ৪'৮৩ কি. মি., দক্ষিণে ১১ ২৭ কি. মি., এই হলো হেরেম শরীফের সীমানা। এই সীমানার মধ্যে কোন পাপ কাজ করা, কোন ঝগড়া বিবাদ করা, কোন পড়ে থাকা জিনিষ পত্র স্পর্শ করা, কাউকে কোন কষ্ট দেওয়া নিষেধ। এমনকি এই সীমানার মধ্যে গাছ, তৃণ, লতাপাতা ছেদন বা কর্তন করাও নিষেধ।

মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। জেদ্দা থেকে সরকারী বাস যোগে সরকারী ব্যবস্থাতে যাওয়া সুবিধাজনক। বেসরকারী বা নিজ ব্যবস্থায় মোটর যোগে যাওয়া যায় কিন্তু তাতে পথে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। এমন কি মক্কা শরীফ পৌঁছেও সে অসুবিধার জন্য কাতর থাকতে হয়। এ পথে অগ্রসর না হয়ে ধৈর্য সহকারে নির্ধারিত হাজি বাসে যাওয়াই শ্রেয়। হেরেম শরীফের সীমায় গিয়ে পবিত্র হওয়া ওজু ও গোসলের সুযোগ না মেলারই সম্ভাবনা বেশী। তাই জেদ্দা থেকে রওনা হওয়ার আগেই এ কাজ সেরে বাসে ওঠা বাঞ্ছনীয়।

হেরেমের সীমানায় প্রবেশের সময় চেকিং আছে। এই এলাকার মধ্যে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো প্রবেশিকার নেই তাই এই চেকিং। যে কোন গাড়ীতে গেলেও এই চেকিং হবেই। মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ এই এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং যিনি এই প্রবেশে সাহায্য করবেন তারও মৃত্যুদণ্ড হয়। তাছাড়া এখানে প্রবেশের আগেই ড্রাইভার সব পাসপোর্ট সরকারী চেকপোষ্টে দেখিয়ে "মোয়াসসেসা" নম্বর মেরে নেবেন এবং যে মোয়াসসেসায় হাজিদের নিয়ে যাওয়া হবে তার একজন লোক এখান থেকে বাসে উঠে নির্দেশকের কাজ করবে এবং নির্দিষ্ট মোয়াসসেসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। ওখানে পৌঁছে সকলের মালপত্র মোয়াসসেসা কর্তৃপক্ষ বাস থেকে নামিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে

দেবেন এবং সেখান থেকে প্রত্যেককে নিজের নিজের জিনিসপত্র উঠিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে। এখানে নেমে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করতে করতেই মোয়াসসেসা কর্তৃপক্ষ খাওয়ার আয়োজন করবেন অথবা যাত্রীগণ চাইলে তাওয়াফে যিয়ারাত করাতে নিয়ে যাবেন।

জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে হোদায়বিয়ায় একটি মনযিল। বর্তমানে এই জায়গার নাম 'শোমায়সিয়া'। এটাই জেদ্দা থেকে যাওয়া লোকেদের জন্য হেরেমের সীমানা। হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করার সময় একাগ্র চিত্তে উচ্চ স্বরে তালবিয়াহ পড়া একান্ত প্রয়োজন। প্রশংসা সেই বিশ্বপালক প্রভুর যিনি এই বরকতময় মাটিতে নিরাপদে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। এই সেই বরকতময় জায়গা যেখানে শতচেষ্টাতেও প্রবেশের অধিকার অনেকের ভাগ্যে জোটেনা। সেজন্য সেই মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়ার উদ্দেশ্য এই দোওয়া পড়া কর্তব্য :

হোদায়বিয়ায় পোঁছে পড়ার দোওয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেরাব্বিল বায়তে মেনাদ দাইনে ওয়াল ফাকরে অমিন জাইকিস সাদরে অমিন আজাবিল কাবরে।)

বাংলায় ঃ হে আল্লাহ্ আমি ঋণ, দারিদ্র্য ও মনের সংকীর্ণতা ও কবরের আযাব থেকে এই গৃহের মালিকের (অর্থাৎ তোমার) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

বর্তমানে যাত্রীদের সরকার নির্ধারিত বাসে যেতে হয় বলে বাস চালক যে পথে নিয়ে যাবে যাত্রীদের সে পথেই যেতে বাধ্য হতে হয়। মক্কা শরীফের পথে হেরেম শরীফের সীমানা বরাবর হোদায়বিয়াতে শোমাসিয়া নামে একটি জায়গা পাওয়া যাবে। এই স্থানের অসংখ্য ফজিলত। পবিত্র কোরাণে আছে—"এই সেই জায়গা যেখানে প্রিয় নবী এবং সাহাবাগণ কাফেরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ ও ওমরাহর কাজ করতে পারেননি।"

এখানেই ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে বিখ্যাত হোদায়বিয়ার সান্ধ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এখান থেকেই আমাদের প্রিয় নবী ও তাঁর সঙ্গীগণকে মদিনায়

ফিরে যেতে হয়। এই জায়গাতেই বিশ্বনবী সাহাবাগণের কাছ থেকে মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই শপথই ইতিহাসের বিখ্যাত 'বায়াতে রেদওয়ান' বা সন্তুষ্টির তথা আত্মোৎসর্গের শপথ বলে খ্যাত। সম্ভব হলে ও সুযোগ পাওয়া গেলে এখানে থেমে দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে একান্ত বিনয়াবনতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা উত্তম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম মনযিল হোদায়বিয়ার স্মৃতিচারণ

বর্তমানে হোদায়বিয়া অঞ্চলও শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা ইসলামের ইতিহাসের যে হোদায়বিয়ার ছবি দেখি আজ আর সেই পরিবেশ নেই। দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে গাড়ী। সতর্ক না হলে অনেক ক্ষেত্রে বোঝাও যাবে না কখন হোদায়বিয়া এলাকা পার হয়ে গেছে। এ জায়গা খুবই বরকতময়। প্রিয় নবী ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সঙ্গী-সাথী সহ মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। মুসলমানদের শোনিত রক্তে শুষ্ক পাথুরে মাটি গাঢ় লাল রঙে সিক্ত হতে থাকে। এমনি অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান মদিনা শহরে। মদিনা হযরতের নানার দেশ। এখানে এসে সঙ্গী-সাথীসহ সমাদর পেয়েছেন তিনি। নিশ্চিন্তে ধর্মপ্রচার করেছেন। মাত্র ছ'বছরেই হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্মের আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছেন। একের পর এক দেশ ইসলামের অনুশাসন মেনে নিয়েছে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ প্রতিনিয়ত তাঁর আদর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেছে। দয়ার নবী তাঁর সীমাহীন করুণা, দয়া আর সদয় ব্যবহারে সিক্ত করছেন সকলকে। এই সময় ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি পরধর্ম সহিষ্ণুতার এক জ্বলন্ত ইতিহাস তৈরী করলেন পৃথিবীর বুকে। সিনাই পর্বতের কাছে সেন্ট ক্যাথারিন গীর্জার ধর্মযাজকের সঙ্গে এক সন্ধি করলেন। এই সন্ধিতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের দিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। তারা এমন স্বাধীনতা ইসলামের সর্বোচ্চ শাসক, ধর্মপ্রচারক আল্লাহ্‌র দূতের কাছ থেকে পেলেন যা ইতিপূর্বে কোন খ্রীষ্টান শাসকও দেননি। সকলকে অবাক করে তিনি আরও ঘোষণা করে দিলেন কোন মুসলমান এই সন্ধির শর্ত ভাঙলে তিনি আল্লাহ্‌র

আদেশ লঙ্ঘনকারীর মতই গণ্য হবেন। কি সে সন্ধি। কি তার মর্মকথা ! সে সন্ধির মর্মকথা হল, "মুসলমানরা সাধারণভাবে খ্রীষ্টানদের রক্ষা করবেন। তাদের গীর্জাঘর আর ধর্মযাজকদের বাসগৃহাদি সবরকম আপদ-বিপদ ও আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেবেন মুসলমানগণ। কোন ধর্মযাজককে ধর্ম-মঠ থেকে বিতাড়িত করা হবে না, তাদের উপর কোন অন্যায় কর চাপান হবে না, কোন খ্রীষ্টানকে তার ধর্মমত ত্যাগ করতে বলপ্রয়োগ করা হবে না, কোন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করা হবে না, মুসলমানদের মসজিদ বা বাসগৃহের প্রয়োজনে কোন গীর্জাঘর ভেঙে ফেলা হবে না, কোন খ্রীষ্টান মহিলা মুসলমানকে বিয়ে করলেও তাকে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে হবে না বরং নির্বিঘ্নে নিজ ধর্মাচরণ করতে পারবেন সেজন্য কোনভাবে তাকে বিরক্তও করা হবে না, খ্রীষ্টানগণ কোন কাজে সাহায্য প্রার্থনা করলে তাদের অভাব মোচনে মুসলমানগণ সাহায্য করবেন।" এহেন উদার, ন্যায়ানুগ সন্ধি শর্তে তৎকালীন বিশ্বের খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনি করে মাত্র ছ'বছরেই একটা সুশীতল শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া তৈরী হল। কিন্তু হযরতের মাতৃভূমি মক্কা ! না তারা তখনও আত্মাভিমানে জ্বলছে। কিন্তু দয়ার নবী মাতৃভূমির চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এক এক করে ছটি বছর কেটে গেছে। মাতৃভূমি আর আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কাআবা শরীফের দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, আল্লাহ্‌র ঘরের আকর্ষণ প্রিয় নবীকে পলে পলে অস্থির করে তুলছিল। তাই ভক্তবৃন্দের একান্ত আগ্রহকে মূলধন করে হযরত মাতৃভূমি দর্শন আর আল্লাহর ঘরের হজ করার মনস্থির করে ফেললেন। কিন্তু হলে কি হয় পবিত্র কাআবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তো মুসলমানদের চিরশত্রু পৌত্তলিক কোরায়েশদের হাতেই। তাই নানা ভাবনা-চিন্তা ও পরামর্শের পর হযরত যিলকাদ মাসে পবিত্র ভূমি মক্কা ও কাআবা দর্শনে যাওয়া স্থির করলেন। আরব দেশের নিয়মানুসারে এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকে। এই সময় শত্রুগণও বন্ধুভাবে একত্রে মিলিত হওয়ার প্রথা তৎকালীন আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সেদিন ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসের প্রথম চন্দ্রোদয় হয়েছে। হযরত সাহাবিদের (শিষ্য) ওমরাহ্‌ পালনের জন্য তৈরী হতে বললেন। আর বললেন ভ্রমণোপযোগী তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাকতুমকে মদিনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রায় দেড় হাজার আনসার ও মোহাজেরিন সঙ্গে নিয়ে এহ্‌রামের

কাপড় পরে মদিনা থেকে পবিত্রভূমি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন। হযরত মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করে 'জুল হোলায়ফা' নামক জায়গায় পৌঁছে জোহরের সালাত আদায় করলেন। ওদিকে কোরায়েশরা হযরতের আগমন-বার্তা শুনে স্থির করল যে মুসলমানদের মক্কা শহরে বা কাআবা ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই ভেবে তারা মক্কার প্রবেশ পথ অবরোধের জন্য এগিয়ে গিয়ে 'বলদা'তে শিবির ফেলল। উদ্দেশ্য হযরত যেন আর এগোতে না পারেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হযরত সদলবলে পথের দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে গেলেন। এহেন দৃশ্য দেখে অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনীর নেতা দ্রুত ফিরে গিয়ে মক্কায় হযরতের আগমন বার্তা জানাল। এদিকে হযরতের উট কাসোয়া হোদায়বিয়ার[১] কাছে পৌঁছে শয়ন করায় সকলে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব মাত্র ৯ মাইল। এখানে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। মুসলমানগণ পানির সন্ধান করতে করতে একটা শুকনো কূপের সন্ধান পেলেন। হযরত সেই শুকনো কূপে একটা তীর নিক্ষেপ করতে তা পানিতে ভরে গেল। বিশ্রামরত মুসলমানগণ সেই পানি ব্যবহার করে তৃপ্ত হলেন। এই জনশূন্য পাহাড়ী জায়গাটি আজ আলোক মালায় সজ্জিত আধুনিক সুবিধাপূর্ণ অঞ্চল।

কোরায়েশরা প্রথমে দূত পাঠালেন তাঁর আগমনের কারণ জানতে। হযরত তাঁর স্বভাব সুলভ শান্ত কণ্ঠে জানালেন আমরা 'ওমরাহ্' করতে এসেছি। এছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কোরায়েশ দূত বোদায়েল বললেন কোরায়েশগণ 'বলদা'[২]-তে সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য তৈরী আছে। হযরত একথা শুনে বিচলিত না হয়ে বললেন—"কোরায়েশগণ সবসময় যুদ্ধে অগ্রণী হয়। তাতে তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। যদি কোরায়েশরা যুদ্ধ করতেই চায় তার জন্য আমি অন্য সময় নির্দ্ধারণ করে দেব। তারা যেন বাকি সময় আমাকে ধর্মপ্রচার করতে দেয়।" কোরায়েশ দূত ফিরে এসে মক্কাবাসীদের জানাল যে মুসলমানগণ যুদ্ধ করতে আসেনি এসেছে ওমরাহ পালন করতে। সেই সঙ্গে হযরতের প্রস্তাবও বলল। এসব শুনে কোরায়েশরা আস্বস্ত হতে পারল না তারা পুনরায় আরোয়া নামক

১. হোদায়বিয়া একটা গাছের নাম। ঐ গাছের নাম থেকেই ঐ জায়গার নাম হোদায়বিয়া হয়েছে।

২. একটি জায়গার নাম।

একজনকে পাঠাল আগমনের কারণ জানতে। আরোয়াকেও হযরত আগের মতই উত্তর দিলেন। আরোয়া হযরতের সঙ্গে কথাবার্তার সময় একটু ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছিল। এতে হযরতের সঙ্গীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং তাকে সাবধান করে দেন। আরোয়া ফিরে গিয়ে কোরায়েশদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিল এবং জানাল মোহাম্মাদ (সাঃ) সত্যিই হজ করতে এসেছেন যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা মুসলমানদের নেই। এর পরও বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক এসে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনে গেলেন যে মুসলমানরা সত্যিই যুদ্ধের জন্য আসেননি, এসেছেন হজ করার জন্যই। এমনকি তাদের সঙ্গে কোরবানীর জানোয়ারও রয়েছে। এইভাবে একাধিক গোষ্ঠীর লোকের মন থেকে যুদ্ধাশঙ্কা দূর হল আর হযরতের মধুর চরিত্র ও শান্তির অমিয় বাণী সকলকেই প্রভাবিত করল।

হযরত যে শান্তির উদ্যোগী তা প্রমাণের জন্য তিনিও সচেষ্ট হলেন। আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ নিজের উট আল-কাসওয়াকে দিয়ে হেরাসকে মক্কায় পাঠালেন। হেরাস মক্কায় পৌঁছুতেই কোরায়েশরা নিরীহ উটটিকে বধ এবং হেরাসকে হত্যার উদ্যোগ করল। কোরায়েশদের এই অন্যায় আচরণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল এবং হেরাসকে তারা কিছুতেই হত্যা করতে দিল না। হেরাস নির্বিঘ্নে হযরতের নিকট ফিরে এলেন কিন্তু হযরতের প্রিয় উট আল-কাসওয়াকে তারা জখম করে খুঁত করে দিল।

হযরত এতেও দমলেন না। তিনি পুনরায় হযরত ওসমানকে দূত হিসাবে মক্কায় পাঠালেন। হযরত ওসমান মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কোরায়েশ নেতাদিগকে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত না করে ওসমানকে বন্দী করে ফেলল। এদিকে ওসমানের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে মুসলমানগণ বিচলিত হয়ে উঠলেন। এই সময় হযরত ওসমানের নিহত হওয়ার সংবাদে মুসলমানগণ মর্মাহত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য তাদের মধ্যে স্বর্গীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হল। এতো ওসমানের একক হত্যা নয়, এতো সত্যের হত্যা! এই অন্যায় আঘাত একনিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী আল্লাহ্‌র প্রতি উৎসর্গীকৃত হৃদয় মেনে নেবে কেন! যে মুসলমানগণ সমস্ত হিংসা, দ্বেষের কলুষতামুক্ত হয়ে জাগতিক অস্থায়ী জীবনের মোহ, মায়া, মমতা ত্যাগ করে হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাইলের স্মৃতিচারণে নিজেদের বিলীন করে দিয়ে এক

অনাবিল নৈসর্গিক প্রশান্তিতে ধ্যান গম্ভীর ছিলেন, কোরায়েশদের এহেন আচরণে সেই উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে সৃষ্টি হল এক দাবানলের স্ফুলিঙ্গ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেও ত্যাগের মন্ত্রে, কোরবানীর আদর্শে আত্মস্থ মুসলমানগণ ভাবতেও পারেননি তাঁদের এই শান্তিপূর্ণ মাতৃভূমি দর্শন আর পবিত্র আল্লাহ্‌র ঘরের হজের এহেন মহান সৎ উদ্দেশ্যকে এভাবে রক্তরঞ্জিত করবে কোরায়েশরা। সুতরাং আর নয়। সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি এ আঘাতের উপযুক্ত জওয়াব দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় অবিচল হওয়ার আহ্বান জানালেন আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নজির আজও তৈরী হয়নি।

হযরত 'হোদায়বিয়া' বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে সাহাবিদের আহ্বান করলেন—'এসো হাতে হাত দিয়ে কোরায়েশদের সংগে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা কর।' সংগে সংগে একে একে এগিয়ে এল সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল ১৫০০ মানুষের পূতঃ অন্তরের বলিষ্ট হাত। তাঁরা হযরতের হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন—ইসলামের জন্য তারা প্রত্যেকে কোরায়েশদের সংগে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেবেন তবুও পিছু হটবেন না।

শত্রুর হাতের মুঠোয় একদল নিরস্ত্র মুসলমান সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য আল্লাহর আর আল্লাহর নবীর দ্বীনের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা আর আত্মদানের এক সীমাহীন উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই তো হল সত্যিকারের ত্যাগ, হৃদয়ের হজ। হজের প্রকৃত উদ্দেশ্যই নিজেকে আল্লাহর কাছে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। মুসলমানদের প্রথম হজ ও ওমরাহের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে সেই আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা বাণীই উচ্চারিত হল। হজের প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করে দেওয়া আজ শেষ নবী হযরতের হাতে হাত রেখে শিষ্যগণ সেই প্রতিজ্ঞাই রেখে গেলেন বিশ্বজগতের সব দেশের হজ কামী মানুষের জন্য। এটাইতো লাব্বায়েকের প্রকৃত প্রতিজ্ঞা। 'আল্লাহ্‌ গো আমি হাজির, হাজির তোমার দরবারে।' একথা তো মুখে উচ্চারণ করার জন্য নয়, প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ে অনুভব করার জন্য। আর সেই অনুভবের অনুভূতিতেই তো প্রতিষ্ঠা হবে সত্যিকারের ত্যাগের স্বাক্ষর। শুধু মুখে নয়, শুধু হৃদয়ের গোপন গহ্বরে নয়, কাজেও তা দেখাতে হবে—সেই প্রতিজ্ঞাই করালেন প্রিয় নবী হযরত। মদিনা থেকে আনা কোরবানীর জানোয়ার কোথায় পড়ে রইল। একে একে ছুটে গেলেন মুসলমানগণ প্রিয় নবীর নির্দেশে আল্লাহ্‌র জন্য নিজের মধ্যে নিজের আত্মার সব কিছুকেই

কোরবানী দিতে। মনের কোণের পশুরূপী দ্বেষ, হিংসা, গর্ব, ক্রোধ সবকিছুকে আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী দিতে ছুটে গেলেন। এই তো হল সত্যিকারের হজ, সত্যিকারের প্রতিজ্ঞা।

এহেন ত্যাগের মানসিকতায়, এহেন আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে আসায় হযরত শিষ্যদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন: "আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তোমরা কেউ জাহান্নাম গামী হবে না।" এই প্রতিজ্ঞাকেই বলা হয় বায়াতে রেদওয়ান। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে: "সত্যসত্যই বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তখন বিশ্বাসীদের উপর প্রসন্ন হয়েছেন যখন তারা তরুতলে তোমার (হে, মোহাম্মাদ) সংগে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হচ্ছিল, তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জেনেছেন, অতঃপর তাদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছেন এবং সন্নিহিত বিজয়ের পুরস্কার তাদের দিয়েছেন।" অন্যদিকে কোরায়েশরা মুসলমানদের এ প্রতিজ্ঞার খবর জেনে হযরতের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইল। তারা তখন বিবেচনা করল মোহাম্মাদের আর তাঁর ধর্মের প্রভূত ক্ষমতা দিনে দিনে যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে আর মোহাম্মাদ (সাঃ) যে ভাবে শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাতে তাঁর সঙ্গে যে কোন বিবাদ এড়িয়ে চলাই ভাল। এই সব সাত পাঁচ ভেবে তারা হযরত ওসমানকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁরই সঙ্গে সোহায়েলকে হযরতের নিকটে পাঠালেন সন্ধি করার জন্য। ওসমান ফিরে আসায় মুসলমানগণ আশ্বস্ত হলেন। ওসমান ফিরে হযরতের নিকট মক্কার ঘটনা জানালেন। আবু সুফিয়ান হযরত ওসমানকে কাআবায় হজ ও ওমরাহ্‌ করার কথা বলা সত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের ছেড়ে একা একাজ করতে অস্বীকার করেছেন বলেও জানালেন। বলা বাহুল্য কিছু মুসলমানের ধারণা হয়েছিল ওসমান হয়ত একাই কাআবা ঘরে এবাদাত করে আসবে। এ নিয়ে কেউ কেউ হযরতের নিকট সন্দেহও ব্যক্ত করেছিল। এখন তাদের সে সন্দেহ দূর হল।

ওসমানের সঙ্গে আসা কোরায়েশ দূত সোহায়েল সন্ধির শর্তের প্রস্তাব দিলেন হযরতের কাছে। তিনি হযরতকে বললেন: "এ বছর আপনাদের মদিনায় ফিরে যেতে হবে, আগামী বছর এসে ওমরাহ্‌ ও হজ ব্রত পালন করতে পারবেন। আত্মরক্ষার্থে ভ্রমণোপযোগী অস্ত্র ছাড়া কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবেন না। আমাদের যে সকল লোক আপনার নিকট যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের আমাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। কোন

মুসলমান ধর্ম ছেড়ে চলে এলে তাদের আর মুসলমানদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে না। আরবের যে কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন। আগামী দশবছর কোরায়েশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।" হযরত কোরায়েশদের সন্ধি শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে হযরত আলিকে তা লেখার জন্য বললেন। এবং সন্ধি শর্তে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করলেন।

এবার হযরত সকলকে এখানেই মস্তক মুণ্ডন করে এহ্রাম খুলতে বললেন। সেইমত সকলে এখানেই ওমরাহ্ ব্রত ভঙ্গের নিয়মানুসারে মস্তক মুণ্ডন ও কোরবানীর কাজ শেষ করলেন। হযরত এখানে ২০ দিন অপেক্ষা করেও মাতৃভূমি দেখতে পেলেন না। আল্লাহ্র ঘরের হজ করতে পারলেন না। অসীম ধৈর্য সহকারে শিষ্যগণকে মাতৃভূমি আর আল্লাহ্র ঘরের মাত্র ন' মাইল দূর থেকে না দেখার গভীর বেদনা নিয়ে ফিরে যেতে হয়। এখান থেকে মদিনায় ফিরে যাওয়ার পথে জাহিয়ান নামক স্থানে 'ইন্না ফাতাহনা' সুরা অবতীর্ণ হয়।

আর আজ কত দূর দূরান্ত থেকে মানুষ কত নিরাপদে সেই পবিত্রভূমি কত সহজে অতিক্রম করে চলেছেন। তাই এই প্রথম মনযিলে এসে প্রথমেই এ ঘটনার মর্মার্থ অনুধাবন করা দরকার, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র কাছে উৎসর্গ করে দেওয়া দরকার। স্মরণ করতে হবে সেই বায়াতে রেদওয়ানকে। সেই প্রতিজ্ঞাই আজ প্রত্যেক হজ যাত্রীকে স্মরণ করতে হবে এই প্রথম মনযিলে। নতুন করে এখানে লাব্বায়েকের অর্থ হৃদয়াঙ্গম করে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রসুলের পথে। সেই সঙ্গে এহেন সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এখানে দু রাকাআত নফল নামায পড়ে নিতে পারলে ভাল। তবে সব সময় সে সুযোগ হয়ত পাওয়া যাবেনা, কিন্তু সম্ভব হলে সেদিনের সেই স্মৃতিচারণ করে নিজের মনের সব কলুষ কালিমা ধুয়ে মুছে নির্মল করে নিতে হবে।

এমনি ভাবে প্রথম মনযিল অতিক্রম করে গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চলবে মক্কা শরীফের দিকে। দুপাশে পাহাড় তার মাঝে মসৃণ পরিচ্ছন্ন পথ, মাঝে মাঝেই বিদেশী কোম্পানীর বিশাল বিজ্ঞাপনের সুদৃশ্য হোর্ডিং। চারিদিকে নির্মীয়মান আধুনিক শহর। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে দেশ আর দেশবাসী। এই পথের এক জায়গা থেকেই বেরিয়ে গেছে তায়েফের পথ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পবিত্র শহর মক্কা মোয়াজ্জামায় প্রবেশ

অবশেষে জীবনের বাঞ্ছিত ধন, সর্বক্ষণের কল্পনার ও চিন্তার বস্তু পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামা ও কাআবা শরীফের সুদৃশ্য মিনারগুলি সূর্যালোকে জীবন্ত হয়ে দেখা যাবে আর যদি রাত হয় তবে আলোকমালায় ঝলমল করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যখনই প্রথমে এ শহর দৃষ্টি গোচর হবে তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে বিশ্ব প্রভুর কাছে নিবেদিত প্রাণে পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

(আল্লাহুম্মার যুকনী বেহা কারারান ওয়ারযুকনী ফীহা রিযকান হালালান।)

বাংলায় : ওগো আল্লাহ্। এই পবিত্র মক্কা শরীফে আমাকে শান্তি স্থিতি দিও এবং বৈধ (হালাল) আহার (রিযিক) দিও।

হজযাত্রীদের পবিত্র মক্কা শহরে প্রবেশ করার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে লাব্বায়েক পড়তে পড়তে প্রবেশ করা দরকার। স্মরণ রাখতে হবে পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ:) এর সময় থেকে সমস্ত পয়গম্বরই এখানে এসে মাথা নত করেছেন, প্রাণের আবেগে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। তাই সকলেরই আবেগ ও বিনয়ের সঙ্গে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা হবে :

"ওগো দয়াময় আল্লাহ্, তুমিই আমার প্রভু। আমি নগণ্য দাস। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তোমার দরবারে এসেছি তোমার হুকুম পালনের জন্য, তোমার করুণা পাওয়ার আশায়। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমার দ্বারে হাজির হয়েছি প্রভু! তোমার দরবারে আমার করুণ মিনতি, আজকের দিনে তুমি আমার যাবতীয় অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমার অপরিসীম দয়ায় আমাকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো, তোমার করুণার, তোমার দয়ার দ্বার আমার জন্য খুলে

দাও। শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাকে রক্ষা করে হজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা দিও। আমিন”

দিনে বা রাতে যে কোন সময় পবিত্র শহর মক্কায় প্রবেশ বৈধ। তবে রাতে প্রবেশ না করে দিনের বেলায় জান্নাতুল মওলার পথ ধরে প্রবেশ করা মোস্তাহাব বা উত্তম। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ), হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ও অন্যান্য বুযর্গগণ রাতে এলে শহরের বাইরে থাকতেন। সকালে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে শহরে প্রবেশ করতেন।

বিনম্র ও অবনত মস্তকে বিগলিত হৃদয়ে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে হবে। মুখে থাকবে অবিরত ‘আল্লাহুমমা লাব্বায়েক’ ধ্বনি, হৃদয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয়। এটিই জীবনের চরমতম সময়, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভের মুহূর্ত ! ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মিনতি সহকারে বিশ্বস্রষ্টার কাছে নিজেকে নিবেদন করার মুহূর্ত। নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে প্রার্থনা ও নিবেদনের মধ্য দিয়ে। কৃতজ্ঞতায় বিশ্বপ্রভুর দরবারে বিলীন করে দিতে হবে নিজেকে। বিশ্বপ্রভুই এই বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

এখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারাত, তাওয়াফ ও সায়ী সমাধা করে ওমরাহর কাজ শেষ করা। তারপর শুরু হবে মক্কা শরীফে পৌঁছে করণীয় কাজ। তার পূর্বে পবিত্র গৃহ কাআবা আর যমযমের বিবর্তনের ইতিহাস স্মরণ করে নেওয়া যাক। কাআবা ঘরের প্রতিষ্ঠা থেকে আজকের হেরেমের ইতিহাস এক বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের ইতিহাস। দেখা যাক কি সে ইতিহাস !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পবিত্র গৃহ কাআবা ও যমযম কূপের সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস

ক. কাআবা ঘর প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার ঃ

পৃথিবীর জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র আরাধনা শুরু করেন তাঁরই সৃষ্ট হযরত আদম (আঃ)। সে যে কতযুগ কতকাল আগের ঘটনা

তার হিসাব মানুষের বুদ্ধি বিবেকের কাছে আজও রহস্যাবৃত। আদম আর হাওয়া (আ:) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার ফলস্বরূপ নেমে এলেন ধরণীর ধূলায়। নেমে এসে নিজের কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকলেন। প্রতি পলে পলে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কঠিন শাস্তির চিন্তায়। তাই আল্লাহ্‌র এবাদাতই একমাত্র মুক্তির পথ, সেই প্রভুর সন্তুষ্টি লাভই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত লাভ। প্রতি মুহূর্তে এটা অনুভব করতে থাকলেন। কি করবেন তিনি! কোথায় পাবেন জান্নাতের সেই এবাদাতগাহ বায়তুল মামুর, যে প্রাণ ভরে নিরাকার বিশ্বপ্রভুর এবাদাত করবেন। একদিকে চিন্তা অনুশোচনা অপরদিকে সাথী বিবি হাওয়াকে হারাণর বেদনা। সঙ্গিনী হাওয়া যে কোথায় তা আজও বুঝে উঠতে পারেননি। এতবড় ভূভাগ কে কোথায় তা বুঝে ওঠাও সহজ নয়। এমনি করে হাজার চিন্তায় অনুশোচনায় অনুতাপে জর্জরিত আদম (আ:) আরাফাতের জাবালে রহমত পাহাড়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে করুণ মিনতি করতে থাকলেন। দয়ার আধার বিশ্বপ্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। সেই আরাফাত প্রান্তরেই দেখা পেলেন সঙ্গিনী হাওয়ার। একটু নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু কি করে এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবেন। তিনি যে অনেক বড় অপরাধ করেছেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে। প্রভুর প্রার্থনা গৃহে প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি তো কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না, কাতর হয়ে সেজদায় পড়ে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট বান্দার এহেন অবস্থায় অত্যন্ত সদয় হলেন। জান্নাতের বায়তুল মামুরের নক্সা নিয়ে জিব্রাইল (আ:)-কে পাঠালেন আদমের মনোবাসনা পূর্ণ করতে। সেই নক্সা নিয়ে হযরত জিব্রাইল (আ:) পাহাড় পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে নেমে এলেন। পৃথিবীর নাভিস্থল মক্কা শহরের এক ঘেরা জায়গায় নামিয়ে দিলেন সেই নক্সা। হযরত আদম কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেই নক্সার সামনে সেজদাবনত হলেন। আজকের কাআবা তো সেই বায়তুল মামুরেরই প্রতিচ্ছবি। বিশ্ব মানবের সেজদার কেন্দ্রবিন্দু। এবারে হযরত আদম প্রতি নিয়ত নিবিষ্ট চিত্তে এবাদাত করেন পৃথিবীতে নেমে আসা বায়তুল মামুরের নক্সার সামনে। আজও চলেছে সেই এবাদাত।

এমনি করে হযরত আদম পৃথিবীর মাটিতে জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে

ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন। আদম তো শুধু আদম নন তিনি যে আল্লাহ্‌র নবীও। আল্লাহ্‌ প্রথম নবী দ্বারা পৃথিবীতে প্রথম এবাদাত গৃহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পন্ন করলেন বিশ্ব মানবের জন্য। প্রতিনিয়ত সেখানে তাওয়াফ আর এবাদাতে আত্মস্থ থাকতেন পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী আদম ও হাওয়া (আঃ)।

হযরত আদমের ইহলোক ত্যাগের পরে হযরত শীশ (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র নবী নিযুক্ত হয়েছেন তখন পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি যথেষ্ট বেড়েছে। তিনি সেই নক্সার উপর পাথর সাজিয়ে একটা সুন্দর ঘর তৈরী করলেন। আল্লাহ্‌র নবীর কাজতো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়। সেই মতই শীশ নবী লম্বা চওড়ায় আর উচ্চতায় সমান করে সুন্দর ঘরটিকে তৈরী করলেন। পৃথিবী নাভিস্থলে। আল্লাহ্‌র নবী আল্লাহ্‌র ঘর কাআবাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কল্যাণকামী সত্য ধর্মের লোকদের এবাদাৎ গৃহ তথা বিশ্ব মানবের মিলন কেন্দ্র হিসাবে।

সেই থেকে যুগে যুগে কত নবী কত রসুল এসেছেন পৃথিবীর মানুষকে এক আল্লাহ্‌র আরাধনার আহ্বান জানাতে। এঁরা সকলেই পৃথিবীর প্রথম নবী আদমের নির্দ্ধারিত কাআবা ঘরকে তাওয়াফ ও যিয়ারাত করেছেন। কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়েছেন সেই এবাদাত গৃহের সামনে। কত মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ্‌র ঘরের দর্শনে উপস্থিত হয়েছেন পৃথিবীর নাভিস্থল মক্কা শহরে কাআবা ঘরের সামনে তার সীমা পরিসীমা নেই।

কালক্রমে হযরত নূহের সময় পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌ এক মহাপ্রলয় সৃষ্টি করলেন। ভাসিয়ে দিলেন দেশ-দেশান্তর, নগর-বন্দর, পাহাড়-পর্বত। প্রলয় শেষে আবার পৃথিবীতে নির্মল মুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল। দিনে দিনে পৃথিবী আবার মানুষে ভরে গেল। এবারও একের পর এক নবীর আগমন শুরু হল। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ভূমিষ্ঠ হলেন পৃথিবীর মাটিতে। আগেই এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

নূহের প্লাবনের পরে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের তলায় রইল কেবল এক অপরূপা সৌন্দর্য বিভূষিতা নিষ্পাপ পৃথিবী। এই প্লাবনে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে কতকিছু ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল হযরত শীশ নির্মিত পাথর সাজান কাআবার দেওয়াল। কিন্তু তার নক্সা? সে তো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বায়তুল মামুরের নক্সা, সে তো মুছে যেতে পারে না, সে নক্সা মানুষের আরাধনা আর এবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট। তা কি

মুছে যেতে পারে! আল্লাহ্‌র ঘরের নক্সা আল্লাহই তা রক্ষা করবেন আর আল্লাহই মানুষের জন্য তাকে এবাদাত গৃহে পরিণত করেছেন। নবী হযরত ইব্রাহীমকে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিলেন আবার কাআবাকে পাথরের দেওয়াল দিয়ে সাজাতে. তিনি পুত্র ইসমাইলের সাহায্যে বায়তুল মামুরের সেই নক্সার উপর আবার পাথর সাজিয়ে গড়ে তুললেন কাআবা ঘরকে। পৃথিবীর বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হল আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ আর আল্লাহ্‌র ঘরকে সামনে রেখে নিরাকারের এবাদাত, এমনি করে মানুষের কর্মচঞ্চল জীবনেও আল্লাহ্‌র এবাদাত আর এবাদাত গৃহ জ্বলন্ত আল্লাহ্‌ প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করল।

আবার হাজার হাজার বছর চলে গেলে, কত নবী কত রসুল এলেন আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে, পাথর সাজান দেওয়ালে ক্রমান্বয়ে সংস্কার প্রয়োজন হতে লাগল। তাই জরহম বংশীয় ও পরে আমালেকা বংশীয়গণ কাআবার দেওয়ালের জীর্ণতা সংস্কার করেন। আরও বহুকাল পরে দেওয়ালের কোন কোন অংশে জীর্ণতা দেখা দিলে 'কুসাই' কাআবার দেওয়াল পুনঃনির্মান করেন। এইভাবে পৃথিবীর বুকের সবচেয়ে সম্মানিত গৃহের সংস্কার সাধন করে এক একটি গোষ্ঠি সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। কালক্রমে কাআবা ঘরের আশপাশের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কাআবা ঘরের দেওয়ালও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবার সংস্কার করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পূর্ববর্তী বংশধর কোরায়েশগণ। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলামের অনুসাশন কালের মধ্যেও কাআবা ঘরের সংস্কার করা হয়েছে। প্রথমবার সংস্কার করেন আব্দুল্লাহ্‌ বিন জুবায়ের, দ্বিতীয় বার সংস্কার করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

কাআবা শরীফের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রায়শঃই নানা কারু কার্যের ব্যবস্থা বর্তমান সৌদী সরকারও করে থাকেন।

হযরত ঈশা (আঃ)-র জন্মের ছয়শত বছর পূর্বে হিমায়ার বংশীয় আবু কারাব সর্বপ্রথম কাআবা ঘরকে বস্ত্রাবৃত রাখার প্রথার প্রচলন করেন। সেই থেকে আজও কাআবা শরীফকে গেলাফে আবৃত করে রাখার প্রথা বহাল আছে। বর্তমানে প্রতি বছরই কাআবা শরীফের এই গেলাফ পরিবর্তন করা হয়। মিশ কালো রংএর মহামূল্য কাপড়ের উপর সোনার কারুকাজ করে লেখা কোরআনের আয়াত। অপূর্ব দৃষ্টি নন্দন এই বস্ত্র নির্মিত গেলাফ তৈরীতে প্রভুত অর্থ ব্যয় হয়। এই স্বর্ণ খচিত গেলাফে সর্বদা আবৃত রাখা হয়

কাআবা শরীফের দেওয়াল। বর্তমান পৃথিবীর বহু মুসলিম রাষ্ট্রনেতা এই গেলাফ পরানর ব্যয় ভারের অংশ নিতে একান্ত আগ্রহী থাকেন।

এছাড়া প্রতি বছর কাআবাঘরের ভিতরটা একবার বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের হাতে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে দেন। এ

বর্তমান সময় কাআবা ও হেরেম শরীফ

বর্তমান সময়ের কাআবার সামনে প্রার্থনারত বিশ্বমানবমণ্ডলী ও হেরেমের একাংশ

কাজও বিশেষ সম্মানের বলে গণ্য হয়। বর্তমানে কাআবা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নেই সাধারণ মানুষের। নেই এজন্য যে অসংখ্য মানুষের ভিড় সামলানো সম্ভব নয়। মাত্র কফুট জায়গায় ঐ জনস্রোত যদি যেতে চায় তাহলে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারাবেন হাজার হাজার মানুষ। তাই সাবধানতার এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

খ. যুগে যুগে কাআবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্তৃত্ব ভার ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক কাআবা ঘর পুনঃনির্মাণের পর থেকে ইসমাইল বংশীয়গণ কাআবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছিলেন। প্রথমেই সব কর্তৃত্বের আধিকারী ছিলেন ঐ ইসমাইলবংশীয়গণই। এমনি করে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হতে থাকে। এক সময় জরহম বংশীয়গণ আরব-ভূমিতে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উপর কাআবার কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান ভার অর্পিত হয়। ক্রমান্বয়ে জরহম বংশীয়গণের সঙ্গে ইসমাইল বংশীয়দের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে জরহম বংশীয়গণ বিজয়ী হয়ে সমগ্র মক্কার কর্তৃত্বভার অর্জন করেন। এমনি করে আল্লাহ বহু ছোট দলকেই বড় দলের উপর বিজয়ী করেছেন পৃথিবীর মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। জরহম নেতা মাযায একে একে মক্কা ও কাআবা শরীফের যাবতীয় কর্তৃত্ব নিজে করায়ত্ত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তীর্থ যাত্রীগণ মক্কা ও কাআবাতে মাযাযের তত্ত্বাবধানেই তীর্থ কাজ সমাধা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে মাযাযও ক্ষমতাগর্বে নিজের কর্তব্যকর্ম ভুলে তীর্থযাত্রীদের উপর নির্যাতন অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। তখন ইসমাইল বংশীয়গণ এই সকল অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে তীর্থযাত্রীদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা বনু বকর ও বনু খাযায় গোষ্ঠীকে একত্রিত করে জরহম বংশীয় নেতা মাযাযকে মক্কা শহর ও কাআবার কতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করেন। মাযায মক্কা ও কাআবাশরীফের কর্তৃত্ব থেকে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বেই এক সীমাহীন অপকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যান বিশ্বমানবের সামনে। প্রাচীন কাল থেকে কাআবা মসজিদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিকারী দুটি স্বর্ণহরিণ (গাজালে কাআবা) সাজান ছিল। মাযায বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে তার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ঐ হরিণ শাবক দুটিকে যমযম কূপে ফেলে দিয়ে তা মাটি ও পাথর দিয়ে পূর্ণ করে দেন। এই থেকে যমযম কূপের চিহ্ন মুছে যায়।

এদিকে কালের রথচক্র চলতে চলতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মের তিনশত বছর পূর্বে খাজায়া দলের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এই ভূভাগে। সেই সঙ্গে ঐ দলের নেতা 'উমর বিন লুহাই' কাআবা ঘরে কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই উমর বিন লুহাই ই প্রথম কাআবা ঘরের চত্বরে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমান্বয়ে মানুষ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র নবীদের শিক্ষা ও আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট হতে থাকেন। মানুষের মনের নানা

কুসংস্কার ধীরে ধীরে তাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা বিস্মৃত করে ফেলতে থাকে।

অপর দিকে ইসমাইল বংশীয়গণ ক্রমান্বয়ে মক্কা নগরে নিজেদের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। ঐ বংশের 'ফেহের' সর্বপ্রথম কোরায়েশ উপাধি গ্রহণ করেন। তবে ফেহের কাআবার কর্তৃত্ব উদ্ধার করতে পারেননি। তাঁরই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কুসাই কানানা দলের সঙ্গে মিলে বনু বকর ও বনু খাজায় গোষ্ঠীকে হাটিয়ে কাআবার কর্তৃত্বপদ অধিকার করে নেন। কোসাই মজ্জমা নামেও খ্যাত। তিনি সমগ্র কোরায়েশ জাতিকে একত্রিত করেন বলেই 'কুসাই' উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কুসাই-এর জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুদ্দার, পরে আবদে মানাফ কাআবার কর্তৃত্বপদ পান ও মক্কার শাসনভার অর্জন করেন। আবদে মানাফের মৃত্যুর পর পারিবারিক কলহ সৃষ্টির ফলে কাআবার বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার এক এক জনের উপর অর্পিত হয়। যেমন:—
১. আব্দে মানাফের পুত্র হাসিমের উপর খাদ্য ও পানীয় যোগানর ভার,
২. আব্দেদারের উপর কাআবার কর্তৃত্বপদ, পতাকা ধারণ ও সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয় ইত্যাদি। হাশিম কাআবার কর্তব্য কাজগুলি অত্যন্ত সুচারুরূপে পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। হাশিমের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা মোত্তালেব ঐ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেন। মোত্তালেব যখন বিশ্ব প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন তখন হাশিমের পুত্র আব্দুল মোত্তালেবের উপর এই কাআবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়।

এই আব্দুল মোত্তালেবই শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পিতামহ। তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাআবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতিনিধি আব্রাহা কাআবার সম্মান হানী করে জন মানসে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কাআবাঘর ধ্বংশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এই বাহিনী মক্কার মাত্র দশ মাইল দূরে মুজদালেফা এলাকার 'মুহাস্বার' নামক প্রান্তরে পৌঁছে তাঁবু গাড়ে। এই বিশাল হস্তিবাহিনী পৌঁছানর খবর মক্কা শহরে পৌঁছুতে দেরী হল না। নিরস্ত্র মক্কা বাসিগণ এই অন্যায় আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তারা ভয়ে শহর ছেড়ে দূরে পর্বত চূড়ায় আশ্রয় নিল। কিন্তু অবিচল আব্দুল মোত্তালেব। দৃঢ়তায় বজ্র কঠিন। নিজ কর্তব্যে সামান্য গাফিলতিও করলেন না তিনি। তিনি অবিচলভাবে কাআবা ঘরে প্রবেশ করে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র

কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। "হে আল্লাহ্ তুমি তোমার এই পবিত্র ঘরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর।" আব্দুল মোত্তালেবের কাতর মিনতি ব্যর্থ হল না। হাজার হাজার ছোট্ট ছোট্ট আবাবিল পাখী আকাশ অন্ধকার করে উড়ে এল আব্রাহার সৈন্য ছাউনির উপর। আবাবিল পাখির কঙ্করাঘাতে দাম্ভিক আব্রাহার সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। মূহুর্তে তার সেই অমিত বিক্রম তেজ আর কাআবা ধ্বংসের পরিকল্পনা ধূলোয় মিশে গেল। বিশাল হস্তিগুলো নিথর নিস্পন্দন পাথরের মত পড়ে রইল ঐ 'মুহাস্বার' প্রান্তরে। অসহায় আহত আব্রাহা কোন ক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তার পালানও বিফলে যায়। মাত্র কদিন পরেই ঐ দাম্ভিক আব্রাহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়।

জনশ্রুতি আছে আব্রাহার বাহিনী সবটাই পাথরে পরিণত হয়ে যায়। সে পাথর নাকি ঐ মুহাস্বারয় যুগ যুগ ধরে পড়েছিল। এ জনশ্রুতির সত্যতা যাচাই-এর সুযোগ বড় কম। গোটা দেশটাইতো পাথরের পাহাড়ে ঘেরা। মাটির স্পর্শ বড়ই বিরল। মুহাস্বার প্রান্তরে অমন পড়ে থাকা পাথরের ঢিবির অভাব নেই। কিন্তু এগুলো আব্রাহার সৈন্যদের পাথর হয়ে যাওয়া রূপ কিনা তা নির্দ্ধারণ করা ইতিহাসগতভাবে কঠিন। তবে জায়গাটি আজও অপামর জন সাধরণের কাছে 'অভিশপ্ত প্রান্তর'। তাই হাজিগণ মুযদালেফায় রাত কাটানর সময় এখানে অবস্থান করা থেকে বিরত থাকেন এবং সকালে মীনার পথে রওয়া দেওয়ার সময় ক্ষিপ্র গতিতে এই প্রান্তর পার হয়ে যান। এটাই এখানের সম্পর্কে হজের বিধান। দাম্ভিক আব্রাহার কাআবা আক্রমণের ঘটনা ঘটে বিশ্বের শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদের জন্মের মাত্র পঞ্চান্ন দিন আগে। আরবগণ এই বছরকে 'আম্মুল ফীল' বলতেন এবং আব্রাহার এই আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বছর গণনা করতেন। হিজরী সাল প্রচলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আরবদের মধ্যে ঐ ঘটনা অনুযায়ী সাল গণনা হত।

পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী একদিন ঐ একনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা কাআবার রক্ষক আব্দুল মোত্তালেব মৃত্যুর শীতল আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এই আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিশ্ব জগতের করুণা হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লামের পিতা। মোত্তালেবের মৃত্যুর পর তারই যোগ্য পুত্র যুবায়ের কাআবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুবায়েরের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আবু তালেব কাআবার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হন, এবং কাআবার কর্তৃত্বপদ তাঁর উপরই অর্পিত হয়। কিন্তু আবু তালের এই তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বইতে পারছিলেন না। তাই তিনি কনিষ্ঠভ্রাতা আব্বাসের উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরত আদম প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মামুরের নক্সার উপর হযরত শীশ নির্মিত ও হযরত এব্রাহিমের পুনঃনির্মিত ঐ কাআবা ঘর পৃথিবীর আদি থেকে আজও লক্ষ মানুষের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক উপাসনা গৃহ হিসাবে বিবেচিত হয়ে সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত রয়েছে। পৃথিবীর শুরু থেকে আজও মানুষ হৃদয়ের টানে এক নিরাকার আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিজে থেকে ছুটে চলে এই মহিমান্বিত কাআবার সামনে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বিশ্ব মিলনের এমন মহা ক্ষেত্রের নজির নেই কোথাও। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নানা ভাষা নানা রং-এর অসংখ্য মানুষ প্রতি বছর ছুটে চলেছেন একই উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে। অবলোকন করছেন জান্নাতের বায়তুল মামুরের নক্সায় প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লাহ্‌কে। নানা ভাষা নানা রং সবই স্তব্ধ হয়ে গেছে এখানে এসে। এখানে এসে বিশ্ব মানুষের ভাষা হয়ে গেছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদার রাসুলাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মাদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ)। সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে "লাব্বায়েক্ আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক্, লাব্বায়েক লা শারিকা লাকা লাব্বায়েক্, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নেঅমাতা লাকা অল মুলক্।

এইতো হল প্রকৃত পক্ষে দেশ, জাতি, মত পথের উর্ধ্বে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদ। সব সীমা রেখা ভুলে মানুষ পৌঁছেছে আল্লাহ্‌র সীমারেখার দোরগড়ায়। মহা মিলনের মহা প্রান্তরে মানুষ বিসর্জন দিচ্ছে জাগতিক সংকীর্ণতাবাদ আর জাতীয়তাবাদকে। শত্রুতা দ্বেষ হিংসা তো দূরের কথা আজ পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সামান্য কথায় বা আচরণে অপর প্রান্তের মানুষের কষ্ট বা দুঃখ না হয় তার জন্য সদা সতর্ক। এই তো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। এই তো ইসলামের মহাজাগতিক রূপরেখা। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে ধন্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতায় বিলিয়ে দিতে হবে নিজেকে। এই বিশ্বরূপ দর্শনের সুযোগ পেয়ে যিনি হাজির হতে পারছেন আল্লাহ্‌র ঘরের সামনের মহামিলনের আসরে তিনি ধন্য।

গ. যমযমের (প্রবাহিত ঝরনা) সংস্কার ঃ

যমযমের উৎপত্তি হয়েছিল সদ্যোজাত শিশু ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য। সে ইতিহাস এই বই-এর অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। এই প্রবাহিত ঝরনা

সেই থেকেই বিশ্বমানবের কল্যাণে অনবরত পানির প্রবাহ যুগিয়ে চলেছিল। কালক্রমে আরবের তথা মক্কা ও কাআবার কর্তৃত্ব ভারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জরহম গোষ্ঠীর সঙ্গে সীমাহীন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে জরহম গোষ্ঠি যখন বিপর্যস্ত তখন জরহম নেতা মাযায বিতাড়িত হওয়ার পূর্বেই নিজ গোষ্ঠির যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণ হরিণ শাবকদ্বয়কে এই যমযমের মধ্যে নিক্ষেপ করে মাটি পাথর দিয়ে বন্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যান।

পানির কষ্টে ক্রমান্বয়ে তীর্থ যাত্রীগণ কাতর হতে থাকায় তৎকালিত তত্ত্বাবিধায়ক হযরতের পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব এই যমযম পুনরুদ্ধারের আয়োজন করেন। স্বীয় পুত্র হারেসকে ডেকে 'আসফ' আর 'নায়লা' দেবমূর্তির সামনের অংশে মাটি খুঁড়তে বললেন। কিন্তু বাধ সাধল ঐ দেবতাদের উপাসক গোষ্ঠী। তারা তাদের দেবতার সামনে এভাবে খুঁড়তে দিতে রাজি নন। শুরু হল গণ্ডগোল দ্বন্দ্ব। কিন্তু দৃঢ়চেতা মোত্তালেব দমলেন না। তিনি সব বাধা সরিয়ে ঐ জায়গাতেই খনন কাজ চালিয়ে যম যম পুনরুদ্ধার করলেন। বিশ্ববাসীর কল্যাণে আল্লাহ্‌র দান কি চাপা থাকে! মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল সেই পূতঃ জলধারা। আজও পৃথিবীর সকল মানুষ প্রাণ ভরে পান করেন এই যম যম। শুধু নিজে পান করা নয় অন্ততঃ প্রতি বছর এক কটি লোক তিরিশ লিটার হিসাবে পানি বয়ে নিয়ে যান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তবুও এই শুষ্ক মরুতে আল্লাহ্‌র এ যমযম সর্বদা পূর্ণ থাকে পবিত্র পানিতে।

যমযম পুনরুদ্ধার কাজ চলার সময় সেই স্বর্ণ হরিণ শাবকদ্বয় (গাজ্জালে কাআবা) ও জরহমদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়।

বর্তমানে যমযম কূপের বহুবিধ সংস্কার করা হয়েছে। এখন এই যমযম মাকামে ইব্রাহিমের ঠিক নীচে হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যেই রয়েছে। উপর থেকে এর অস্তিত্বই বোঝা যায় না। মূল কূপটি বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলে তবেই কূপ দেখা যায়। একদিকে মহিলা-গণের নামার সিঁড়ি অন্যদিকে পুরুষগণের। মূল কূপটিকে কাঁচ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কূপের মধ্যে পাইপ নামিয়ে মেশিনের সাহায্যে পানি তোলা হয়। এই মেশিনের সঙ্গে পাইপ যুক্ত করে হেরেমের বিভিন্ন অংশে এমনকি হেরেমের বাইরেও বহুস্থানে কল লাগানো হয়েছে। ফলে হেরেমের ভিতরে ও বাইরে বহুলোক এই পানি পান করতে পারেন।

ইতিমধ্যে গাড়ি মক্কাশরীফ পৌঁছে মোয়াসসেসার অফিসে থামবে।

এখান থেকে ওমরাহ্‌র তাওয়াফ করতে যেতে হবে। তার আগে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় আরব দেশ ও জাতির ধর্মাচরণ কি অবস্থায় পৌঁছেছিল দেখা যাক। সাধারণ ধারণায় ঐ সময় পৌত্তলিকতাই আরব জাতির ধর্ম কল্পনা করা হলেও আসলে কিন্তু তা ছিল না। তাই ঐ সময়কার আরব জাতির ধর্মের রূপরেখার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ আলোচনা করা হল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির ধর্ম ঃ

হযরতের আবির্ভাবের আগে আরবে যে শুধুমাত্র পৌত্তলিক ধর্ম ছিল তা নয়। পৌত্তলিক ধর্ম ছাড়াও আরও বেশ কতকগুলি ধর্মমত সমাজে প্রচলিত ছিল, যথা—নাস্তিকতা, খোদাপরস্তি ও নিরাকার আল্লাহ্‌তাআলার উপাসনা ইত্যাদি। সাধারণ ভাবে আমাদের ভূভাগের লোকের যে ধারণা তা ঠিক নয়। আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত যে হযরতের সময়ের পূর্বে শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা ছিল। এটা ঠিক নয়, তবে পৌত্তলিকতাই ছিল সব থেকে বেশী লোকের ধর্মবিশ্বাস। কোরায়েশ গোষ্ঠীও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করত। ঐ সময় সমাজে প্রচলিত ধর্মগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

নিরাকার আল্লাহ্‌র উপাসনা ঃ

হযরতের পূর্বে আরব জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ও নিরাকার আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রচলিত ছিল। এরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১. সাবেয়ীন ধর্ম, ২. হযরত ইব্রাহীম ও অন্যান্য পয়গম্বরের ধর্ম, ৩. হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মের বিকৃত রূপ ইহুদী ধর্ম, ৪. হযরত ঈশা বা যীশুর প্রচারিত ধর্মের বিকৃত রূপ অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম।

সাবেয়ীন ধর্ম ঃ

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ৬১ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে

"যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ও সাবেয়ীন—যারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (কোরআন ৬২ : ১)

সাবেয়ীন মতাবলম্বীগণের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে 'শেখ' নামের এক মহাপুরুষ তাঁর পিতা ও ভ্রাতা ইনাকের সঙ্গে মিশরের পিরামিডে সমাধিস্থ হন। সেবি বা সাবেয়ী সেই শেখেরই ঔরসজাত পুত্র। সাবেয়ীর আবিষ্কৃত মত বলেই একে সাবেয়ীন ধর্ম বলা হত--কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত ইদ্রিসের প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে সাবেয়ীন ধর্ম। পরবর্তীকালে হযরত মূসা (আ:) সিনার পর্বতে যে ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হন তাতেও এই ধর্মের কিছু কিছু অনুবর্তন বিধিবদ্ধ আছে। তাই ঐ সময় সাবেয়ীন ধর্ম সাধারণ লোকের কাছে ভক্তি ও সম্মানের ছিল। প্রথম প্রচারের যুগে এই ধর্ম অধ্যাত্মভাবপূর্ণ ছিল, পরে ক্রমান্বয়ে তা সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হয়।

সাবেয়ীন ধর্মের মর্মকথা ছিল—নিরাকার একেশ্বরবাদ। ইহলোকের কৃতকর্মানুসারে পরলোকে শাস্তি ও পুরস্কার নির্দ্ধারিত হবে। এজন্য ধর্মশীল হয়ে জীবন যাপনের শিক্ষা জনমানসে প্রচারিত হত। সাবেয়ীনগণ এক আল্লাহ্‌র আরাধনা করত এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস ভক্তি ও ভীতি ছিল তাদের ধর্মের মূলকথা। আকাশের নক্ষত্ররাজিকে তারা বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী স্বর্গীয় শক্তি বলে মনে করত। তবে দেবতাজ্ঞানে তারা নক্ষত্ররাজিকে পূজা করত না। তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল যে আত্মার সত্তায় যেমন মনুষ্যদেহ অনুপ্রাণিত হয়ে জীবরূপ ধারণ করে তেমনি স্বর্গীয় সত্তা বা প্রাণী সকলের সমাবেশে মহাশূন্যের গ্রহমণ্ডল সক্রিয় হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবাহী হয়ে স্ব স্ব সীমাবদ্ধ অক্ষে অহরহ বিচরণ করছে। ঐ সকল গ্রহগুলির প্রতিফলক চিত্রে আল্লাহ্‌কে দেখার প্রয়াসও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সাবেয়ীনরা পবিত্র কাআবামুখী হয়ে প্রতিদিন তিনবার আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়ত। সূর্যোদয়ের আধ ঘন্টা পূর্বে দ্বিপ্রহরে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—দিন রাত্রির এই তিনটি সময় তারা সালাত পড়ত। এছাড়া তারা বছরের তিনটি সময় সিয়াম বা রোজা ব্রত পালন করত। প্রথমবার ৩০ দিন দ্বিতীয়বার ৯ দিন তৃতীয়বার ৭ দিন।

কালক্রমে নানা কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করতে করতে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকে তাদের একাংশ আল্লাহ্‌র শক্তি গণ্য করে পূজা করতে শুরু করে দেয়।

এদেরই একটি গোষ্ঠী কাঠ ও পাথরে সাতটি গ্রহের মূর্তি খোদাই করে সাতটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে এমন কল্পনা করত যে যেন ঐ সকল মূর্তিতে আল্লাহ্‌র শক্তি বিদ্যমান আছে আর এই কল্পনা থেকেই পূজা করত। এরাই মেসোপটেমিয়ার 'হারান' নগরের মন্দিরে একত্রিত হয়ে হজ্জ সমাধা করত। কাআবাঘরকেও তীর্থস্থান বলে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করত। উভয় তীর্থস্থানে পশুবলিদানকে পুণ্য কাজ গণ্য করা হত।

অনেক ঐতিহাসিকদের মতে সাবেয়ীন ধর্ম প্রচারক সামারি জাতি। এই ধর্ম আরবে ঐ জাতীয় লোক দ্বারা প্রচার লাভ করে। আরবগণ সামারিয়ানদেরও ধর্মগুরুর মতই সম্মান দেখাত। এরা হযরত শীশ ও ইদ্রিসকে পয়গম্বর বলে মানত এবং এই ধর্মকে তাঁদেরই প্রচারিত ধর্ম বলে বিশ্বাস করত। এদের কাছে সহিফা নামের ধর্মগ্রন্থও ছিল। সাবেয়ীনদের এই গোষ্ঠী একমাস রোজা রাখত এবং মৃতের কল্যাণ প্রার্থনার জন্য জানাযার নামায পড়ত।

হযরত ইব্রাহীম সহ বিভিন্ন পয়গম্বরের ধর্ম ঃ

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করার পূর্বে সমগ্র আরবে ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ধর্মের পূর্ব প্রচারক পয়গম্বরদের ধর্মও প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাইল ও হযরত সোয়ায়েব আঃ-এর ধর্ম। এরা সকলেই হযরত মুসা আঃ-এর পূর্ববর্তী যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরা সকলেই নিরাকার এক আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম সমর্পণের দ্বারা উপাসনা করার বিধান চালু করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইলের সময় কাআবা ঘরে নিরাকার আল্লাহ্‌র আরাধনা ও তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণের নিয়ম ছিল। এই প্রদক্ষিণের সময় উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম করা ও কাআবা ঘরের দেওয়াল চুম্বনের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

এসকল নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রথার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নানা সংস্কার যুক্ত হতে হতে একসময় কুসংস্কার যুক্ত স্থুল চিন্তা প্রাধান্য পায় এবং মূর্তি পূজা শুরু হয়। কিন্তু তখনও অনেকেই এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করতেন এবং পূর্তি জার বিরোধী ছিলেন। এদের মধ্যে হিনজিলা এবনে সাফুয়ান,

খালিদ ইবনে সানান, আসাদ আবু কার্ব, কয়েস বিন সায়দাহর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরতের পিতামহ আব্দুল মোত্তালেবও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

তবে ক্রমান্বয়ে নিরাকার একেশ্বরবাদীদের আরাধনা লুপ্ত হতে থাকে এবং মূর্তি উপাসকদের প্রতিপত্তির কাছে তা ম্লান হতে হতে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। সমগ্র দেশে মূর্তিপূজার ও উচ্ছৃঙ্খল ধর্মাচরণের সামনে একেশ্বরবাদীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে একদা হযরত ইব্রাহীমই তার পিতৃ ধর্মের প্রতিমাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে নিরাকার একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। আবার তাঁরই বংশে হযরত মোহাম্মাদ সাঃ আরবের প্রতিমা পূজা প্রথা নির্মূল করে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রার্থনা প্রচলন করে সমগ্র দেশ তথা বিশ্বকে কুসংস্কার মুক্ত করেন।

জিহোবা বা ইহুদী ধর্ম ঃ

হযরত মুসা (মোজেস) প্রবর্তিত এই ধর্মও নিরাকার একেশ্বরবাদ আরাধনার পবিত্র ধর্ম। হযরত ঈসা বা যীশুর জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে পৌত্তলিক রোমকগণ ও সম্রাট বক্তনসর (নেবুকাডনেজার) নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করে। এরা আরবের উত্তর প্রান্তে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে ঐ সকল অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর নিজেদের ধর্মের প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া ইতিপূর্বে আরবদের অনেকের কাছেই জিহোবা ধর্ম পরিজ্ঞাত ছিল। এই ধর্মের মূল সূত্রে বিশ্বাসীগণ হযরত মুসা ও হযরত দায়ুদকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করত। তাওরাত ও যুবুরকে ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচনা করত।

কিন্তু পরিশেষে এই ধর্ম ক্রমান্বয়ে বিকৃত হয়ে এক কদর্যরূপ ধারণ করে। ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও যুবুরের মুল অংশগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সকল ধর্মগ্রন্থের যে সকল অংশ লোক পরম্পরায় মানুষের মুখস্থ ছিল তার সঙ্গে স্বার্থান্বেষী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের নিজস্ব কল্পনাগুলি যুক্ত হয়ে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে যায়। আর সেই থেকে আজও ঐ ধর্মের বিকৃত রূপই ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং বর্তমানে ঐ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীগণ আর ইসলাম ধর্মের অনুসারী নেই, তাঁরা বিকৃত পন্থায় ইহুদীধর্মের অনুসারী হিসাবেই বিশ্ব মুসলিমের নিকট পরিগণিত হচ্ছেন।

ঈশায়ী ও খ্রীষ্টধর্ম ঃ

খ্রীষ্টধর্মও নিরাকার একেশ্বরবাদের ধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক ইমরান কন্যা বিবি মরিয়মের পুত্র হযরত ঈশা। হযরত মোহাম্মাদ সাঃ-এর পূর্বে এই ধর্ম আরব দেশে প্রচারিত হয়েছিল। খোদ সেন্ট পল গ্যালেসিয়গণকে পত্র লিখেছিলেন—'পৌত্তলিকগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য সম্প্রতি আহূত হয়েছি। এই কাজ শেষে আমি আরব দেশে যাব।'

আরব দেশ চিরকালই স্বাধীন ধর্মাচরণ ক্ষেত্র ছিল। এদেশের অধিবাসীগণ প্রাচীন কাল থেকেই উদারচেতা স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত ব্যক্তিগণ আরব দেশে গিয়ে বসতি গড়ত। জ্যাকোবাইট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণও এই ভাবে স্বাধীন আরব দেশে এসে বসতি গড়ে তোলে। হিমিয়ার, ঘাসসান, রাবিয়া, তাঘলাব, বাহরু, তনুচ, কোফিয়া সম্প্রদায়ের এক অংশ, নাজরানের অধিবাসীগণ, ও হিরা প্রদেশের আরবজাতি সর্বাগ্রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই সকল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাই খানা-এ কাআবায় হযরত মরিয়ম ও ঈশার প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কাআবা গৃহে বিশ্বের একেশ্বরবাদীদের সকলেরই প্রবেশাধিকার সর্বযুগে ছিল। কালক্রমে ঐ সকল একেশ্বরবাদীগণই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে স্ব স্ব গোষ্ঠীর মূর্তি ঐ এলাকাতেই প্রতিষ্ঠা করে পূজা প্রথা প্রচলন করেছিলেন। সর্বশেষ ইসলামের সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই সকল কুসংস্কার ও মূর্তি পূজার প্রচলনকে উৎখাত করে এক ন্যায়নিষ্ঠ কুসংস্কার মুক্ত নির্মল পবিত্র নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র খানা-এ কাআবাকে সৃষ্টির আদি মানব হযরত আদমের মূল ধর্মীয় আদর্শের মর্মমূলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মুসলিম-এর পরিপূর্ণ অধিকার ভুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদ আরাধনার পীঠস্থান করে গেছেন।

ম্যাগিয়ান বা অগ্নি উপাসক ঃ

ম্যাগিয়ান ধর্মাবলাম্বীগণ গুইবার্গ নামে খ্যাত। এই সম্প্রদায় অগ্নির উপাসনা করে থাকেন। পারস্যদেশে এই ধর্ম প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। আরবের নিকটস্থ হওয়ায় আরবদের সঙ্গে এই পারসিকদের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। তারই ফলস্বরূপ আরবের কোন কোন গোষ্ঠী একেশ্বরবাদ ভুলে

অগ্নি উপাসনার ধর্ম পালনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ তাসন জাতি এবং পারস্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আরবগণের মধ্যে অগ্নি উপাসনার ধর্ম প্রচলিত হয়েছিল। এই ধর্ম প্রচলিত হওয়ার পর মহাত্মা জোরেস্তা বা জরথুষ্ট্র জেন্দাবস্তা বা আবেস্তা নামক এক বৃহদাকার ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমে এই গ্রন্থের শ্লোক সাধারণের মুখে মুখে শ্রুতিগোচর হত, পরে লিখিত গ্রন্থ আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ধর্মের মূল মন্ত্রগুলি অধ্যাত্মভাবাপন্ন। আল্লাহ্ জ্যোতির স্রষ্টা এবং শয়তান অন্ধকারের স্রষ্টা। ম্যাগিয়ানগণের কোন মন্দির বা বেদি কিম্বা অন্য কোন প্রকার বাহ্যরূপ ছিল না। তারা সূর্যকে লক্ষ্য করে যাবতীয় উপাসনা করতেন। সূর্যের অভাব হলে পর্বতে আগুন জ্বেলে আলোর অভাব পূরণের আয়োজন করতেন। জোরেস্তা প্রথমে মন্দিরে প্রার্থনা প্রথা প্রচলন করেন এবং মন্দিরে হোমাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন করেন। পুরোহিতগণ আজীবন ঐ আগুন জ্বেলে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

কালক্রমে সেবিয়ানদের মত ম্যাগিয়ানগণও ধর্মের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে যায়। ইতিপূর্বে যারা একমাত্র আল্লাহ্‌কেই বিশ্ব জগতের মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক জ্ঞানে আরাধনা করত তারা ক্রমান্বয়ে অগ্নি আলোককেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করে দিল। পরিশেষে এই ধর্মের বিরোধীদের নাস্তিক আখ্যা দিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হত না।

মোহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে আরব জাতির মধ্য থেকে এই সকল কুসংস্কার সম্পূর্ণ দূর করে হযরত আদম প্রতিষ্ঠিত ইসলামধর্মের মূল আদর্শকে পুনঃ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব সভ্যতার অবক্ষয় রোধ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে আদি মানবধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে সাম্য ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে পৌত্তলিকতা মুক্ত এক পবিত্র আলোকে মুসলমান সম্প্রদায়কে উন্নত জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন।

সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল আরবভূমির মক্কা নগরে যুগে যুগে এমনি কতশত উত্থান পতনের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। সেই পবিত্র ভূমিতে পা রেখে এগিয়ে চলেছে লক্ষ মানুষের মিছিল। সে মিছিলের যাত্রী আপনিও। একি কম সৌভাগ্যের! আসুন এবার আমরা মক্কা শহরে পৌঁছে করণীয় কর্তব্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মক্কা শরীফ পৌঁছে করণীয়

মক্কাশরীফ পৌঁছে মোয়াসসেসার অফিসে জিনিষপত্র রেখে ওজু গোসল করে পবিত্র হয়ে ওমরাহর তাওয়াফ ও বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে। মোয়াসসেসার মদির (সেক্রেটারী) এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তাঁরা প্রত্যেক গ্রুপের সঙ্গে একজন লোক দেবেন। প্রথম তাওয়াফে এঁদের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়। কারণ তাওয়াফের শুদ্ধ ও সঠিক পদ্ধতি এঁদের জানা আছে। তাছাড়া প্রথম তাওয়াফ হিসাবে প্রথমবারের হজযাত্রীদের নানা ধরনের ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এমনকি যথেষ্ট

হেরেম শরীফের আশপাশের বর্তমান রাস্তা ঘাটের নকশা

জ্ঞানসম্পন্ন লোকজনেরও ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। সেজন্য মোয়াসসেসার অভিজ্ঞ লোকজনের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়। তাওয়াফ, সায়ী ইত্যাদির
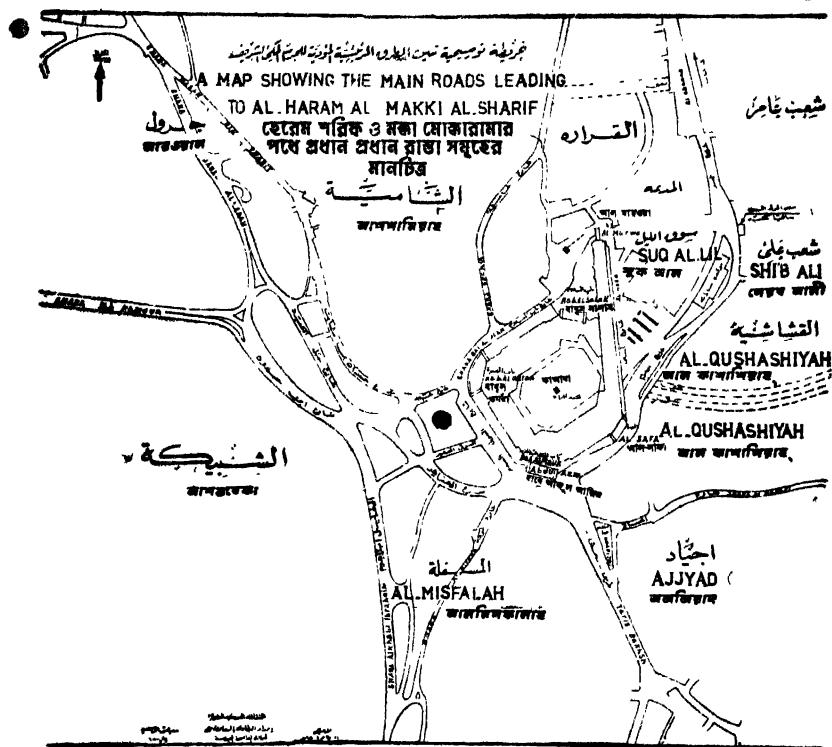
প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে মযহাবের পার্থক্যের জন্য অনেক কিছু পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। তাই নিজ নিজ মযহাবভুক্ত আলেমগণের কাছ থেকে বিশেষ-ভাবে নিয়মকানুন জেনে নেওয়া কর্তব্য।

তাওয়াফের প্রস্তুতি প্রকার নিয়ত ইত্যাদি বর্ণনার আগেই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া ভাল। বিষয়টি হল মক্কাশরীফে থাকার জন্য কিভাবে ও কি ধরণের ঘর সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য তাওয়াফ এবং সায়ী শেষ করে একাজ করতে হবে।

ঘরের সন্ধান ও ভাড়া করা ঃ

আল্লাহ্‌র ঘর কাআবা শরীফ তাওয়াফ ও সায়ীর (সাফা মারওয়া দৌড়) কাজ শেষ করে মোয়াসসেসা অফিসে ফিরে এহরামের কাপড় বদলে সাধারণ জামা কাপড় পরে নিতে হবে। এখন মক্কা শরীফ পৌঁছে এহরামের কাজ শেষ হয়েছে। এবার প্রথমেই বাসস্থানের সন্ধান করতে হবে। মক্কা শরীফে সবরকমের ঘর পাওয়া যায়। কোনভাবে কোন দালাল বা অন্য কোন লোকের উপর নির্ভর না করে সহযাত্রীদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটা ঘর পছন্দ করতে হবে। ঘর হেরেম শরীফের যত নিকটবর্তী হবে সকল কাজে ততই সুবিধা হবে। প্রত্যেক জামাআতে নামায পড়া সহজ হবে। ঘরের জন্য মিসফালা, জিয়াদ, জাবালে হিন্দ ও হারাতুল বাব ইত্যাদি আশপাশের মহল্লায় সন্ধান করতে হবে। অনেক বাংলাদেশ ও পাকিস্থানের বাসিন্দা তাঁদের ঘর এই সময়ের জন্য ভাড়া দেন। ঘর ভাড়া করার সময় কোন রকম অস্থির না হয়ে ভাল করে ধৈর্য সহকারে ঘরের সব ব্যবস্থা দেখে নিতে হবে এবং সরকারের কাছ থেকে সেই ঘরে হাজি রাখার অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা জেনে নিতে হবে। সর্বক্ষণ পানি থাকবে কিনা, পানি শেষ হয়ে গেলে পানির ব্যবস্থা গৃহকর্তা করবেন কিনা এসব নিখুঁতভাবে জানতে হবে। থাকার সময় সীমার বিষয় বলে নিতে হবে। কারণ বহু ঘর আছে যেগুলি ঐ গৃহকর্তা কোন সৌদি মালিকের কাছ থেকে এক বছরের চুক্তিতে নিয়েছেন। তেমন হলে মূল মালিক মহরম মাসের এক তারিখেই ঐ ঘর থেকে সবকিছু বের করে দেবেন। ঐ দেশের আইন এবং নিয়ম তাই।

তাই ঘর ভাড়া করার সময় এসব বিষয় কথা বলে নিতে হবে। নইলে

হজ শেষ হওয়ার পর যদি কোন ভাবে ফিরতে দেরী হয় বা মহররমের পরও থাকার প্রয়োজন বা ইচ্ছা হয় সে ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে।

এরপর ঘরের ভাড়ার বিষয় যথেষ্ট দাম দস্তুর করতে হবে। ঘর এয়ার কাণ্ডিশন কিনা জানতে হবে। যদি এয়ার কাণ্ডিশন না হয় তাহলে ঐ ঘরে বসবাস খুবই কষ্টকর হবে। এয়ার কাণ্ডিশন ছাড়া ঘরে রাতে ঘুমান বেশ অসুবিধাজনক হয়। তাই একটু বেশী ভাড়া দিয়ে বা একটু দূর হলেও এয়ার কাণ্ডিশন ঘর ছাড়া কোনভাবেই ভাড়া করা উচিৎ নয়। আরও জানতে হবে ঘরে ফ্রিজ বা পানি ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে কিনা। মনে রাখতে হবে ঐ দেশে পানি সরাসরি পান করা সম্ভব নয়। ফ্রিজ না থাকলে তা সব সময়ই গরম হয়ে থাকে। ফলে ফ্রিজ বা পানি ঠাণ্ডার ব্যবস্থা না থাকলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশ থেকে কুলিদের[১] যে সকল লোক মক্কায় যান তাঁরা ঘর ভাড়ার জন্য সাহায্য করেন, তবে তাঁদের সঙ্গে থেকে নিজেরা ঘরের সব ব্যবস্থা ও ভাড়ার বিষয় কথা বলে না নিলে ঠকতে হবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিতও হতে হয়। যেহেতু মক্কা শরীফে প্রথম পদার্পণ সেহেতু এই অজানা জায়গায় কিছুটা পরনির্ভর না হয়ে উপায় থাকে না। মক্কা শরীফে ভারত সরকারের যে হজ অফিস আছে তাঁরা ঘর ভাড়া করার বিষয়ে কোন সাহায্যই করেন না বরং তাদের মধ্যে অসহযোগিতার মানসিকতা দেখা যায়। বিশেষতঃ ভারত সরকারের হজ অফিসে কোন বাঙ্গালী অফিসার নিয়োগ না করায় খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। পশ্চিমবঙ্গের হাজিদের প্রায়শঃই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভোগ করতে হয়। সুতরাং, এখান থেকে এব্যাপারে সাহায্যের কোন সুযোগ নেই।

মোয়াসসেসার অফিসে পৌঁছুলে তাদের নির্দ্ধারিত ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য মোয়াসসেসা কর্তৃপক্ষ চাপ সৃষ্টি করেন। এঁদের ঘরও দেখা যেতে পারে। এখানেও পূর্বে বর্ণিত সব বিষয়গুলি নিজেকে দেখে নিতে হবে এবং যথেষ্ট দরদাম করে ভাড়া ঠিক করতে হবে। এঁরা সাধারণতঃ একটু বেশী ভাড়া

১. কুলি বলতে কিন্তু আমাদের দেশের মাল বওয়া কুলি নয়। এঁরা অনেকে লক্ষপতি লোক। এঁরা হজ কমিটির রেজিস্ট্রীভুক্ত ব্যক্তি। এঁরা হজ যাত্রীদের মাধ্যমে নানা ধরণের ব্যবসা করে থাকেন। এদের কাজ জাহাজে হাজিদের মাল ওঠান নামান বা অন্যান্য কাজে সাহায্য করা কিন্তু এরা একাজ ছাড়াও হাজিদের মাধ্যমে সৌদি আরব থেকে নানা রকম দ্রব্য সামগ্রী আনার কাজে যুক্ত।

আদায়ের চেষ্টা করেন। তবে এঁদের ঘর ভাড়া নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যদি তেমন আচরণ করেন বা ওঁদেরই ঘর বেশী ভাড়ায় নিতে বাধ্য করতে চান তাহলে ভারতীয় এমব্যাসী তথা হজ অফিসে গিয়ে জানিয়ে প্রতিকার করার জন্য বলতে হবে এবং হজ অফিস কিছু করতে না চাইলে (যদিও তাঁদেরই করণীয়) নিজেরা উদ্যোগী হয়ে হেরেম শরীফের আশপাশে বহু জায়গায় সৌদি সরকারের হজ ও আওকাত দফতর আছে সেখানে ঐ মোয়াসসেসার বিষয় জানালে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার হবে। কারণ এ বিষয়ে বাধ্য করার কোন নিয়ম নেই। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ঘর ভাড়া করার অধিকারী। তবে বাইরে ঘর দেখে এসে যদি এঁদের ঘরই সুবিধাজনক মনে হয় তাহলে তা নেওয়া ভাল। মনে রাখতে হবে মক্কা শরীফ পৌঁছে বাসস্থানের ব্যবস্থা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ না বাসস্থান ঠিক হয় ততক্ষণ জিনিসপত্র মোয়াসসেসার অফিসে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

বাইরে কোন ঘর ঠিক করলে কার ঘর, কোন্ এলাকা, ঐ ঘরে হাজি রাখার সরকারি অনুমোদন আছে কিনা তা মোয়াসসেসার অফিসে জানতে হবে। সুতরাং ঘর ভাড়া করার সময়ে বলে নিতে হবে যে এ বিষয়ে গৃহকর্তার লোক সঙ্গে গিয়ে মোয়াসসেসা যে যে তথ্য চান তা পূরণ করে দিয়ে আসবেন। এসব দেখে নিয়ে ঘর ভাড়া করে জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়। এবার নিশ্চিন্তে আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হেরেম শরীফের জামাআতে আদায় করা, নিয়মিত কোরআন তেলওয়াত করা আর হজের দিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোন কাজ নেই।

স্মরণ রাখতে হবে কেবলমাত্র এই কাজগুলি করার জন্যই সেই সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে আসা। সর্বক্ষণ বায়তুল্লাহ্‌ দর্শন করে সার্থক করতে হবে নিজেকে। সব সময় বিনম্র আচরণ, অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, চলাফেরা কথাবার্তায় ইসলামের আদর্শের কথা স্মরণ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি অলিগলিতে, আকাশে বাতাসে রয়েছে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নবীর স্পর্শ। প্রিয় নবী হযরতের পবিত্র স্পর্শে পূত: ধন্য এখানকার ইঁট, কাঠ, পাথর, আলো, হাওয়া। কোন বেআদবি না হয়, কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায়, সর্বোপরি নিজের উদ্দেশ্য আত্মত্যাগের আদর্শ যেন ব্যর্থ না হয় নিজেরই আচরণে সে বিষয় সদা সতর্ক থাকতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাওয়াফের প্রস্তুতি ও প্রকার

ওজু, গোসল করে পবিত্র হয়ে ধীর পদক্ষেপে একাগ্র চিত্তে লাব্বায়েক পড়তে পড়তে হেরেম শরীফের দিকে রওয়ানা হতে হবে। মসজিদে হেরেমকে হেরেম শরীফ বলা হয়। হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় হেরেম শরীফের উত্তর দিকে বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব। মসজিদের সীমানায় পৌঁছে ভক্তি ও নম্রতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ঘরের ধ্যান করতে করতে ডান পা আগে ফেলে ভক্তিভরে একাগ্রতা সহকারে পড়তে হবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جَمِيْعَ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ ـ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

উচ্চারণ : (আউযোবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহে ওয়ালহামদো লিল্লাহে ওয়াস্ স্বালাতো ওয়াস সালামো আলা রাসুলিল্লাহ্‌। আল্লাহুম্মাগফেরলী জামিয়া জনুবী-ওয়াফতাহলানা আবওয়াবা রাহমাতেকা। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামো ওয়া মিনকাস সালাম ওয়া এলাইকা ইয়ারজেউস সালাম ফাহাইয়্যেনা রাব্বানা বিস সালামা। ওয়াদখেলনা বে-রাহমাতেকা দারাস্‌সালাম তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।)

বাংলায় : আমি আল্লাহ্‌র কাছে শয়তানের ধোঁকা থেকে আশ্রয় চাইছি। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ্ ! আমার সমস্ত পাপরাশি মার্জনা করে দাও। হে আল্লাহ্ তুমি শান্তিময় শান্তিদাতা। আমাদের শান্তিতে জীবিত থাকতে দাও এবং তোমার রহমতের দ্বারা আমাকে সর্বোন্নত শান্তিময় বেহেশতে প্রবেশ করিও। ওগো আমার প্রতিপালক, হে সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ দাতা তুমি আমাকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করেছ।

মসজিদে হেরেমে প্রবেশ করলেই বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পাওয়া যাবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র গৌরব ধ্যান করতে করতে ভক্তিপূর্ণ তৃষ্ণার্ত নয়নে পবিত্র ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে নীচের দোওয়া পড়তে হবে। এটি প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার একটি উৎকৃষ্ট সময় ও স্থান।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মুসলমান কাআবাঘর দর্শন করা মাত্রই আসমানের দরওয়াজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই সময় আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে যে কোন দোওয়া চাইলে (প্রার্থনা করলে) তা কবুল (মঞ্জুর) হয়ে থাকে। প্রথমে তিন বার,

"লা ইলাহ ইল্লাল্লাহো আল্লাহ্ আকবার"

বাংলায় : "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান"। তারপর একাগ্র চিত্তে পড়তে হবে :

আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা হারামোকা ওয়া হারামো রাসূলেকা, ফা হাররেম লাহমী ওয়া দামী ওয়া আযমী আলান্নারে।

বাংলায় : ওগো আল্লাহ্। এই তো তোমার এবং তোমার রাসূলের হেরেম, আমার মাংস, রক্ত ও হাড়কে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও !

এবার হৃদয়ের আকুতি দিয়ে এইভাবে দোওয়া করা উত্তম :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ. اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مِنْ حَجِّهِ بِرًّا وَكَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ وَاَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহ আকবার। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামো ওয়া মিনকাস সালাম ওয়া দারোকা দারুস সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালালে ওয়া-ল একরাম। আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা বায়তোকা আজ্জামতোহু, ওয়া-কাররামতোহু ওয়া শারেফতোহু। আল্লাহুম্মা ফাযেদহু তাআজ্জীমান ওয়াযেদহু মোহাবাতান ওয়াজেদহু মীন হাজ্জেহী বেররান ওয়া কারামাতান। আল্লাহুম মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা ওয়া-আদখেলনী-জান্নাতাকা— ওয়া-আয়েযনী মিনাশ শায়তানির রাজিম।

বাংলায়ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ইসর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্, তোমাতেই শান্তি এবং তোমা থেকেই শান্তি আর তোমার ঘরই শান্তিনিকেতন, হে মহান, হে সম্মানিত তুমি করুণার আধার (রহমত), হে আল্লাহ্ এটা তোমারই ঘর, তুমি একে গৌরবময় ও সম্মানিত করেছ একে মাহাত্ম্য দিয়েছ। এর সম্মান বৃদ্ধি কর এবং এর মাহাত্ম্য ও গৌরব বৃদ্ধি কর। আমাতে এর ভয় বৃদ্ধি কর। যে ব্যক্তি এই ঘরে হজ করেছে তার জন্যও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ্ তোমার রহমতের দুয়ার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও, তোমার জান্নাতে আমাকে প্রবেশ করিও এবং বিতাড়িত শয়তানের ক্ষতি থেকে আমাকে আশ্রয় দাও। আমীন"।

এই প্রার্থনা শেষ করে তাওয়াফ করার জন্য ধীর পদক্ষেপে বিনম্র চিত্তে অগ্রসর হতে হবে। এই সময় হেরেম শরীফে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তাই সঙ্গী-সাথীরা অস্থির হয়ে পড়েন। বেশীর ভাগ লোকই সাথীহারানর ভয়ে

আকুলি-বিকুলি করে থাকেন। এ বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে থাকবেন। হেরেম শরীফে প্রবেশের পূর্বেই নিজেরা আলোচনা করে স্থির করে নিতে হবে যদি দলছুট হয়ে সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তা হলে করণীয় কি হবে। যদিও এটা বিধান নয় তবু এই বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি এখানে একটি ব্যবস্থা নেওয়ার উল্লেখ করলাম।

প্রথমেই ঠিক করে নেবেন যে যদি কেউ দলছুট হয়ে যান তাতে অস্থির না হয়ে ধীর স্থির ভাবে নিজের কর্তব্য কাজ তাওয়াফ সায়ী শেষ করে বাবে আব্দুল আজীজ বা বাবে উমরায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই এই দুটি দরজা সহজে দেখিয়ে দেবেন। এবারে প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে মিলিত হয়ে তবে মোয়াসেসার অফিসে বা বাসায় ফিরে যাবেন। কারণ এই সময় দলছুট হলে খুবই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, প্রত্যেক সঙ্গীকেই ধৈর্য সহকারে একাজ করতে হবে। সকলে একত্র হয়ে বনিশায়েবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম। বনিশায়েবার দরজা হচ্ছে যমযমকূপ এবং মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যস্থলে আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মুখে অবস্থিত। এই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পড়তে হবে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

বিসমিল্লাহে আবিল্লাহে ওয়া-মেনাল্লাহে, ওয়া-এলাল্লাহে ওয়া-ফি সাবীলিল্লাহ ওয়া-আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহে।

বাংলায় : "আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে, আল্লাহ্‌র থেকে, আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র পথে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের ধর্মের উপর শুরু করছি।"

এর পর অবনতমস্তকে এগিয়ে চলতে চলতে পবিত্র কাআবা ঘরের কাছা-কাছি পৌছানর চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে অসম্ভব ভিড়ের ভিতর থেকেই এগিয়ে যেতে হবে। পরস্পরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বারে বারে একে অপরের খোঁজ করার জন্য যেন অস্থির হতে না হয়। যতদূর সম্ভব কাআবা ঘরের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু একেবারে অচেনা অজানা বিষয় বলে ভিড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিশুদ্ধ অন্তরে পড়তে হবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْ اَصْطَفٰى . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُوْلِكَ •

আলহামদো লিল্লাহে ওয়াস্-সালামো আলা এবাদেহীল্লাযী আস্তাফা। আল্লাহুম্মা স্বাল্লে আলা মোহাম্মাদিন আবদেকা ওয়া-রাসূলেকা ওয়া-আলা ইব্রাহীমা খালিলেকা ওয়া-আলা জামিয়ে আমবিয়ায়েকা ওয়া-রাসূলেকা।

বাংলায় : "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র পছন্দসই বান্দাদের প্রতি সালাম। ওগো আল্লাহ্! তোমার বান্দা (দাস) এবং তোমার রাসূলের (হযরত মোহাম্মাদ সা:) প্রতি সালাম এবং তোমার বন্ধু ইব্রাহীম এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণের উপর দরূদ পৌঁছে দাও"।

এর পর দু-হাত উঠিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতে হবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ اَوَّلِ مَنَاسِكِيْ اَنْ تَتَقَبَّلَ تَوْبَتِيْ وَاَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيْئَتِيْ وَتَضَعَ عَنِّيْ وِزْرِيْ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَلَّغَنِيْ بَيْتَ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلَهٗ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَجَعَلَهٗ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُكَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ مِنْ عُقُوْبَتِكَ الرَّاجِيْ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرْضَاتِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলোকা ফি মাকামী হাযা ফী আওয়ালে মানাসেকী আন নাতাকাব্বালা তাওবাতী ওয়া-আন নাতাজাওয়াযা আন খাত্বীয়াতী ওয়া-তাজাআ আন্নী বেজরী। আলহামদো লিল্লাহীল লাযী

বাল্লাগানী বায়তাল হারামিল লাযী জায়ালাহু মাসাবাতান লিন্নাসে ওয়া-আমনান, ওয়া-জাআলাহু মোবারাকাওঁ ওয়া হোদাল লীল আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আবদোকা ওয়ালবালাদো বালাদোকা-ওয়ালহারামো হারামোকা ওয়ালবায়তো বায়তোকা জেয়তোকা যাত্বলোবো রাহমাতাকা ওয়াসয়ালোকা মাসয়ালা-তাল মোজত্বারিরল খায়েফে মিন অকুবাতেকার রাজেয়ে লে রাহমাতেকা ত্বালেবে মারদাতেকা।

বাংলায়ঃ "ওগো আল্লাহ্! এখানে আমার প্রথম অনুষ্ঠানে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার তওবা কবুল করে নাও, আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, আমার বোঝা হাল্কা করে দাও। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি একে মানুষের জন্য আশ্রয় স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছেন, বরকতময় করেছেন এবং সমস্ত জগতের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। হে আল্লাহ্ আমি তোমার বান্দা, এই শহর তোমার শহর, এই হেরেম তোমার হেরেম, এই ঘর তোমার ঘর, তোমার দরবারে হাজির হয়েছি প্রভু। আমি তোমার করুণাপ্রার্থী দুঃখিতের আকুতি জানাই তোমার কাছে তোমার রহমতের আশায়, শাস্তি হতে ক্ষমা চাই, তোমার সন্তুষ্টি চাই"। আমীন

বর্তমানে তাওয়াফ শুরু করার জন্য অতি সুন্দরভাবে স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। পবিত্র কাআবা ঘরের প্রত্যেক কোণকে রোকন বলে। কাআবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কোণে হজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর লাগান আছে। তার সোজা পায়ের দিকে চাইলে দেখা যাবে কাল পাথর দিয়ে লাইন টানার মত করে বরাবর চিহ্নিত করা আছে। তা ছাড়াও হেরেমের মসজিদের দেওয়ালে নীল আলো জ্বালিয়ে রাখা হয় যাতে নবাগতদের বুঝতে সুবিধা হয়। পবিত্র বায়তুল্লাহ থেকে চারপাশে তাওয়াফের জন্য বিরাট শ্বেত পাথর বাঁধান চত্বর আছে এর উপর থেকে তাওয়াফ করতে হবে। এই জায়গাটি কাআবা ঘর থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৬০ ফুট, পশ্চিম দিকে ৩৮ফুট, উত্তর দিকে ৭২ ফুট এবং দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭১ ফুট। এমনভাবে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া আছে যাতে রাত্রেও দিনের মতই আলোকিত থাকে। এখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। কিন্তু যদি ফরজ নামাযের সময় হয়ে থাকে এবং জামাত হতে থাকে তাহলে আগে জামাতে নামায আদায় করে তারপর তাওয়াফ শুরু করতে হবে। এবার কাআবার দক্ষিণ পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই কোণে কাআবা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে 'হজরুল আসওয়াদ' লাগান আছে। এই কোণ বরাবর মেঝেতে কালো চিহ্ন দেওয়া আছে। সেই

চিহ্ন সাধারণত: ভিড়ে ঢাকা পড়ে যায়। সহজে হাজরুল আসওয়াদের স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য নীল আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেই হাজরুল আসওয়াদের কোণে পৌঁছান সহজ হবে। এবার নিজের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে কালো দাগের সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে। তারপর এই দাগ বরাবর যথাসম্ভব এগিয়ে হাজরুল আসওয়াদের কাছে পৌঁছানর চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে একাজ করার প্রয়োজন নেই। সহজে পৌঁছান সম্ভব হলে মুখ লাগিয়ে কালো পাথরে চুম্বন করা আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাত বা হাতের ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করে তা চুম্বন করা এবং তাও সম্ভব না হলে দূর থেকে ঐ বরাবর দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে হস্তদ্বয় উপরে উঠিয়ে হস্ত তালুদ্বয়কে হজরুল আসওয়াদ বরাবর রেখে ইশারায় চুম্বন করে করতে হবে। কিন্তু ইশারা করা হাত চুম্বন করতে হবে না। হাজরুল আসওয়াদ চুম্বন বা ইশারার সময় পড়তে হবে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদো।)

বাংলায় : আল্লাহ্ মহান, প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

এবার হাজরুল আসওয়াদ পূর্বোল্লিখিত নিয়মে চুমা দিয়ে পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ اَمَانَتِىْ اَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِىْ وَفَّيْتُهُ وَاشْهَدْ لِىْ بِالْمُوَافَاةِ

(আল্লাহুম্মা আমানাতনী য়াদ্দায়তোহা ওয়া মিসাক্বী অফ্‌ফাইতাহু অ-আশহাদোলি বিল মোয়াক্‌ফাতে।)

বাংলায় : "হে আল্লাহ্! আমার আমানত আমি আদায় করেছি এবং আমার ওয়াদা আমি পূর্ণ করেছি। আমার হৃদয়ের পূর্ণতায় সাক্ষী হও"।

এই দোওয়া পড়ে তাওয়াফের যে কোন একটি নিয়ম অনুসারে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে।

তাওয়াফের নিয়ম বর্ণনার পূর্বে তাওয়াফের প্রকার, তাওয়াফের কর্তব্য কাজ, হজ-এর প্রকার অনুসারে তাওয়াফের নিয়ম, তাওয়াফ করার নিয়ম ও ও দোওয়া ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তাওয়াফের প্রকার ঃ

তাওয়াফ সাত প্রকার :

১। **তাওয়াফে কুদুম ঃ** এটাই প্রথম কাআবা শরীফ দর্শনের তাওয়াফ। এই তাওয়াফ মক্কা শরীফের বাইরের লোকের জন্য সুন্নত। এটা মক্কাবাসিদের জন্য নয়। যাঁরা তামাত্তো হজ বা কেবল মাত্র ওমরাহ্‌র নিয়ত করবেন, তাঁদের জন্য কেবল মাত্র ওমরাহ্‌র নিয়তে এই তাওয়াফ করলেই তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سبعةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ الْقُدُوْمِ سُنَّةَ الْحَجِّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্নী ওরিদুত ত্বাওয়াফা বায়তাকাল হারামে সাবআতা আশওয়াত্বিন ত্বাওয়াফাল কুদুমে সুন্নাতুল হাজ্জে ফাইয়াস্‌সিরহুলী ওয়া-তাকাব্বালহু মিন্নী)।

বাংলায় ঃ "হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার এই সম্মানিত গৃহের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে হজের সুন্নত—তাওয়াফে কুদুম আদায়ের সংকল্প করলাম। তুমি আমার জন্য একাজ সহজ করে দাও এবং আমার কাছে থেকে এই তাওয়াফকে গ্রহণ করে নাও।"

২। **তাওয়াফে যিয়ারাত ঃ** এই তাওয়াফ প্রত্যেক হাজির জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় এবং এটি হজের একটি রোকন। এই তাওয়াফ মীনার তাঁবু থেকে মক্কা শরীফ গিয়ে ১০, ১১ বা ১২ই যিলহজ্জ তারিখের মধ্যে আদায় করতে হয়। ১০ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় না করলে মাকরূহ হবে। এবং তা হলে দম (একটি দুম্বা কোরবানী) দেওয়া ওয়াজেব হবে। নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَرْضَ الْحَجِّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্নী ওরিদুত ত্বাওয়াফা বায়তাকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন, ত্বাওয়াফায্ যিয়ারাতে ফারজাল হাজ্জে ফাইয়াস্‌সেরহু-লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায় : "হে আল্লাহ্! আমি তোমার এই মহিমান্বিত ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে হজের ফরজ—তাওয়াফে যিয়ারাত আদায় করার নিয়ত করলাম। তুমি একাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার কাছ থেকে একে কবুল করে নাও।"

৩। তাওয়াফে বেদা : এই তাওয়াফকে বিদায়ী তাওয়াফ বলে। মক্কা শরীফের বাইরে হাজিদের মক্কা শরীফ ছেড়ে আসার পূর্বে এই তাওয়াফ করতে হয়। তাদের জন্য এই তাওয়াফ আদায় করা ওয়াজিব। নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ الْوِدَاعِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্না ওরিদুত্ ত্বাওয়াফা বায়তেকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন ত্বাওয়াফাল বেদায়ে ফাইয়াসসেরহু-লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায় : "হে আল্লাহ্! আমি তোমার এই মহিমান্বিত ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য একে সহজ করে দাও এবং একে আমার কাছ থেকে কবুল করে নাও।"

৪। তাওয়াফে ওমরাহ : ওমরাহ করার জন্য তাওয়াফ করার সময় নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ الْعُمْرَةِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্নী ওরিদুত ত্বাওয়াফা বায়তেকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন, ত্বাওয়াফাল ওমরাতে ফাইয়াসসেরহু-লী ওয়া-তাকাব্বালহু মিন্নী)।

বাংলায়ঃ "হে আল্লাহ্। আমি তোমার এই সম্মানিত ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফাল ওমরাহ, ওমরাহর তাওয়াফ আদায় করার নিয়ত করলাম। তুমি এটা (একাজ) আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার কাছ থেকে এটা কবুল করে নাও।"

৫। **তাওয়াফে নজরঃ** এই তাওয়াফ মানতের তাওয়াফ। মানত করলে এই তাওয়াফ আদায় করা ওয়াজেব। নিয়ত:

পূর্বের নিয়তের অনুরূপ কেবল মাত্র সাবআতা আশওয়াতিন শব্দের পর তাওয়াফান নাযরে শব্দ বলতে হবে।

বাংলায়ঃ তাওয়াফাল ওমরাহ এর বদলে তাওয়াফাল নাযরে বলতে হবে!

৬। **তাওয়াফে তাহিয়াতুল মসজিদঃ** মসজিদে হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করলেই এই তাওয়াফ আদায় করা মোস্তাহাব। তবে মসজিদে হেরেমে প্রবেশ করে অন্য কোন তাওয়াফ করলে আর এই তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। নিয়ত: একই প্রকার নিয়ত কেবল মাত্র সাবআতা আশওয়াতিন শব্দের পরে যে তাওয়াফের নাম আছে তার পরিবর্তে তাওয়াফাত্ তাহিয়াতাল মাসজেদ শব্দটি বলতে হবে।

৭। **তাওয়াফে নফলঃ** এই তাওয়াফের জন্য কোন সময় বা সংখ্যা নেই। যত ইচ্ছা এই তাওয়াফ করা শ্রেয়। মক্কা শরীফে অবস্থান কালে মক্কার বাইরের লোকেদের জন্য এই তাওয়াফ করা অতি উত্তম এবাদাত। নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ

فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্নী ওরিদো তাওয়াফা বায়তাকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন ফাইয়াসসেরহুলী ওয়া-তাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার এই মহিমান্বিত ঘরের চতুর্দিকে সাত চক্কর তাওয়াফ করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য একে সহজ করে দাও এবং আমার কাছ থেকে একে কবুল করে নাও।

রমল, এযতেবা ও সায়ী :

রমল : যে সকল তাওয়াফের পর সায়ী করতে হয় অর্থাৎ সকল ওমরাহ্‌র তাওয়াফের জন্য—তা সে কেরান হজ বা তামাত্তো হজের কিংবা ওমরাহ্‌র জন্য হোক না কেন—এবং এফরাদ ও কেরান হজকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করে তাহলে সেই তাওয়াফে কুদুমের মধ্যে আর যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করে তাহলে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হয়। অর্থাৎ প্রথম তিন চক্করে কাঁধ হেলিয়ে সজোরে বীরবিক্রমে ঘন ঘন পা ফেলে একটু দ্রুতগতিতে চলতে হবে। এই ভাবে কাঁধ হেলিয়ে দ্রুত পদে তাওয়াফকে রমল বলে।

এযতেবা : যে সকল তাওয়াফের পর সায়ী করতে হয় সেই সকল তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে এহরামের যে কাপড়টি চাদরের মত গায়ে দেওয়া আছে তার দুমুখ বাম কাঁধের উপর রেখে পিঠের দিক থেকে এনে মধ্যস্থলটি ডান বগলের নীচ দিয়ে চাদরের অপর মুখ বুকের উপর থেকে বাম কাঁধের উপর রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে এহরামের চাদর গায়ে দেওয়াকে এযতেবা বলে।

মাসায়েল বা জ্ঞাতব্য বিধান : (১) রমল ও এযতেবা পুরুষদের জন্য। স্ত্রীলোকদের রমল ও এযতেবা নেই। ঋতুবতী মহিলাদের বায়তুল্লাহ্‌ প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) নিষেধ।

(২) তাওয়াফ শেষে দুরাকাত ওয়াজেবুত্‌ তাওয়াফ নামায আদায় করতে হবে। এই সময় এহরামের চাদরে দুই কাঁধ ঢাকা দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে নামায আদায় করতে হবে। কিন্তু মাথা খোলা থাকবে। কাঁধ খুলে নামায আদায় করা মাকরূহ।

(৩) যিনি তামাত্তো হজের নিয়ত করেছেন তিনি তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় 'রমল' করবেন কিন্তু এযতেবা করতে হবেনা এবং তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে। আর যদি হজের আগেই একটি নফল তাওয়াফ করে তার পর সায়ী করা হয় এবং তার মধ্যে রমল ও এযতেবা করা হয় তবে তাঁকে তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় 'রমল' এযতেবা এবং সায়ী করতে হবেনা।

(৪) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চক্করে 'রমল' করতে হয়। যদি কেউ ১ম বা ২য় চক্করে ভুলে যান তবে কেবলমাত্র ২য় বা ৩য় চক্করে 'রমল' করতে

হবে। আর ১ম, ২য় ও ৩য় চক্করে ভুলে গেলে আর রমল করতে হবে না। কারণ প্রথম তিন চক্কর ছাড়া আর বাকী চক্করে রমল করা জায়েজ নয়। রমল করা সুন্নত। কেউ ভুলে গেলে দম দিতে হবে না।

সায়ী : মক্কা শরীফে খোদার ঘরের পূর্বদিকে সাফা এবং মারওয়া নামে দুটি পাহাড় আছে। 'সাফা' দক্ষিণ দিকে এবং 'মারওয়া' উত্তর দিকে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে বিবি হাজেরা রাঃ শিশুপুত্র ইসমাইলের জন্য পানির খোঁজে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। "হযরত ইসমাইল আলাইহেস-সালামের পেশানিতে (ঘামে) আমানত ছিল হযরত মোহাম্মাদ সালাল্লাহে আলাইহেসসালামের 'নূর' এবং হযরত মোহাম্মাদ সাঃ-এর নিকট ছিল একত্ববাদ ও সত্যধর্ম দ্বীন ইসলামের আমানত। সেই আমানতের জন্য বিবি হাজেরার মনে ছিল অদম্য সাহস এবং অগাধ আস্থা ও অপরিসীম খোদাপ্রেম। বিবি হাজেরার এই দৌড়াদৌড়ি আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় ও আল্লাহ্‌র বিশেষ পছন্দের ছিল। তাই সেই স্মৃতি রক্ষার্থে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সকল হাজি সাহেবের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা ওয়াজেব করে দিয়েছেন। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের দৌড়াদৌড়িকে 'সায়ী' বলা হয়। সায়ী শব্দের অর্থ হল দৌড়ানো ও হেঁটে চলার মধ্যবর্তী রকম চলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাওয়াফের মধ্যে কর্তব্য কাজ

ক. তাওয়াফের আটটি ওয়াজেব কাজ :

(১) তাওয়াফের নিয়ত করা (২) নামাযের প্রয়োজনের মত পাক হওয়া (৩) পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা (হাঁটতে না পারলে বা অক্ষম হলে অন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে) (৪) হজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করে ডান দিকে মোড় নিয়ে তাওয়াফ করা (৫) হাতিমের বাইরে থেকে তাওয়াফ করা (৬) সতর ঢাকা (৭) পূর্ণ সাত চক্কর তাওয়াফ করা (৮) সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করে দু'রাকাআত ওয়াজেবুত্‌ তাওয়াফ নামায পড়া।

খ. তাওয়াফকারীর জন্য পালনীয় সুন্নত ১০টি :

(১) হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। (২) যে সকল তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে সেই সেই তাওয়াফে এযতেবা করা। (৩) তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় তাকবিরে তাহরিমার মত দু হাত কান পর্যন্ত উঠান। (৪) তাওয়াফ শুরু করার সময় হজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা। (৫) প্রত্যেক তাওয়াফের পর হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। (৬) বিশ্রাম না করে সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করা। (৭) তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। (৮) অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা। (৯) সায়ী করতে যাওয়ার সময় হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। (১০) পরিহিত পোষাক পাক হওয়া।

গ. তাওয়াফকারীর জন্য সাতটি কাজ মুস্তাহাব :

(১) হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। (২) প্রত্যেক চক্করে নির্দিষ্ট দোওয়াগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়া। (৩) ওজু নষ্ট বা অন্য কোন কারণে একাদিক্রমে সাত চক্কর শেষ করতে না পারলে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করা। (৪) একাগ্র চিত্তে তাওয়াফ করা এবং তাওয়াফের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও ভক্তি হৃদয়ে অনুভব করা এবং তাওয়াফের মধ্যে কথাবার্তা না বলা। (৫) পুরুষদের কাআবা ঘরের কাছাকাছি এবং ভিড়ের দরুন স্ত্রীলোকদের দূরবর্তী জায়গা থেকে তাওয়াফ করা। (৬) প্রত্যেক চক্করে রোকনে ইয়ামেনীকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা কিন্তু হাত চুম্বন না করা। (৭) তাওয়াফের সময় কাআবা ঘরের গেলাফে পা না লাগা।

ঘ. তাওয়াফকারীর জন্য যে কাজগুলি মাকরূহ :

(১) তাওয়াফের সময় পার্থিব কথাবার্তা বলা এবং প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা বলা। (২) জামাআত বা খোতবা আরম্ভের সময় তাওয়াফ করা। (৩) প্রস্রাব পায়খানা চেপে রেখে তাওয়াফ করা। (৪) তাওয়াফ শেষে ওয়াজেবুত তাওয়াফ নামায না পড়ে পুনরায় তাওয়াফ আরম্ভ করা। (৫) সুযোগ থাকলেও হজরে আসওয়াদকে চুম্বন না করা। (৬) তাওয়াফের সময় ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কথা বলা। (৭) রমল ও এযতেবার ক্ষেত্রে তা না করা।

৬. তাওয়াফকারীর জন্য যা নিষিদ্ধ :

(১) বিনা কারণে কোন কিছুর উপর চড়ে বা লোকের কাঁধে চড়ে তাওয়াফ করা। (২) তাওয়াফের মধ্যে পানাহার করা। (৩) তাওয়াফের সময় হাতিমের মধ্যে দিয়ে যাওয়া।

নবম পরিচ্ছেদ

তিন প্রকার হজের তাওয়াফের নিয়ম ঃ

১. তামাত্তো হজ ঃ তামাত্তো হজের নিয়ত করলে মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমে রমল ও এযতেবার সঙ্গে ওমরাহ্‌র তাওয়াফ করতে হবে, এবং তাওয়াফ শেষ করেই সঙ্গে সঙ্গে 'সায়ী' করতে হবে। তারপর মাথা মুড়িয়ে বা চুল কেটে ছোট করে নিলে এহরাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এই কাজগুলি শেষ করলেই এহরামের কাপড় খুলে সাধারণ কাপড়, লুঙ্গী, পাজামা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি পরতে ও স্বাধীন ভাবে পানাহার করতে পারা যাবে। আবার ৮ই যিলহজ তারিখে যাবতীয় হাজামত কাজ শেষ করে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে হেরেমে বা হেরেমের সীমানার মধ্যবর্তী যে কোন জায়গায় হজের নিয়তে এহরামের কাপড় পূর্বের ন্যায় পরে এহরামের নিয়তে দুরাকাত নামায আদায় করতে হবে। নামায পড়ার পর এহরাম অবস্থায় হজের নিয়ত করে মুখে উচ্চারণ করতে হবে :

(আল্লাহুম্মা ইন্নী উরিদুল হাজ্জা ফাইয়াসসেরহুলী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায় ঃ আল্লাহ্‌গো! আমি পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য একাজ সহজ করে দাও এবং আমার কাছ থেকে একে কবুল (মঞ্জুর) করে নাও।

২. কেরান হজ ঃ কেরান হজের নিয়ত করলে মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে

রমল ও এযতেবার সাথে তাওয়াফের কাজ শেষ করেই সায়ী করতে হবে। ওমরাহের তাওয়াফ শেষ করে সায়ী করে তখনই আবার তাওয়াফে কুদুমের নিয়ত করে রমল ও এযতেবা সহকারে তাওয়াফ করতে হবে এবং আবার সাফা মারওয়ায় 'সায়ী' করতে হবে। এই ভাবে দুবার 'তাওয়াফ' ও দুবার 'সায়ী' করার পর মস্তক মুণ্ডন বা চুল কাটার কাজ না করে এহরামের অবস্থাতেই থাকতে হবে। এই একই এহরামে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আরাফাতে হজের কাজ শেষ করে ১০ তারিখে মীনার তাঁবুতে এসে রমী (শয়তানকে কাঁকর মারা), কোরবানী বা জানোয়ার জবাই ও মস্তক মুণ্ডন করে এহরাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

৩. এফরাদ হজ ঃ এফরাদ হজের নিয়ত করলে মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে তাওয়াফে কুদুমের নিয়ত করে তাওয়াফের কাজ শেষ করতে হবে। এফরাদ হজের নিয়ত করলে এই তাওয়াফের পরে 'সায়ী' না করলেও চলবে তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সায়ী করতে হবে। এটাই উত্তম। অথবা তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে সায়ী করতে চাইলে করা যাবে। এক্ষেত্রে রমল ও এযতেবার সঙ্গে তাওয়াফ করতে হবে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পর আর সায়ী করতে হবে না কারণ হজে মাত্র একবার সায়ী করা ওয়াজেব। আর যে সকল তাওয়াফের পর 'সায়ী' নেই সে সকল তাওয়াফে রমল এবং এযতেবা করতে হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ

তাওয়াফ করার নিয়ম ও দোওয়া ঃ

তাওয়াফ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে হাজরুল আসওয়াদের সামনে বা সেই বরাবর যে কালো দাগ আছে সেখানে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরুল আসওয়াদের দিকে মুখ থাকে এবং হাজরুল আসওয়াদ শরীরের ডান দিক বরাবর থাকে। এই সময় ভাল করে দেখতে হবে শরীরে ডান দিক যেন মেঝের কালো দাগ অতিক্রম না করে। অথবা তাওয়াফ শুরু করার জন্য হেরেমের মসজিদের দেওয়াল সংলগ্ন যে আলো জ্বলছে শরীরের কোন অংশ যেন তা অতিক্রম করে ডান দিকে না যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীর হাজরুল

আসওয়াদের ঠিক বাম দিক বরাবর রেখে হাজরুল আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করতে হবে। প্রত্যেক প্রকার তাওয়াফের নিয়ত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

নিয়ত ছাড়া তাওয়াফ শুদ্ধ হয় না। নিয়ত ছাড়া হাজরুল আসওয়াদের কাছ থেকে চক্কর শুরু করলেও তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। অন্তরে নিয়ত করা ফরজ। নিয়তের শব্দগুলি অন্তরে বলার সঙ্গে মুখে উচ্চারণ করা মোস্তাহাব। নিয়ত আরবীতে বলা বাধ্যতামূলক নয়। নিজ নিজ ভাষাতে বললেই চলবে।

নিয়ত করার পর তাকবিরে তাহরিমার মত দুহাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পড়তে হবে :

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার অলিল্লাহিল হামদ।"

বাংলায় : আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

এই দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজরুল আসওয়াদ অতিক্রম করার আগেই অর্থাৎ চুম্বন বা ইশারার পরপরই পড়ার দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(আল্লাহুম্মা ইমানামবেকা ওয়া তাসদিকান বে কেতাবেকা ওয়া ওয়াফাআন বে আহদেকা ওয়া এত্তেবাআল লে সুন্নাতে নাবিয়েকা মোহাম্মাদিন স্বাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।)

বাংলায় : হে আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি বিশ্বাস করে, তোমার কেতাবের সত্যতায় আস্থা রেখে তোমার নির্দেশ পালনের জন্য এবং তোমার নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করে এই কর্তব্য পালন করছি।

এইবার হাজরুল আসওয়াদে ঠোঁট লাগিয়ে চুম্বন করা, তাও সম্ভব না হলে হাতের তালু ঠেকিয়ে তাকে চুম্বন করা, তাও সম্ভব না হলে হাত দিয়ে হাজরুল আসওয়াদের দিকে ইশারা করে হৃদয়ে অনুভব করা যে হাজরুল আসওয়াদকেই চুমা দেওয়া হল। কিন্তু এই ইশারার ক্ষেত্রে হাতের তালুতে চুম্বনের প্রচলন

থাকলেও শরীয়তে এই চুম্বনের বিধান নেই। মনে রাখতে হবে কোনভাবে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে হাজরুল আসওয়াদকে চুমা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। চুমা দেওয়া মুস্তাহাব কিন্তু অন্যকে ধাক্কা দেওয়া হারাম। এইবার তাওয়াফের প্রথম চক্কর শুরু করে দিতে হবে।

প্রত্যেক চক্করেই দোওয়া পড়া উত্তম। প্রত্যেক চক্করের জন্য পৃথক পৃথক একটি করে দোওয়া পড়া যায় অথবা প্রত্যেক চক্করে কাআবা ঘরের বিভিন্ন সীমানায় পৌঁছে বিভিন্ন স্থানের জন্য নির্দিষ্ট দোওয়া প্রত্যেক চক্করে একইভাবেও পড়া যায়।

তাওয়াফ ও সায়ীর সময় নির্দিষ্ট কোন দোওয়া পড়া বাধ্যতামূলক নয়। এই সময় যে কোন রকম দোওয়া পড়া বৈধ। তাওয়াফ অবস্থায় মনে মনে কোরআন পাঠ বা যে কোন যিক্‌র ও দোওয়া যার জন্য যা সহজ তা পড়া যায়। তবে আগে থেকে নিজেকে তৈরী করার জন্য বা ঐ সময় যাতে আবেগাচ্ছন্ন হয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি না ঘটে তার জন্য আগে থেকে মুখস্থ করে অভ্যাস করার জন্য তাওয়াফের সময়ের দোওয়ার উল্লেখ করা হল। অবশ্য এগুলি মোহদাসাত বা নতুন করে প্রবর্তনের রীতি। শরীয়তে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাওয়াফের প্রথম নিয়ম ঃ

এই প্রকার তাওয়াফই আমাদের দেশের হাজীদের নিকট সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচলিত। তাওয়াফের নিয়ত করার পর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। যদি ভিড়ের জন্য তা সম্ভব না হয় তবে হাত বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করে সেই ছড়িকে চুম্বন করা, এক্ষেত্রে হাতের তালুতে বা ছাড়িতে চুম্বন করা, তাহলেই হজরে আসওয়াদে চুম্বন করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাও সম্ভব না হলে কেবল হাত বা ছড়ির ইশারায় চুম্বন করা—ইশারায় চুম্বনের ক্ষেত্রে হাত বা ছড়িতে চুম্বন দিতে হবে না। এবার হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ রেখে পড়তে হবে :

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার অলিল্লাহিল হামদ।"

বাংলায় : আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য।

তাওয়াফ করার সময় উর্দ্ধমুখী হয়ে কাআবা শরীফের দেওয়াল ও ছাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ নয় বরং বিনম্রভাবে স্থির নিমিলিত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক চলার নিয়মে তাওয়াফ করতে হয় তারপর কাআবা ঘরকে বামদিকে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। এইবার প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দোওয়া মুখস্থ না হলে বই দেখে পড়া তাও সম্ভব না হলে সব চক্করে সর্বক্ষণ পড়তে থাকা :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(রাব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া-ফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ অ কেনা আজাবান্নার।)

বাংলায় : হে আল্লাহ্‌। ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

প্রত্যেক চক্করে নীচের দোওয়া হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে এবং রোকনে ইয়েমেনীতে গিয়ে শেষ করতে হবে। মুখস্থ করতে না পারলে বই দেখে পড়লেও চলবে।

(১) প্রথম চক্করের দোওয়া :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ط

উচ্চারণ : সোব্হানাল্লাহে ওয়াল হামদোলিল্লাহে ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াল্লাহো আকবার, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজ্বীম। ওয়াস্বালাতো ওয়াস্ সালামো আলা রাসূলিল্লাহে স্বাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইমানামবেকা ওয়া তাস্বদিক্বান বেকালেমাতেকা ওয়া ওফায়ান বে আহদেকা ওয়া এত্তেবাআন লেসুন্নাতে নাবিয়্যেকা ওয়া হাবীবেকা মোহাম্মাদিন স্বাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালোকাল্ আফওয়া ওয়ালআফিয়াতা ওয়াল মুআফাতাদ্ দায়েমাতা ফিদ্দীনে ওয়াদ্ দুন্ইয়া ওয়াল আখেরাতে ওয়াল ফাওজা বিলজান্নাতে ওয়ান্ নাজাতা ফিন্নারে।

বাংলায় : আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত আমাদের পাপ হতে বিরত থাকবার ও পুণ্য অর্জন করার শক্তি নেই। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। হে আল্লাহ্! তোমায় বিশ্বাস করে, তোমার কিতাবকে সত্য জেনে, তোমার নবী ও হাবিব মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে এ স্থানে উপস্থিত হয়েছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি চাই এবং বেহেশত্ লাভ করতে ও দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেতে প্রার্থনা করছি।

রোকনে ইয়ামেনীর সামনে এসে এই দোওয়া পড়া শেষ করে সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ করে আর সম্ভব না হলে মুখ ফিরিয়ে রোকনে ইয়ামেনীকে দৃষ্টি দ্বারা ইশারা করে এই দোওয়া পড়া শুরু করতে হবে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বেনা আতেনা ফিদ্দুনীয়া হাসানাতাওঁ ওয়া-ফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকেনা আযাবান নার। ওয়া আদখেলনাল জান্নাতা মাআল আবরারে ইয়া আযীযো ইয়া গাফ্ফারো ইয়া রাব্বাল আলামীন)।

বাংলায় : হে আল্লাহ্। ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর,

আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর, হে সর্বশক্তিমান ! ক্ষমাশীল ! হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ! আমাদেরকে সৎ লোকেদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিও।

এর পর হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে হাজরে আসওয়াদকে প্রথম বারের নিয়মে চুম্বন করতে হবে, চুম্বন করতে না পারলে মেঝের কালো দাগের উপর দাঁড়িয়ে কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঠিয়ে দূর থেকে বলতে হবে :

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ"

বাংলায় : "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ্ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য"।

পড়া শেষ করে হাত নামিয়ে পুনরায় প্রথম বারের নিয়মে দ্বিতীয় চক্কর আরম্ভ করতে হবে।

(২) দ্বিতীয় চক্করের দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ
اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا
مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى
النَّارِ ط اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ
اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ط اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ
الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল বায়তা বায়তোকা ওয়াল হারামা হারামোকা ওয়াল আমনা আমনোকা ওয়াল আবদা আবদোকা ওয়া আনা আব্‌দোকা ওয়াএবনো আবদেকা ওয়াহাযা মাকামুল্ আয়েযে বেকা মিনান নারে, ফাহাররেম লোহুমানা ওয়া বাশারাতানা আলান নারে, আল্লাহুম্মা হাব্বেব্ এলাইনাল ইমানা ওয়া যাইয়্যেনোহু-ফী কোলুবেনা ওয়া কাররেহ্ এলাইনাল কুফরা ওয়াল ফোসুকা ওয়াল এসইয়ান ওয়াযআল্‌না মিনার

রাশেদীন। আল্লাহুম্মা কেনয়ি আযাবাকা ইয়াওমা তুবআসো এবাদাকা, আল্লাহুম্মার যোকনিল জান্নাতা বেগায়রে হেসাব।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! এই ঘর তোমারই ঘর, এই হেরেম তোমারই হেরেম, এই শান্তি, তোমারই দোওয়া শান্তি, এই সকল দাস তোমারই দাস! আমি তোমার দাস ও তোমারই দাসের সন্তান, দোযখ থেকে যে তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তারই জন্য এই স্থান। আমার মাংস ও চামড়াকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের ঈমানকে আদরনীয় করে দাও এবং তাকে আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দাও ও কুফরী, গুনাহ ও নাফরমানীকে আমাদের প্রতি ঘৃণিত কর। হে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমার শাস্তি হতে আমায় রক্ষা কর। হে আল্লাহ্! আমাকে বে-হিসাব অফুরন্ত জান্নাতী আহার্য দান কর।

একই ভাবে আগের মত রোকনে ইয়ামেনীর সামনে এসে দোওয়া শেষ করে সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ করে সম্ভব না হলে দৃষ্টির দ্বারা ইশারা করে এই দোওয়া পড়া শুরু করতে হবে। তাওয়াফ কালে কোথাও দাঁড়িয়ে কিছু করতে বা পড়তে হবে না বরং সব কাজই চলতে চলতে করতে হবে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বানা আতেনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকেনা আযাবান নার। ওয়াদ্খেলনাল জান্নাতা মাআল আবরারে ইয়া আযিযো, ইয়া গাফ্ফারো, ইয়া রাব্বাল আলামীন।)

বাংলায়ঃ "ওগো আল্লাহ্! ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর আর দোজখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর, ওগো সর্বশক্তিমান! ওগো ক্ষমাশীল! ওগো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদের সৎ লোকেদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিও!"

এর পর হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে হাজরে আসওয়াদকে আগের নিয়মে চুম্বন করতে হবে। সম্ভব না হলে দূর থেকে নীচের কালো দাগের

উপর দাঁড়িয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে দিকে মুখ করে কাঁধঃ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পূর্বের মত পড়তে হবে :

বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

পড়া শেষ করে হাত নামিয়ে তৃতীয় চক্কর শুরু করতে হবে।

(৩) তৃতীয় চক্করের দো!ওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ
وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْٓءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِی الْمَالِ وَالْاَهْلِ
وَالْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَالنَّارِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ط

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযোবেকা মিনাশ শাক্কে ওয়াশ শেরকে ওয়াশ শিকাকে ওয়ান নিফাকে ওয়া সুয়িল্ আখ্লাকে ওয়া সুয়িল মানযারে ওয়াল মুন্কালাবে ফিল্ মালে ওয়াল্ আহলে ওয়াল ওয়ালাদে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলোকা রেদ্বাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযোবেকা মিন সাখতেকা ওয়ান্ নারে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযোবেকা মিন ফিত্নাতিল কাবরে ওয়া আউযোবেকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতে।)

বাংলায় : হে আল্লাহ! আমি সন্দেহ, শিরক, শত্রুতা, মোনাফেকী (কপটতা), দুশ্চরিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং বাড়ী ফেরার পর যেন নিজ ধনসম্পত্তি পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিকে কোন প্রকার অপ্রীতিকর অবস্থায় না দেখি সেজন্যও তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! কবরের এবং জীবনমরণের বিপদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

একই ভাবে রোকনে ইয়ামেনীর কাছে এসে এই দোওয়া পড়ে...শেষ করতে হবে এবং রোকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ বা ইশারা করে নিম্নলিখিত দোওয়া পড়তে পড়তে সামনে যেতে হবে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বানা আতেনা ফিদ্ দুনিয়া হাসনাতাওঁ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কেনা আযাবান নার। ওয়াদখেলনাল জান্নাতা মাআল্ আবরারে ইয়া আযীযো, ইয়া গাফ্ফারো, ইয়া রাব্বাল আলমীন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ! ইহকাল পরকালে আমাদের মঙ্গল কর ও দোজখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে বিজয় দানকারী, হে ক্ষমাশীল, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সৎ লোকদের সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করিও।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে আগের মত হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে বা চুম্বন করতে না পারলে দূর হতে কাঁদ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পড়তে হবেঃ

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

পড়া শেষ করে হাত নামিয়ে চতুর্থ চক্কর আরম্ভ করতে হবে।

(৪) চতুর্থ চক্করের দোওয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ط رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ط

(আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জাম মাবরুরাওঁ ওয়া সা'আম মাশকুরাওঁ ওয়া যামবাম মাগফুরাওঁ ওয়া আমালান স্বালেহাম মাকবুলাওঁ ওয়া তেজারাতান লান তাবুরা ইয়া আলেমা মা ফীসস্বোদূরে আখরেজনী ইয়া আল্লাহো মিনাজ জুলুমাতে এলানূরে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকা মু'জেবাতে রাহমাতেকা ওয়া আযায়েমা মাগফেরাতেকা ওয়াস্ সালামাতা মিন্ কুল্লে এসমিওঁ ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লে বেররেওঁ ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতে ওয়ান নাজাতা মিনান্নারে। রাব্বি কানেঅনী বেমা রাযাকতানী ওয়া বারেক্লী ফীমা আত্বায়তানী ওয়া আখলোফ আলা কুল্লে গায়েবাতালি লী মিনকা বে খায়র্।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ! আমার এই হজ্জকে নির্দোষ হজ্জ কর, আমার চেষ্টাকে মনোনীত কর, আমার গুনাহকে মাফ কর ও আমার কাজকে সংকাজে পরিণত কর এবং কবুল কর। আমার ব্যবসাকে লাভজনক কর। হে অন্তর্যামী, হে আল্লাহ! আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে পৌঁছে দাও। আমি তোমার অনুগ্রহ ও তোমার ক্ষমা চাই। সমস্ত গোনাহ্ থেকে মুক্তি, সবরকম সংকাজের সুযোগ, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যে পরিমাণ রেজেক দান করেছ, তাতে আমায় সন্তুষ্ট রাখ এবং তা বৃদ্ধি করে দাও এবং যা গত হয়ে গেছে তার পরিবর্তে তোমার পক্ষ থেকে ভাল বস্তু দান কর।

রোকনে ইয়ামেনীর সামনে এসে এই দোওয়া পড়া শেষ করে সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ করে আর সম্ভব না হলে মুখ ফিরিয়ে রোকনে ইয়ামেনীকে দৃষ্টি দ্বারা ইশারা করার পর এই দোওয়া পড়তে হবেঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বানা আতেনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল্ আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কেনা আযাবান্ নারে, ওয়াদ খেলনাল্ জান্নাতা মা আল আববার ইয়া আযীযো, ইয়া গাফফারো ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্, ইহকালে ও পরকাল আমাদের মঙ্গল কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে বিজয় দানকারী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সৎ লোকদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিও।

তারপর হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে হবে, চুম্বন করতে না পারলে আগের পদ্ধতিতে দূর থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে :

বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ পড়ে হাত নামিয়ে পঞ্চম চক্কর আরম্ভ করতে হবে।

(৫) পঞ্চম চক্করের দোওয়া :

اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك
ولا باقي الا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ
بعدها ابدا اللهم اني اسألك من خير ما سألك منه
نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعوذبك من شر
ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اني اسألك الجنة ونعيمها وما يقربني اليها من قول
او فعل او عمل ط واعوذبك من النار وما يقربني اليها
من قول او فعل او عمل۔

(আল্লাহুম্মা আজেল্লানী তাহ্‌তা জেল্লা আরশেকা ইওমা লা জেল্লা ইল্লা ·জেল্লা আরশেকা·ওয়লা বাকেয়া ইল্লা ওয়াজহাকা ওয়াসকেনী মিন্ হাওদে নাবিয়্যেকা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন স্বোল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামা শারবাতান্ হানিয়াতাম মারিয়াতাল্লা নাজমায়ো বাআদাহা আবাদান্।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকা মিন্ খায়রে মা সায়ালাকা মিন্হু নাবীয়্যোকা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদুন স্বাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামা ওয়া আউযোবেকা মিন্ শাররে মাস্তা আযাকা মিন্হু নাবীয়্যোকা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদুন্ স্বাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালোকাল জান্নাতা ওয়া নাইমাহা ওয়ামা ইয়োকাররেবোনী এলাইহা মিন কাওলিন য়াও ফেঅলিন য়াও আমালিন; ওয়া আউযোবেকা মিনান্নারে ওয়ামা ইউকাররেবোনী এলাইহা মিন কাওলিন আও ফেঅলিন আওআমালিন।)

বাংলায় ঃ হে আল্লাহ্! যেদিন তোমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবেনা, সেদিন তোমার আরশের ছায়ার নীচে আমাকে ছায়া দান করো! তুমিই একমাত্র চিরস্থায়ী ; তোমার নবী এবং আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পানপাত্র থেকে আমাদের স্বাস্থ্যকর ও সুমিষ্ট শরবত পান করতে দিও। যেন তারপর আর কখনও পিপাসার্ত না হই! হে আল্লাহ্! তোমার নবী ও আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তোমার কাছে যে সমস্ত মঙ্গল প্রার্থনা করেছিলেন আমিও তা করছি এবং যে সমস্ত অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন থেকে আমিও তা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত ও তার সুখ এবং যে সমস্ত কাজকর্ম ও বাক্য তার নৈকট্য দান করে তা চাইছি। আর যে সমস্ত কাজকর্ম বা কথাবার্তা (বাক্য) দোযখের নিকটবর্তী করে দেয়, তা থেকে তোমার কাছে পরিত্রান প্রার্থনা করছি!

রোকনে ইয়ামিনীর কাছে এসে এই দোওয়া পড়া শেষ করতে হবে এবং রোকনে ইয়ামিনীকে পূর্ব পদ্ধতিতে একই ভাবে স্পর্শ বা ইশারা করে নিম্নলিখিত দোওয়া পড়তে পড়তে সামনে অগ্রসর হতে হবে!

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا
عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ
يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখেরাতে

হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বেনা আযাবান্নারে ওয়া আদখেলনাল জান্নাতা মাআল আবরারে ইয়া আযীযো ইয়া গাফ্‌ফারো, ইয়া রাব্বাল্‌ আলামীন)।

বাংলায় ঃ হে আল্লাহ্‌! ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে বিজয় দানকারী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সৎলোকের সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করিও।

তারপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে হবে, না পারলে দূর থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পড়তে হবে।

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ" পড়ে আগের মত ষষ্ঠ চক্কর শুরু করতে হবে।

(৬) ষষ্ঠ চক্করের দোওয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ
وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ
لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَا كَانَ بِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ
وَاَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ
مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ
اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَّاَنْتَ
يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলাইয়া হোকুকান্‌ কাসিরাতান ফীমা বায়নী ওয়া বায়নাকা ওয়া হুকুকান্‌ কাসীরাতান্‌ ফীমা বায়নী ওয়া বায়না খালক্বেকা— আল্লাহুম্মা মা কানা লাকা মিনহা ফাগফেরহু লী ওয়া মা-কানা লে খালকোকা ফাতাহাম্মালহু আন্নী ওয়াগ্‌নিনী বে-হালালেকা আন হারামেকা ওয়া বেত্বা-আতেকা আন মাআস্বিয়াতেকা ওয়া বেফাদ্‌লেকা আম্মান সেওয়াকা ইয়া ওয়াসেআল মাগ্‌ফেরাতে, আল্লাহুম্মা ইন্না বায়তাকা আযীমুওঁ ওয়া ওয়াজহাকা

কারীমুওঁ ওয়া আনতা ইয়া আল্লাহো হালীমুন কারীমুন আযীমুন তোহেব্বুল্ আফওয়া ফা আফো আন্নী)।

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! আমার নিকট তোমার অনেক দাবী রয়েছে ও তোমার সৃষ্ট জীবেরও অনেক দাবি রয়েছে। হে আল্লাহ্! তোমার দাবী থেকে আমাকে ক্ষমা কর, আর তোমার সৃষ্ট জীবের দাবী থেকে মুক্ত কর। আমি তোমার হালালের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকি। হারামের দিকে যেন কখনও না যাই। হে আল্লাহ্! আমি যেন সর্বদা তোমার গণ্ডীর মধ্যেই থাকি। অকৃতজ্ঞতার দিকে যেন কখনও না যাই এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচাও! হে অতিশয় ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ্! তুমি ধৈর্য্যশীল ও সম্মানিত, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

রোকনে ইয়ামিনীর কাছে এই দোওয়া শেষ করতে হবে এবং রোকনে ইয়ামিনীকে পূর্ব পদ্ধতিতে স্পর্শ করে নিম্নলিখিত দোওয়া পড়তে পড়তে সামনে অগ্রসর হতে হবে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا
عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ
يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

(রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকেনা আযাবান্নারে ওয়া আদখেলনাল জান্নাতা মাআল আবরারে ইয়া আযীযো, ইয়া গাফ্ফারো, ইয়া রাব্বাল আলামীন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর ও দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে বিজয় দানকারী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আমাদেরকে সৎ লোকদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিও।

তারপর হাজরুল আসওয়াদের কাছে এসে হাজরে আসওয়াদকে পূর্ব পদ্ধতিতে চুম্বন করতে হবে, না পারলে দূর থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে "বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ" পড়ে হাত নামিয়ে সপ্তম চক্কর আরম্ভ করতে হবে।

(৭) সপ্তম চক্করের দোওয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ط

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকা ইমানান্ কামেলাওঁ ওয়া ইয়াক্বীনান্ সাদেক্বাওঁ ওয়া রেযকাওঁ ওয়াসেআওঁ ওয়া কাল্‌বান খাশেয়াওঁ ওয়া লেসানান্ যাকেরাওঁ ওয়া রেযকান হালালান্ তাইয়্যোবাওঁ ওয়া তাওবাতান্ নাসুহাওঁ ওয়া তাওবাতান্ কাবলাল মাওতে ওয়া রাহাতান্ ইন্‌দাল মাওতে ওয়া মাগফেরাতাওঁ ওয়া রাহমাতান্ বাআদাল মাওতে ওয়াল আফওয়া ইনদাল্ হেসাবে ওয়াল ফাওযা বিল্ জান্নাতে ওয়ান্ নাজাতা মেনান্ নারে, বেরাহ্ মাতেকা ইয়া আযীযো ইয়া গাফ্ ফারো রাব্বে যেদ্‌নী ইল্ মাওঁ ওয়া অল্ হেক্‌নী বিস্‌স্বালেহীন)।

বাংলায় ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পূর্ণ ঈমান, খাঁটি বিশ্বাস, বিস্তর খাদ্যসামগ্রী, ভীত অন্তকরণ, তোমার নাম উচ্চারণকারী জিহ্বা হালাল পবিত্র বস্তু, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা, মৃত্যুকালে শান্তি, মৃত্যুর পর ক্ষমা ও সুখ, হিসাবের কালে মার্জনা, বেহেশত লাভ ও দোযখ হতে মুক্তি প্রার্থনা করছি। হে সর্বশক্তিমান! হে ক্ষমাশীল! তোমার অনুগ্রহে এই সমস্ত আমাকে দান কর! হে প্রতিপালক। আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর এবং সৎ লোকদের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর।

রোকনে ইয়ামিনীর কাছে এই দোওয়া পড়া শেষ করতে হবে এবং রোকনে ইয়ামিনীকে পূর্ব পদ্ধতিতে স্পর্শ করে নিম্নলিখিত দোওয়া পড়তে পড়তে সামনে অগ্রসর হতে হবে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

("রাব্বানা আতেনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কেনা আযাবান্নারে ওয়া আদখেলনাল জান্নাতা মাআল আবরারে ইয়া আযীযো, ইয়া গাফ্‌ফারো, ইয়া রাব্বাল আলামীন।")

বাংলায় : হে আল্লাহ! ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর ও দোজখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে বিজয় দানকারী! হে ক্ষমাশীল, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সৎ লোকদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিও।

এবার পূর্বের মত হাজরুল আসওয়াদের কাছে এসে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে হবে। না পারলে দূর থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ" পড়ে হাত নামিয়ে ফেলতে হবে। এই ভাবে কাআবা ঘরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার পর এক তাওয়াফ সম্পূর্ণ হল। এবার মুলতাযিমের সামনে দাঁড়িয়ে মুলতাযিমের দোওয়া পড়তে হয়। মুলতাযিম দোওয়া কবুলের জায়গা। মুলতাযিমের কাছে গিয়ে কাআবা ঘরের দেওয়ালে দু'হাতের তালু রেখে ডান গাল লাগিয়ে দেওয়ালে লেপটে প্রাণ ভরে মনের আবেগ মিটিয়ে দোওয়া চাইতে হয়। অবশ্য ভিড়ের জন্য সম্ভব না হলে সামনে দাঁড়িয়ে দোওয়া পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রাণ ভরে দোওয়া চান।

হাজরে আসওয়াদ ও কাআবাঘরের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযিম বলে। এখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদাকাটা করবেন। যা মনে আসে প্রার্থনা করুন, যে কোন ভাষায় নিজের হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করে প্রার্থনা করুন আর অন্তর দিয়ে অনুভব করুন যে আপনি বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়েছেন সম্ভব হলে এর চৌকাঠ স্পর্শ করে দাঁড়ান এবং মনে করুন আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। এবার এই দোওয়ার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়ুন :—

মুলতাযেমের দো'ওয়া

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ
اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ
يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ
وَالْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا
وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ عَبْدُكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ
مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰى عَذَابَكَ
مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَ
تُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ فِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَ
اَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ.

(আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল্ বায়্যাতিল্ আতীক আতেক রেকাবানা ওয়া রেকাবা আবায়েনা ওয়া উম্মোহাতেনা ওয়া ইখওয়ানেনা ওয়া আওলাদেনা মিনান্নারে, ইয়া যাল জুদে ওয়াল্ কারামে ওয়াল ফাদ্‌লে ওয়াল্ মান্নে ওয়াল্ আত্বায়ে ওয়াল্ এহসানে—আল্লাহুম্মা আহসেন আকেবাতেনা ফিল ওমুরে কুল্লেহা ওয়া আজেরনা মিন্ খিযয়িদ দুনইয়া ওয়া আযাবিল্ আখেরাতে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদোকা ওয়াকেফ তাহতা বাবোকা মুলতাযেমুন বে আতাবেকা মুতাযাল্লেলুন্ বাইনা ইয়াইদাকা আরজু রাহ্‌মাতাকা ওয়াখ্‌শা আযাবাকা মেনান্নার, ইয়া কাদীমাল্ এহসানে—আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকা আন তারফাআ যেকরী ওয়া তাযাআ বেযরী ওয়া তোসলেহা আমরী ওয়া তোতাহ্‌হেরা কালবী ওয়া তোনাওবেরালী—ফী—ক্কাবরী ওয়া তাগফেরলী যানবী ওয়াআসআলোকাদ দারাজাতিল্ উলা মিনাল্ জান্নাতে আমীন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! হে সম্মানিত প্রাচীন ঘরের মালিক! আমাদেরকে ও আমাদের মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী ও সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে দানশীল পরম দয়ালু আল্লাহ্! আমাদের সমস্ত কাজে সুফল দান কর এবং আমাদেরকে পার্থিব অপমান ও পরকালের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্! আমি তোমারই বান্দা ও বান্দার সন্তান, তোমার ঘরের নীচে দণ্ডায়মান। তোমার পবিত্র গৃহ (কাআবা) মুলতাযেম ও চৌকাঠ স্পর্শ করে তোমার সামনে বিনীত প্রকাশ করছি, তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি এবং তোমার আগ্নির শাস্তির জন্য ভীত হচ্ছি। হে চির কল্যাণকারী, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে তোমার প্রতি আমার এই যেকেরকে (স্মরণকে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে কবুল করে নাও, তুমি আমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি কর, আমার পাপের বোঝা হাল্কা করে দাও, আমার কাজকে শুদ্ধ কর, আমার মনকে পবিত্র কর, আমার জন্য আমার কবরকে আলোকিত কর আর আমার গোনাহকে ক্ষমা করে দাও। ওগো আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট বেহেশতের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রার্থনা করছি, তুমি আমার দোওয়া কবুল করে নাও!

উপরিউক্ত দোওয়া পাঠ শেষ করে ডান দিকে ঘুরলেই দেখা যাবে একটি কাঁচ ঘেরা থামের মত এক মানুষ উঁচু স্তম্ভ। এটা মাকামে ইব্রাহীম। তাওয়াফ শেষের নামাযের জন্য এই মাকামে ইব্রাহীমের কাছে আসতে হবে। মাকামে ইব্রাহীমে জান্নাতের একখানি পাথর আছে। এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র ঘরের (কাআবা) দেওয়াল গেঁথেছিলেন। এই পাথর প্রয়োজন মত উঁচু হতো। এই পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। কাআবা ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হলে পাথরটি সেখানেই পড়ে ছিল। বহুকাল পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময় রোকনে ইরাকীর পূর্বদিকে আল্লাহ্‌র ঘর থেকে দুই হাত দুই গিরা দূরে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে উক্ত পাথরখানি গোলাকার কাঁচ ঘেরা আধারে রাখা হয়েছে। এই স্থানটিকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। এখানে জায়গা না পেলে এর কাছাকাছি জায়গায় নামায পড়ে দোওয়া চাওয়া। এটি দোওয়া কবুলের জায়গা।

মাকামে ইব্রাহীমে সালাত ও দোওয়াঃ

মাকামে ইব্রাহীম ও কাআবাকে সম্মুখে রেখে ওয়াজিবুত্ তাওয়াফ দু

রাকাআত সালাত পড়তে হবে। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমে সালাত কায়েম করো।" (কোরআন)

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল যে কোন তাওয়াফই হোক না কেন প্রত্যেক প্রকার তাওয়াফের পর দু'রাকাআত সালাত পড়া ওয়াজিব।

মাকামে ইব্রাহীমে সালাত আদায়ের নিয়ম :

মাকামে ইব্রাহীম ও আল্লাহ্র ঘরকে (কাআবা) সামনে রেখে দু রাকাআত ওয়াজেবুত্ তাওয়াফ নামাযের নিয়ত করতে হবে। নিয়ত :

নাওয়াইতোয়ান উস্বালিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকআতায় স্বালতিল ওয়াজেবিত তাওয়াফে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলায় : আমি দুরাকাআত ওয়াজ্জেবুত তাওয়াফ নামায কেবলামুখী হয়ে আদায়ের নিয়ত করছি আল্লাহো আকবার।

এই নিয়ত করে প্রথম রাকাআতে আলহামদোর সঙ্গে সুরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে আলহামদোর সঙ্গে সুরা এখলাস পড়া উত্তম।

ভিড়ের দরুন মাকামে ইব্রাহীমে স্থান পাওয়া না গেলে, হাতীমের মধ্যে মীজাবে রহমতের নীচে বা কাছে পড়তে হবে। হাতিমের মাঝামাঝি কাআবা শরীফের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিলে একটা সোনার নল দেখা যাবে। এটাকেই মীজাবে রহমত বলে। (মীজাবে রহমত অর্থ হলো অনুগ্রহের নল। এই নল থেকে কাআবা ঘরের ছাদের বৃষ্টির পানি পড়ে। বর্তমানে এটি স্বর্ণ নির্মিত।) সেখানেও স্থান না পাওয়া গেলে কাআবা ঘরের চারপাশে হেরেম এলাকার যে কোন স্থানে পড়লেই সালাত আদায় হবে।

আস্বরের পর তাওয়াফ করলে ওয়াজেবুত তাওয়াফ সালাত মাগরেবের সালাতের পর পড়তে হবে। ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করলে ওয়াজেবুত তাওয়াফ সূর্য উদয় হওয়ার ৩৫ মিঃ পর পড়তে হবে। দ্বিপ্রহরের সময় তাওয়াফ করলে বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর সালাত পড়তে হবে। কোন সময় মাকরূহ অর্থাৎ যাওয়াল ওয়াক্তে সালাত পড়া উচিত নয়। ওয়াজেবুত তাওয়াফ সালাতের পর নিম্নলিখিত দোওয়া পড়ে মোনাজাত করে প্রাণ ভরে প্রার্থনা করা উত্তম :

মাকামে ইব্রাহীমের দো'ওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ
وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ
فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ
قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا
مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا مِّنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ط
لهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِىْ مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا
مًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ
مُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصّٰلِحَاتِ
اَعْمَالَنَا. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ
خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তাআলাম সেররী ওয়া আলা নিয়্যাতী ফাআকবাল মাআযেরাতী ওয়া তাআলামো হাযাতী ফা আত্বেনী সু'লী ওয়া তাআলামো মাফী নাফসী ফাগ্‌ফেরলী যোনুবী আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকা ইমানান্ ইয়োবাশশেরো ক্কালবী ওয়া ইয়াক্কীনান্ স্বাদেক্কান হাত্তা আ'লামা য়ান্নাহু লা ইয়োস্বিবোনী ইল্লা মা কাত্তাবতা লী ওয়ারিদাম মিনকা বেমা-কাসামতালী আনতা ওয়ালিয়্যী ফিদ্‌দুনইয়া ওয়াল আখেরাতে তাওয়াফ্‌ফানী মুস্‌লেমাও ওয়াল হিক্‌নী বিস্‌সালেহীন আল্লাহুম্মা লা-তাদা'আ লানা ফী মাকামেনা হাযা যাম্‌বান ইল্লা গাফার্‌তাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্‌রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান ইল্লা কাযাইতাহা ওয়া ইয়াস্‌সারতাহা ফাইয়াস্‌সের উমুরানা ওয়াশরাহ স্বোদুরানা ওয়া নাওবের কলুবানা ওয়াখতেম্ বিস্ স্বালেহাতে আমালানা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানা মুসলেমীনা ওয়াল্‌হেক্কনা বিস্‌স্বালেহীনা গায়রা খাযাইয়া ওয়ালা মাফতুনীনা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় অবগত আছ। (অর্থাৎ যত রকম গোনাহ আছে, তুমি অবগত আছ।) আমি তোমার দরবারে নিজের দোষত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি অনুগ্রহ করে আমার যাবতীয় দোষত্রুটি মার্জনা করে দাও। আমার যাবতীয় অভাব অভিযোগও তোমার কাছে নিবেদন করছি অনুগ্রহ করে আমার যাবতীয় অভাব অভিযোগ দূর করে আমার সকল প্রার্থনা পূরণ করে দাও। আমার হৃদয়ের সমূহ ত্রুটি তোমার জানা. তুমি আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করে দাও। হে আল্লাহ্ আমাকে খাঁটি ঈমানদার কর, যা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে সুদৃঢ় হয়। আমাকে তোমার উপর এমন অটল বিশ্বাস দান কর যাতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, তুমি আমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছ কখনও তার ব্যতিক্রম হবে না। তুমি আমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছ তাতেই যেন আমার সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। হে আল্লাহ্! ইহকাল ও পরকালে একমাত্র তুমিই আমার সহায়। আমাকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করো এবং তোমার পুণ্যবান দাসদের সঙ্গে আমাকে মিলিত করো। হে আল্লাহ! এই পবিত্র স্থানের (কাআবার) মহিমায় আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও। আর আমার সমূহ প্রয়োজনকে পূর্ণ করে দাও আর আমার কাজ সমূহকে আমার জন্য সহজ করে দাও। আমাদের বক্ষোদেশ প্রশস্ত করে দাও। আমাদের অন্তর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে দাও, আমাদের যাবতীয় সৎ কাজ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে সৌন্দর্য্যের দ্বারা পূর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ্! মুসলমান থাকা অবস্থায় আমাদের মৃত্যুদান কর এবং তোমার সৎ লোকেদের সঙ্গী কর। (ইহ ও পরকালের) যাবতীয় কষ্ট এবং কুকাজ থেকে রক্ষা কর। হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! তুমি আমার সকল প্রার্থনা কবুল করে নাও।

এইভাবে মাকামে ইব্রাহিমে সালাত শেষে প্রার্থনা করে তারপর হেরেম শরীফের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে যে যমযমের পানি পান করার জায়গা আছে সেখানে গিয়ে পেটপুর্ণ করে যমযমের পানি পান করা উত্তম। এই সময়ও দোওয়া কবুল হয়। পবিত্র কাআবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এই দোওয়া পড়ে যমযমের পানি তিন দমে পান করতে হবে।

যমযমের পানি পান করার দোওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ
عِلْمًا نَافِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালোকা রেজকাওঁ ওয়াসেআওঁ ওয়া এলমান নাফেআওঁ ওয়া শেফায়াম মিন কুল্লে দায়িন।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! হে পরম দয়াময়, তোমার অনুগ্রহে লাভজনক জ্ঞান, জীবিকা নির্বাহের উপায় প্রচুর আহার্য ও সমস্ত রকম থেকে তোমার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাওয়াফের দ্বিতীয় নিয়ম ঃ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিভাবে তাওয়াফ করতে হবে এবং কি কি দোওয়া পড়তে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার তাওয়াফ করার সময় আরও একভাবে দোওয়া পড়া যায় সেগুলো দোওয়া সমেত উল্লেখ করা হল। যাঁর যেভাবে ভাল ও সহজ এবং সুবিধাজনক মনে হবে সেভাবে তিনি তাওয়াফ করতে পারবেন।

হযরুল আসওয়াদকে ইশারায় বা সরাসরি চুম্বনের বিষয় দশম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। এবার তাওয়াফ শুরু করে হাজরুল আসওয়াদ পার হয়েই কাআবার দরজা পর্যন্ত অংশটি হল মুলতাজেম, দরজা বরাবর পৌঁছে এই দোওয়া পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا
الْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْعَائِذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

(আল্লাহুম্মা হাযাল বায়তো বায়তোকা ওয়া হাযাল হারামো হারামোকা ওয়া হাযাল আমানো আমানোকা ওয়া হাযাল মাকামোল আয়েযে বেকা মিনান নার।)

বাংলায় : ওগো আল্লাহ্! এই তোমার ঘর। এই হারাম তোমার হারাম এই নিরাপদ স্থান তোমার নিরাপদ স্থান, এই স্থান দোযখ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় পাওয়ার স্থান।

এইবার ডানদিকে ঘাড় ফেরালেই দেখা যাবে মাকামে ইব্রাহীম। মাকামে ইব্রাহীমে কাঁচ ঘেরা থামের মত স্তম্ভ আছে। মাকামে ইব্রাহীমের দিকে দৃষ্টি দিয়ে পড়ার দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَّاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ عَلَى النَّارِ وَاَمِنِّيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِيْ مَؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ٥

(আল্লাহুম্মা ইন্না বায়তাকা আযীমুন ওয়া ওয়াজহাকা কারীমুন ওয়া আনতা আরহামোর রাহেমীন, ফা য়াএজেনী মেনান্নারে ওয়া-মেনাশ্ শায়তানির রাজীম ওয়া-হার্‌রেম লাহ্‌মী ওয়া-দামী আলান্নারে ওয়া-আমান্নী মিন আহওয়ালে ইয়াওমিল কেয়ামাতে ওয়া-য়াকফেনী মারনাতাদ দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে।)

বাংলায় : "ওগো আল্লাহ্! তোমার ঘর গৌরবময়, তোমার মুখ সম্মানিত, তুমি করুণাময়, দয়াময় ; দোজখের আগুন এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার রক্ত মাংস দোযখের জন্য হারাম করে দাও, কেয়ামতের ভীষণ আজাব থেকে আমাকে নিরাপদ কর এবং ইহকাল ও পরকালের কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

এর পর আল্লাহ্‌র তসবীহ পড়তে পড়তে রোকনে ইরাকীতে (তাওয়াফ শুরু করে প্রথম কাআবা ঘরের যে কোণ পাওয়া যাবে সেটাকে রোকনে ইরাকী বলে) পৌঁছে পড়ার দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযোবেকা মিনাশ্‌শেরকে ওয়া-শশাক্কে অল-কোফরে ওয়াননেফাকে ওয়াশশেফাকে ওয়া-সুয়িল আখলাক্বে ওয়া-সুয়িল মানজারে ফিল আহলে ওয়াল মালে ওয়াল ওয়ালাদ।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি শেরেক, সন্দেহ, কুফরী, মোনাফেকী, শত্রুতা, কুস্বভাব এবং পরিবারের প্রতি, ধনের প্রতি এবং সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

কাআবা ঘরের দক্ষিণ দিকে গোলাকৃতি এক বুক দেওয়াল দেওয়া অংশ হল হাতিম। পূর্ব যুগে এই অংশ নিয়ে কাআবা ঘর ছিল। তাই এটাকে কাআবার অংশ গণ্য করা হয়। এই প্রাচীরের বাইরের দিক থেকে তাওয়াফ করতে হবে। অর্থাৎ প্রাচীরও সব সময় বাম কাঁধ বরাবর থাকবে। হাতিমে (মাজারে) পৌঁছে পড়ার দোওয়া :

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِىْ بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا.

(আল্লাহুম্মা আজ্বেল্লানী তাহতা আরশেকা ইওয়ামা লা জ্বেল্লা ইল্লা জ্বেল্লোকা আল্লাহুম্মা আসকেনী বে কায়াসে মোহাম্মাদিন স্বাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, শারবাতান লা আজমাও বাআদাহা আবাদান।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্‌! যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া ছায়া থাকবে না সেদিন আমাকে তোমার আরশের নীচে আশ্রয় দিও। হে আল্লাহ্‌! ঐ দিন আমাকে মোহাম্মাদ স্বাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পান-পাত্র থেকে পান করিও, যেন আমি আর পিপাসার্ত না হই।

হাতিমের পরের কোণটি হল রোকনে শামী। এবার রোকনে শামীতে পৌঁছে পড়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মাজয়ালাহু হাজ্জান মাবরুরান ওয়া সাআন মাশকুরান ওয়া-জামবান মাগফুরান ওয়া তেজারাতান লান তাবুরা ইয়া আজীজো ইয়া গাফুরো রাব্বেগফের ওয়ারহাম ওয়া তাজাওয়াজ আম্মা তাআলাম আনতাল আজ্জো ওয়াল-আকরাম।"

বাংলায় : হে আল্লাহ্ আমার হজ্জকে কবুল করে এই পরিশ্রম সফল করো, আমার গোনাহকে ক্ষমা করো, এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করো। হে প্রতাপশালী, হে প্রভু, ক্ষমা করো, দয়া করো, তোমার জানা সকল অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমিই উচ্চ সম্মানিত।

এর পরের কোণটি হল রোকনে ইয়েমেনী। এর পর রোকনে ইয়েমেনীতে পৌঁছে পড়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযোবেকা মেনাল কুফরে ওয়া-আউজোবেকা মেনাল ফাকরে অমিন আযাবিল কাবরে অমিন ফেতনাতিল মাহইয়ায়ে ওয়াল মামাত, ওয়া-আউযোবেকা মেনাল খেজয়ে ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে।"

বাংলায় : হে আল্লাহ্! আমি কুফরি, দারিদ্র্য, কবর আজাব, জীবন ও মৃত্যুর কষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। ইহকাল ও পরকালের অপমান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

সম্ভব হলে রোকনে ইয়েমেনীকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হবে কিন্তু হাতে চুম্বন দিতে হবে না। এই সময় পড়তে হবে :

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার।"

(আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ্ মহান।)

এবার রোকনে ইয়েমিনী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছে পড়ার দোওয়া :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

(রাব্বানা আতেনা ফীদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া-ফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ, ওয়াকেনা আযাবান নার। ওয়াদখেলনাল জান্নাতা মাআল আব্বারে, ইয়া আযীযো, ইয়া গাফ্ফারো ইয়া রাব্বাল আলামীন।)

বাংলায় : হে আমার প্রতিপালক ! ইহকাল ও পরকালে আমাদের মঙ্গল করো, আর দোজখের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও এবং সৎ লোকের সঙ্গে আমাদের বেহেশতে প্রবেশ করিও—হে সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল ও বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।

এরপর হজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করা আর না হলে দূর থেকে ইশারায় চুম্বন করা। এবার এক চক্কর পূর্ণ হল। পুনরায় পূর্বনিয়মে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করতে হবে। এই ভাবে সাতটি চক্কর পূর্ণ করলে এক তাওয়াফ পূর্ণ হবে। প্রত্যেক চক্কর শুরু হওয়ার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঠিক হজরে আসওয়াদ থেকে চক্কর শুরু হয়। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে তাওয়াফ করার সময় যেমন বাম কাঁধ কেবলার দিকে থাকে কিন্তু প্রত্যেক চক্কর শুরুর সময় অর্থাৎ হজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় (ইশারায় হোক বা সরাসরি চুম্বনের সময় হোক) মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে থাকবে। এইভাবে প্রত্যেক চক্করে একই দোওয়া পড়ে তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে দুরাকাআত ওয়াজেবুতাওয়াফ নামায আদায় করে সায়ী করার জন্য বাবুস সাফার দিকে যেতে হবে। কিন্তু সাধারণ নফল তাওয়াফে সায়ী করতে হয় না। কেবল মাত্র ওমরাহর তাওয়াফেই সায়ী করার জন্য সাফার দিকে যেতে হবে। তার আগে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মোলতাযিম ও মাকামে ইব্রাহীমে দোওয়া পড়া ও ওয়াজেবুত তাওয়াফ নামায আদায় করে যমযমের পানি পেট পুরে পান করতে হবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সায়ী করা বা সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ান

আর বিলম্ব নয়। এবার হেরেম শরীফের 'বাবে সাফা' নামক দরজার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে প্রবেশ করলেই সামনে সাফা পাহাড় দেখা যাবে। বর্তমানে এটাও হেরেম শরীফের সঙ্গেই যুক্ত। সমগ্র অংশ শ্বেত পাথরে আবৃত। হাজিদের কষ্ট লাঘবের জন্য উপরে ছাদ

করা আছে। নীচে ও উপর থেকে সায়ী করার ব্যবস্থা আছে। এই প্রশস্ত রাস্তার মাঝখানে অক্ষম লোকেদের হুইল চেয়ারে বসিয়ে সায়ী করানোর জন্য পৃথক জাফরী ঘেরা রাস্তা আছে।

সাফা-মারওয়ার সাঈর দৃশ্য

হজ্জ যাত্রীগণ বিবি হাজেরার পানির সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি স্মরণ করে সায়ী করছেন।

সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে একবার চুম্বন করা ভাল। নইলে ইশারায় চুম্বন দিতে হবে। সাফার দরজা থেকে প্রবেশ করলেই সাফা পাহাড়ে যতটা অংশ এখনও রাখা আছে তা দেখতে পাওয়া যাবে। কেরান ও তামাত্তো হজের নিয়তকারী

হাজিদের প্রথম তাওয়াফ হল তাওয়াফে 'ওমরাহ'। সুতরাং প্রথম তাওয়াফের পরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জন্য 'সায়ী' করা ওয়াজেব বা অবশ্যকরণীয় কাজ। এফ্‌রাদকারী হাজীদের প্রথম তাওয়াফ তাওয়াফে কুদুম তাই তাঁরা ইচ্ছে করলে তাওয়াফে যিয়ারাতের পরও সায়ী করতে পারবেন অথবা ইচ্ছে করলে অন্য একটি নফল তাওয়াফ করে তারপরও সায়ী করতে পারেন।

সাফা পাহাড় দৃষ্টি গোচর হলে পড়তে হবে :

"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়েরিল্লাহ্‌ ফামান হাজ্জাল বায়তা আবে তামারা ফালা জোনাহা আলাইহে আঁই ইয়াতা তাওয়াফা বেহেমা অমান তাতাওয়া খায়রান ফাইন্নাল্লাহা শাকেরুণ আলীম।"

বাংলায় : সাফা ও মারওয়া উভয় পাহাড় আল্লাহ্‌র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তাই যারা হজ্জ করবে আর ওমরাহ করবে তাদের এই উভয় পাহাড়েই ভ্রমণ করতে হবে। তাতে তাদের কোন গোনাহ হবে না বরং পুণ্য হবে। যাঁরা সানন্দে কোন পুণ্য কাজ করবে আল্লাহ্‌ তাদের পুরস্কার দেবেন কেননা আল্লাহ্‌ সব কিছু জানেন এবং পুণ্য কর্মের মর্যাদা দেন।

এর পর সাফা পাহাড়ের পাথর বেয়ে যতটা সম্ভব উপরে উঠে যেতে হবে। কমপক্ষে এক দু'ধাপ উঠতেই হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে কাআবা ঘরের দিকে মুখ করে দুহাত তুলে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথমে এই দোওয়াটি পড়তে হবে :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া লাহুল মোলকো ওয়া লাহুল হামদো ইয়োহয়ী ওয়া ইয়োমিতো ওয়া হোয়া হাইউন লা ইয়ামুতো বেইয়াদিহিল খায়রো অহোয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদির।"

বাংলায় : আল্লাহ ছাড়া কোন আরাধ্য বা উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি চিরজীবি অমর, তাঁর হাতেই সমগ্র মঙ্গল তিনি সর্বশক্তিমান।

এর পর সায়ী করার নিয়ত করতে হবে। মিকাত থেকে যেমন হজ্জের নিয়ত করতে হয় তেমনি এখন সায়ীরও নিয়ত করতে হবে।

১। কেরাণ হজকারী হাজিদের নিয়ত হবে :

"আল্লা হুমমা ইন্নী ওরিদু সায়আ মা বায়নাস্ সাফা ওয়াল মারআয়াতা সাবআতা আশওয়াতিন সয়ীল হাজ্জা আবী ওমরাতা লিল্লাহে তায়ালা আজ্জো অয়া জাল্লো।)

বাংলায় : হে আল্লাহ্! আমি হজ ও ওমরাহর জন্য তোমারই নামে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার সায়ী করার মনস্থ করলাম। তুমি অতিবড় মহান।

২। তামাত্তো হজকারী হাজির সায়ীর নিয়ত :

বাংলায় : হে আল্লাহ আমি ওমরাহর জন্য তোমার নামে সাফাও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার সায়ী করার নিয়ত করলাম, তুমি অতিবড়, অতি মহান।

এফরাদকারী হাজিও নিয়ত করবেন : এফরাদকারী হাজিকে ঐ একই ভাবে কেবল মাত্র 'হজের' জন্য সায়ী করার নিয়ত করতে হবে।

সায়ার সাধারণ নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ.
فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি ওরিদুস সাআ বায়নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা সাবআতা আশওয়াত্বিন লেওয়াজহেকাল কারীমে ফাইয়াসসেরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায় : আমি সাতবার সাফা মারওয়ায় সায়ী করার নিয়ত করলাম আমার জন্য একাজ সহজ করে দাও এবং আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর :

নিয়ত শেষ করে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে চেয়ে তিনবার আল্লাহু আকবর তারপর ওয়া-লিল্লাহিল হামদ পড়ে সাফা পাহাড় থেকে নেমে মারওয়ার দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে। এই পথে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট দোওয়া উল্লেখ করা হল। কিন্তু এই দোওয়া পড়া সম্ভব না হলে যে কোন দোওয়া পড়া যাবে অথবা দেখে এই দোওয়া পড়লেও চলবে।

সায়ীর দোওয়া

সায়ী করার সময় সাফা থেকে মারওয়া ও মারওয়া থেকে সাফা উভয় দিকে যাওয়া আসার সময় এই দোওয়া পড়া যায় :

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى
مَا اَوْلَانَا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِىْ هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ
هَدَانَا اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ
وَصَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ
جُنْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ
اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ اُدْعُوْنِىْٓ
اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ
وَاِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ
اَنْ لَا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَاَنَا
مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

وَاتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ
وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَائِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ
اَجْمَعِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(আল্লাহো আকবার আল্লাহো আকবার আল্লাহো আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদো, আলহামদো লিল্লাহে আলা মা হাদানা, আলহামদো লিল্লাহে আলা মা আওলানা. আলহামদো লিল্লাহে আলা মা আলহামানা, আলহামদো লিল্লাহিল লাযি হাদানা ওয়ামা কুন্না লে নাহতাদেয়া লাওলা আন্না হাদানাল লাহো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকো ওয়া লাহুল হামদো ইয়োহয়ী ওয়া ইয়োমিতো ওয়া হোওয়া হাইউন লা ইয়ামুতো বেইয়াদেহিল খায়রো ওয়া হোওয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদির, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু ওয়া সাদাকা ওআদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া আযযা জোনদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়ালা নাআবোদো ইল্লা ইয়াহো মোখলেস্বিনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারেহাল কাফেরুন। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতো ওয়া কাওলোকাল হাক্কো আদউনি আসতাজেব লাকুম ওয়া ইন্নাকা লা তোখলেফুল মিআদ। ওয়া ইন্নি আসআলোকা কামা হাদায়তানি লিলইসলাম, আন লা তানযেআহু মিন্নি হাত্তা তাওয়াফফানি ওয়া আনা মুসলেমুন সোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদো লিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াল্লাহো আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আযীম। আল্লাহুম্মা স্বাল্লে ওয়া স্বাল্লেম আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলেহি ওয়াসহাবেহী ওয়া এত্তেবায়েহী এলা ইয়াওমিদ দিন। আল্লাহুম্মাগ ফেরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়ালে মাশায়েখী ওয়া লিল-মোসলেমিনা আজমাইনা ওয়াস সালামো আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।)

এই দোওয়া পড়া সম্ভব না হলে নিজের পাপরাশির ক্ষমার জন্য ছোট ছোট দোওয়া পড়া যাবে। সাফা থেকে পঁচিশগজের মত জায়গা এগোলেই দেখা যাবে হেরেম শরীফের দেওয়ালের সঙ্গে লাগান ছুটি সবুজ রঙের থাম আছে এবং ছুদিকের থাম বরাবর সবুজ নিয়ন লাইট জ্বালানো আছে।

এই থামের মাঝ খানের জায়গাটিকে বলে বাতন্নুলওয়াদি, এই অংশের দূরত্ব কুড়ি গজের মত। এই কুড়ি গজ জায়গা অর্ধ দৌড় অবস্থায় পার হতে হবে। এই অংশে ধীরে বা স্বাভাবিক ভাবে চলা নিষিদ্ধ। এই অংশে দৌড়বার সময় পড়ার দোওয়া :

"রাব্বিগ ফিরলি ওয়ারহাম আনতাল অযযো ওয়াল আকরামো"

বাংলায় : হে আমার প্রতিপালক ! আমায় ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ কর, তুমি সর্বশক্তিমান ও সর্বোপরি সম্মানিত।

এই অংশটুকু পার হয়েই আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে হবে। আর স্মরণ রাখতে হবে বিবি হাজেরা, শিশু ইসমাইলের ঘটনা যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই সবুজ বাতির মধ্যকার অংশে কেবল মাত্র পুরুষদেরই দৌড়ে পার হতে হবে। মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে কাআবার দিকে দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে যাবে। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে কয়েক ধাপ উঠে কাআবা ঘরের দিকে চেয়ে সশব্দে তিনবার আগের মত "আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ" পড়তে হবে আর প্রার্থনা করতে হবে। এটিও সাফা পাহাড়ের মত দোওয়া কবুলের স্থান। এবার একটি দৌড় হল। এই ভাবে আবার মারওয়া পাহাড় থেকে ফিরে আসতে হবে সাফা পাহাড়ে। সবুজ বাতির অংশটুকু আগের মত করেই দৌড়ে পার হতে হবে। সাফা পাহাড়ে এসে আবার একইভাবে দোওয়া ও চতুর্থ কালেমা ইত্যাদি পড়তে হবে। পুনরায় দুহাত উঠিয়ে কাআবা ঘরের দিকে চেয়ে আগের মত তিনবার আল্লাহু আকবার পড়তে হবে। এবার দুটি দৌড় হল। এইভাবে সাত বার যাওয়া আসা করলে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সায়ী শেষ হবে।

সায়ী শেষ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের ও সমগ্র মুসলমানের জন্য প্রাণ ভরে দোওয়া চেয়ে নিতে হবে। তারপর হেরেম শরীফের ভিতরে গিয়ে দুরাকাত নামায পড়তে হবে। এ নামায নফল নামায। নামায পড়ার আগে বা পরে দোওয়া পড়ে প্রাণভরে যমযমের পানি পান করুন। তামাত্তোকারী হাজিদের সাফা মারওয়া দৌড় শেষ করে নফল নামায পড়ে বের হয়ে আসতে হবে এবং মাথা মুড়িয়ে এহরাম খুলে ফেলা যাবে। মেয়েদের মাথা মুড়ানোর প্রয়োজন নেই। তাদের চুলের ডগার দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেললেই চলবে। এহরাম খুলে সাধারণ কাপড় জামা পরে নেওয়া যাবে। তবে কেরান ও এফরাদ হজ্জকারীগণকে এহরামের অবস্থাতেই থাকতে হবে।

মক্কায় বাসস্থান :

যাদের বাসস্থান সন্ধান করা নেই তাদের বের হয়ে নিজের বা মোয়াসসেসার মাধ্যমে থাকার ঘর ভাড়া করে নিতে হবে। মহল্লা মিসফালা, মহল্লা জিয়াদ, মহল্লা সুবেকা, জাবালে হিন্দ এলাকায় স্বল্প ভাড়ায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক বাংলা দেশী দালাল আছে যারা ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করে থাকে। একেবারে হেরেম শরীফের কাছে নাহলে মাথাপিছু পাঁচ শত রিয়েলের মধ্যেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। এবিষয় ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঘরের সন্ধান ও ঘর ভাড়া করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে : তাহাজ্জুদ সহ ছয় ওয়াক্ত নামায যাতে হেরেম শরীফে পড়া যায় সেইমত দূরত্বের বাইরে ঘর ভাড়া করা কোনমতেই যুক্তি যুক্ত নয়।

সাবধানতা :

প্রথমে মক্কা শরীফে নেমে অনেকেই টাকা পয়সা সহ তাওয়াফ করার জন্য হেরেম শরীফে যান। এই সময় সমগ্র এলাকা ভিড়ে ঠাসা থাকে। আর এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্থ লোক পকেট মারা, ব্যাগ কেটে নেওয়ার কাজ করে থাকে এই গভীর জনসমাবেশের সুযোগ নিয়ে। এরা সকলেই বিদেশী। তাই অনেকেই প্রথম দিনেই সর্বস্ব খুইয়ে হাহাকার করতে থাকেন। সুতরাং সাবধান হতে হবে। টাকা পয়সা কোমরের বেল্টে রেখে সাবধান থাকতে হবে, অথবা মোয়াসসেসার অফিসে টাকা জমা দিয়ে দিতে হবে। টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিতে হবে। পরে সুবিধা মত টাকা নিয়ে নেওয়া যাবে। নিজের কাছে রাখলে কোন ভাবেই আলগা রাখা যাবে না।

এখন থেকে হজ্জ পর্যন্ত আল্লাহর ঘর নয়ন ভরে দেখা ছাড়া কোন কাজ নেই। শুধু একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা, আরাধনা করাই জীবনের একমাত্র ব্রত। এমনি করে হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের দিন এগিয়ে আসবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজের প্রধান ফরজ রোকনের জন্য প্রস্তুতি

হজের মূল অনুষ্ঠান ৭ যিলহজ থেকে ১২ যিলহজের করণীয় বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বে হজের ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নতগুলি জানা দরকার।

ক. হজের ফরজ :

হজের ফরজ তিনটি :

(১) মিকাত থেকে এহরাম বাঁধা। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশী হাজিদের 'ইয়ালাম লাম' পাহাড়ের সীমানার মধ্যে বা তার পূর্ব থেকে এহরাম বাঁধা।

(২) ৯ই যিলহজ দুপুরের পর থেকে ১০ই যিলহজ সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকা।

(৩) ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ তারিখে মীনা থেকে মক্কাশরীফ গিয়ে আল্লাহ্‌র ঘর (কাআবাঘর) তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা। একে তাওয়াফে যিয়ারাত বলে।

এই তিনটি ফরজের মধ্যে যে কোন একটি না করলে বা না করতে পারলে হজ হবে না।

খ. হজের ওয়াজেব :

নিম্নলিখিত কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে হবে। কারণ এই কাজগুলি হজের ওয়াজেব বা বাধ্যতামূলক করণীয় কাজ। এগুলি না করতে পারলে বা কোনটি বাদ পড়ে গেলে হজ হয়ে যাবে কিন্তু দম (কোরবাণী) দিতে হবে।

(১) সায়ী করা, অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তায় সাতবার দৌড়ান।

(২) মীনায় রমী (নিক্ষেপ) করা অর্থাৎ শয়তানকে কাঁকর মারা।

(৩) ৯ই যিলহজ সূর্যাস্তের পর আরাফাত প্রান্তর থেকে ফেরার সময় মোযদালেফায় কিছু সময় অপেক্ষা করা।

(৪) শয়তানকে কাঁকর মারা ও কোরবাণীর পর মস্তক মুণ্ডন করা।
(৫) তামাত্তো ও কেরান হজকারীর কোরবাণী করা।
(৬) যাঁরা মক্কার অধিবাসী নন তাঁদের বিদায়ী তাওয়াফ করা।

গ. হজের সুন্নত ঃ

হজের সুন্নত পনেরটি ঃ

(১) এহরাম বাঁধার নিয়তে গোসল (স্নান) করা। (২) এফরাদ কিংবা কেরান হজকারীদের তাওয়াফে কুদুমে রমল ও এযতেবা করা (বীরবিক্রমে চলা)। (৩) ইমামের জন্য তিন জায়গায় খোতবা দেওয়া এবং সে খোতবা শোনা—(৭ই যিলহজ মক্কাশরীফে, ৯ই যিলহজ আরাফাতের ময়দানে) এবং ১১ই যিলহজ মীনার তাঁবুতে থাকা। (৪) ৮ যিলহজ মক্কাশরীফ থেকে মীনায় গিয়ে যোহর, আস্‌র, মাগরিব, এশা ও ৯ যিলহজ ফজরের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামায পড়া এবং মীনায় রাত্রিযাপন করা। (৫) ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর মীনা থেকে আরাফাত ময়দানে অবস্থানের জন্য যাত্রা শুরু করা। (৬) ৯ই যিলহজ আরাফাত ময়দানে অপেক্ষা করে সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে মোজদালেফার দিকে যাত্রা শুরু করা। (৭) ৯ই যিলহজ দিনগত রাত্রে মোজদালেফায় অপেক্ষা করা। (৮) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য যোহরের পূর্বে গোসল করা। ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ দিনগত রাতে মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা। (১০) মীনা থেকে মক্কাশরীফ ফিরবার সময় পথে মোহাচ্ছাব নামক জায়গায় কিছু সময় অবস্থান করা। (১১) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। (১২) তাওয়াফ করার সময় প্রত্যেক চক্করে রোকনে ইয়েমিনী ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। মনে রাখতে হবে যে এ কাজ দুটি করার সময় ধাক্কাধাক্কি করা নিষেধ। কাউকে ধাক্কা দেওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ। (১৩) সায়ী করার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কিছুটা আরোহণ করা। (১৪) সায়ী করার সময় বাতনুল-ওয়াদী (সবুজ আলো দ্বারা চিহ্নিত অংশ) দৌড়ে পার হওয়া এবং বাকী অংশ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাতায়াত করা। (১৫) প্রত্যেক সাতচক্কর তাওয়াফের পর দু রাকাআত নফল নামায পড়া। এই সুন্নত বাদ পড়লে দম দিতে হবে না।

ঘ. হজের প্রস্তুতি শুরু ও ৭ যিলহজের করণীয় ঃ

৭ই যিলহজ যোহরের নামাযের পর হেরেম শরীফে ইমাম সাহেব খোতবা পড়বেন। খোতবার মধ্যে প্রথম সাতবার তকবীর পড়বেন। এরপর

করুণাময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে প্রিয় নবীর উপর দরূদ পড়ে হজ্জের আহকাম বর্ণনা করবেন। যাঁরা এই আরবী খোৎবা বুঝতে না পারবেন তাঁরা একাগ্রতার সঙ্গে এই খোৎবা শুনবেন এবং আল্লাহ্‌র শোকরিয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করে ভক্তি বিহ্বল চিত্তে হজ্জের কর্তব্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন হবেন। পরে নিজ নিজ দলের আমীরের কাছে বিষয়টি জেনে নিতে পারলে ভাল নইলে অনুতপ্ত হবেন।

যাঁরা কেরান বা এফরাদ হজ্জের নিয়ত করেছেন তাঁদের তো এহরাম বাঁধাই আছে। এঁদের আর এহরাম খুলতে হবেনা বা নতুন করে এহরাম বাঁধতে হবেনা। আর যাঁরা তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে মক্কা শরীফে পৌঁছে তাওয়াফ ও সায়ী সেরে মাথা মুড়িয়ে এহরাম খুলে ফেলেছিলেন তাঁরা আজ (৭ই যিলহজ্জ) দিনে বা রাতে যে কোন সময় আবার হজ্জের নিয়ত করে এহরাম বাঁধবেন। এহরাম বাঁধার নিয়ম আগের মতই। এই এহরাম মক্কা শরীফের সীমানায় মধ্যের যে কোন জায়গায় বা নিজের থাকার জায়গায় বাঁধা যায়। তবে মসজিদে হেরেমের মধ্যে বিশেষতঃ হাতিমের মধ্যে বসে বাঁধতে পারলে উত্তম। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন ভাবে অন্যের কষ্টের কারণ হওয়া অনুচিত কাজ। হযরত নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহেস সালাম এবং সাহাবিগণ বিদায় হজ্জের সময় আতবাহ নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং হুজুরের নির্দেশ মত ওখানেই এহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ্জ ঐস্থান থেকেই মীনা যাত্রা করে-ছিলেন। নবী (সাঃ) সাহাবিগণকে আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে এসে এহরাম পরার নির্দেশ দেননি বা মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় তাওয়াফেরও নির্দেশ দেননি। যদি আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে এহরাম বাঁধার নিয়মই শরীয়তের বিধান হত তা হলে তিনি তা সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন। তবে যেহেতু আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে বা মসজিদে হেরেম সর্বাধিক বরকতময় জায়গা তাই অন্যের কষ্টের কারণ না হলে এখানে এহরাম বাঁধায় কোন নিষেধের বিধান নেই। নিজ বাসায় বা হেরেমের মসজিদে যেখানেই হোক এহরাম বেঁধে মসজিদে হেরেমে উপস্থিত হয়ে একটি তাওয়াফ করে মাকামে ইব্রাহীমে নিয়ত করে দুরাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফের নামায পড়তে হবে। এরপর হাতিমে, সম্ভব না হলে হেরেমের মধ্যে যে কোন জায়গায় দুরাকাত সুন্নাতুল এহরামের নামায পড়ে একান্ত ভক্তি ভরে নিয়ত করতে হবে :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি ওরিদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।)

বাংলায়ঃ হে আল্লাহ্! আমি হজ করার মনস্থ করলাম তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার এ কাজকে তুমি কবুল (গ্রহণ) করে নাও।

৮ যিলহজ্জ থেকে ১০ যিলহজ্জ জামারতুল আকবায় কাঁকর মারা পর্যন্ত অধিক পরিমাণ তালাবিয়া পড়তে হয়।

এইভাবে এহরাম বেঁধে হজের নিয়ত করে পুনরায় নফল তাওয়াফ করে নেওয়া উত্তম। এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল ও এজতেবা করলে এবং তাওয়াফ শেষ করে সাফা মারওয়ায় সায়ী করে নিলে হজের পরে আরাফাত থেকে ফিরে আসার পর যে তাওয়াফে যিয়ারাত করতে হয় তাতে পুনরায় রমল এজতেবা ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয় না। হজের পরে তাওয়াফে যিয়ারাত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয় বলে অসম্ভব রকম ভিড় হয়। এই ভিড়ের চাপে অনেকের পক্ষেই ঐ সময় তাওয়াফে যিয়ারাতে রমল এজতেবা ও সায়ী করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়তে পারে। তাই সাবধানতা হিসাবে এটা আগে থেকে করে রাখা সুবিধাজনক।

ঙ. ৮ যিলহজ করণীয় ও মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা ঃ

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মক্কা শরীফ থেকে মীনার পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে গাড়ীর সুবিধার জন্য ভোর রাত্রেই যাত্রা শুরু করতে হয়। তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোক এই সময় মীনা যাবেন সুতরাং রাস্তায় গাড়ী জ্যাম হয়ে যায় বলে অনেকেই আগে ভাগে পৌঁছানর জন্য ভোরে রওয়ানা দিয়ে মীনাতে পৌঁছে ফজরের নামায পড়েন। রাস্তায় উচ্চস্বরে তালাবিয়া (লাব্বায়েক....) পড়তে পড়তে অগ্রসর হতে হবে। মক্কা শরীফ থেকে মীনা মাত্র তিন মাইল (৪'৮৩ কি. মি.) পথ। হেঁটে বা মোটর গাড়ী, বাস বা জি এম সী গাড়ীতে যাওয়া যায়। হেঁটে যাওয়ার জন্য সৌদি সরকার বিশেষভাবে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই রাস্তার উপর

শেড দেওয়া আছে এবং অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেসিন বসান আছে। ফলে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর নয়। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই পথ হেঁটে যাতায়াত করতেন বলে হেঁটে মীনা-মক্কা যাওয়া আসা বিশেষ পুণ্যের কাজ। মীনাতে এই সময় বহু অস্থায়ী খাবারের দোকান বসে তা ছাড়া মসজিদে খায়েফের একটু আগেই স্থায়ী বাজারও আছে। তবে এখানে এই সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সুযোগ মত বহু ব্যবসাদারই হাজিদের কাছ থেকে অধিক মূল্য নিয়ে থাকেন। মক্কা শরীফ থেকে মীনা যাত্রার সময় সঙ্গে যেসব জিনিষ দরকার :—

৪।৫ দিনের জন্য হালকা শুকনো অল্প কিছু খাবার যা একান্ত প্রয়োজনে দরকার হতে পারে। এখানে তাঁবুর মধ্যে রান্না করা নিষেধ। তাছাড়া তাঁবুর মধ্যে রান্না করার ঝুঁকি নেওয়াও খুবই বিপদজনক। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তাঁবু খাটান আছে। কোন ভাবে আগুন লাগলে ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তাই কিছুতেই এই ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ নয়। তবে তাঁবুর কাছাকাছি সরকারী ভাবে রান্নার জায়গা করে দেওয়া আছে। যেখানে সরকারীভাবে রান্না করার জায়গা করে দেওয়া আছে কেবলমাত্র সেখানেই রান্না করতে পারা যাবে।

প্রত্যেকের একটা বদনা বা কেটলি ; দলের সকলের জন্য একটি বা দুটি বালতি ; মাটিতে পাতার একটা খুব হালকা সতরঞ্জি বা হাজিম্যাট, প্রত্যেকের একটি করে নিজ নিজ বিছানার চাদর, একটা ছুরি, ছাতা, এহরাম বদল করার জন্য অতিরিক্ত এক সেট এহরামের কাপড়, এহরাম খুলে পরার জন্য সাধারণ কাপড়, এবং টুপি ও আতর সঙ্গে নিতে হবে। সকলে একত্রে রান্না করার মত এক সেট রান্নার সরঞ্জাম। অথবা এই ক'দিন রান্না করার ঝুঁকি না নিয়ে হোটেলের তৈরী খাবারও খাওয়া যায়। সামান্য কিছু বেশী পয়সা খরচ হলেও এতে ঝামেলা খুবই কম। এখানে তাঁবু থেকে বের হতে গেলে দলবদ্ধ ভাবে দলনেতার সঙ্গে বের হতে হবে। কারণ অসংখ্য একই রকম তাঁবুর মধ্যে হারিয়ে গেলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। হারিয়ে গেলে ভারতীয় পতাকা লক্ষ্য করে ভারতের অফিসে চলে যেতে হবে। সেখানে সঙ্গের কার্ড দেখালে রাজ্যের ওয়েল ফেয়ার অফিসার বা অন্য কোন লোক আপনাকে আপনার তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কখনই রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন না। এখানকার প্রশাসন খুবই শক্ত। যে কোন সময় সৌদী পুলিশ সন্দেহ করলেই গ্রেফতার করতে পারে। ভাষা সমস্যার জন্য এ ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধায় পড়তে

হয়। মীনাতে অবস্থিত মসজিদে খায়েফ বা একান্ত অসুবিধা হলে নিজের তাঁবুতেই যোহর' আস্বর, মাগরিব এশা এবং ৯ই জিলহজ্জ ফজরের নামায পড়তে হবে। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনাতে পড়া সুন্নত। মসজিদে খায়েফ বর্তমানে বিরাট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুশোভিত মসজিদ। মীনা একটি জায়গার নাম। মীনা শব্দের অর্থ 'প্রবাহিত'। এই মীনাতেই কোন জায়গায় হযরত আদম (আঃ) এর কবর আছে বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়াও আরও সত্তর জন নবীর কবর এই মীনাতেই আছে। বর্তমানে এ সবের কোন চিহ্ন নেই। মীনা এখন একটি সর্বাধুনিক শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। চারিদিকে চমৎকার নয়নাভিরাম রাস্তা ঘাট নির্মিত হয়েছে। মীনায় ৮ তারিখ যোহর' আস্বর' মাগরিব, এশা এবং ৯ তারিখ ফজরের নামায পড়তে হবে।

মীনায় প্রত্যেক নামায সুন্নত মোতাবেক পড়ার নিয়ম হল— মাগরেব এবং ফজর ছাড়া বাকী নামায কসর পড়তে হয়। মাগবের ও ফজরের কসর নেই। এ ব্যাপারে মক্কার বাসিন্দা ও বহিরাগতের জন্য একই নিয়ম। নবী (সাঃ) মীনা আরাফা ও মুযদালেফায় মক্কা বাসী ও অন্যান্য সকলকে নিয়েই কসর নামায পড়েছেন।

চ. ৯ যিলহজ্জ আরাফাতে রওয়ানা ও অবস্থান

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় হলে মীনা থেকে আরাফাত রওয়ানা হতে হবে। যদি মোয়াসসেসার গাড়িতে যাওয়ার আয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তাদের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করে ধীর স্থির ভাবে কোন লোককে ধাক্কা না দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মহা প্রান্তর আরাফাতের উদ্দেশ্যে বাসে আরোহণ করতে হবে। নইলে নিজেরা কোন গাড়ী ভাড়া করে তাতে চলে যেতে হবে।

এই সময় অধৈর্য হওয়া বা অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি মোয়াসসেসার গাড়ীতে যাওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে টাকা জমা দেওয়া থাকে তাহলে স্থির নিশ্চিন্ত থাকুন গাড়ী ঠিক এসে আপনাদের নিয়ে যাবে। অসম্ভব ভিড়ে রাস্তা ঘাট জ্যাম থাকে বলে অনেক সময় গাড়ী আসতে দেরী হয়ে যায়। এতে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়ার দরকার নেই। আর যদি মোয়াসসেসার গাড়ীতে যাওয়ার জন্য টাকা জমা না দিয়ে থাকেন তাহলে ফজরের পরেই বের হয়ে নিজেরা গাড়ী ভাড়া করে নেবেন। সামনের সব রাস্তাতেই ভাড়ার গাড়ী পাওয়া যাবে। মোয়াসসেসার গাড়ীতে

না গিয়ে নিজেদের উদ্যোগে ভাড়া গাড়ীতে গেলে স্বাধীন ভাবে নিজ ইচ্ছায় যাওয়া যায়। তবে মোয়াসসেসার তুলনায় কিছু বেশী খরচ হয় এবং অনেক সময় গাড়ী পাওয়ারও অসুবিধা হয়। তবুও এটা সুবিধাজনক।

আরাফাত শব্দের অর্থ পরিচয় বা চেনা। এখানে বিবি হওয়া এবং হযরত আদমের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। এই প্রান্তরেই তাঁরা একে অপরকে চিনতে পেরেছিলেন। বেহেশত্ থেকে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর কঠিন জীবন শুরুর সূচনা করিয়েছিলেন এই মহা প্রান্তরে তাঁদের পরস্পরের পরিচয় ঘটিয়ে। আর এখানেই আল্লাহ্র ফেরেশতা (দেবদূত) হযরত জিব্রাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহ্র নবী হজরত ইব্রাহীম (আঃ সাঃ) কে হজের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে অর্থে আরাফাত অর্থ হল শিক্ষা।

আরাফাত মীনা থেকে ৯.৬৬ কি.মি. দূরে দক্ষিণ পূর্ব কোনে এক বিশাল শুষ্ক পাহাড় ঘেরা বালুকাময় প্রান্তর। সূর্যোদয়ের পর শুরু করলে পায়ে হেঁটেই দ্বি-প্রহরের আগে পৌঁছান যায়। তবে সাবধান থাকা ভাল যে প্রচণ্ড গরমে রোদ লেগে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় ফলে হজের কাজগুলিই করা যাবে না। তাছাড়া এই সময় লু-লেগে অনেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সে জন্য গাড়ীতে যাওয়াই ভাল। আরাফাতের রাস্তায় তওবা, এসতাগফার, দরূদ, তালবিয়াহ ও তাকবিরে তাশরিক পড়তে হবে।

৯ই যিলহজের তকবীরে তাশরীক :—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার, ওয়ালিল্লাহিলহামদ।)

বাংলায় ঃ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।"

মীনার বাজার থেকে কিছুদুর যাওয়ার পর সবীর নামে একটি পাহাড় পড়ে। সবীর পাহাড় অতিক্রম করার পরই রাস্তাটি দুভাগ হয়ে আরাফাতের দিকে গেছে। একটি রাস্তার নাম দাইয়োন, অপরটির নাম মাজায়েন।

দাইয়্যেন রাস্তা দিয়ে আরাফাত যাওয়া হয় এবং মাজায়েন রাস্তা দিয়ে আরাফাত থেকে ফিরে আসতে হয়। এই ভাবে তুই রাস্তায় যাতায়াত করা সুন্নত। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ড্রাইভারের ইচ্ছাধীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আরাফাতের ময়দানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছুলে জাবালে রহমত দেখা যায়। এই সেই জাবালে রহমত যেখানে হযরত আদম নিজের অপরাধের জন্য তিনশত বছর সেজদায় থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌ সেই ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। এবং এখান থেকে আরাফাত প্রান্তরে নেমে তাঁর বিবি হাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। এই পাহাড় দোওয়া কবুলের জায়গা। জাবালে রহমত যখন দৃষ্টি পথে পড়বে তখন নিম্ন দোওয়াটি পড়া যেতে পারে।

আল্লাহুম্মা এলাইকা তাওয়াজ্জাহতো ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতো ওয়া অজহাকা আরাদতো, আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াতুব আলাইনা ওয়া আতেনী সুওলী ওয়া ওয়াজ্জিহ লিল খায়রে হায়সো তাওয়াজ্জাহতো সোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদো লিল্লাহে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহু আকবর।)

মোয়াসসেসার গাড়ী তাদের নিজ তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। বাস থেকে নেমে সোজা নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে হাজি ম্যাট বা সতরঞ্চী বিছিয়ে নামাযের মোসাল্লা (জায়নামায) পেতে এবাদাত শুরু করতে হবে। যারা ভাড়া করা গাড়ীতে যাবেন তাদের নেমে ভারতীয় তাঁবুর এলাকা জেনে সেখানে পৌঁছে নিজের মোয়াসসেসা নম্বর অনুযায়ী তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে।

এই সময় সমগ্র প্রান্তর এক আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় তন্ময় হয়ে এক বিহ্বল অবস্থার রূপ ধারণ করে। চারিদিক থেকে সুমধুর স্বরে লাব্বায়েক, (আমি উপস্থিত) লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। আর এই শব্দ ব্যঞ্জনা এক মোহময় আবেশ তৈরী করে। অসংখ্য জনমণ্ডলী এই দিনে উপস্থিত হয় এই মরুপ্রান্তরে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাজির হয় এখানে। প্রত্যেকের উচিৎ আকুল আবেদনে বুক ভাসিয়ে নিজের পাপরাশি ও দায়িত্ব পালন না করতে পারার জন্য বিশ্ব স্রষ্টার দরবারে ক্ষমা চাওয়া। আজকের এবাদাতের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে যেভাবে পারেন আল্লাহ্‌র আরাধনা করতে পারেন। একান্ত হয়ে ভাবতে হবে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে করুণা চাওয়াই একমাত্র কর্তব্য। হৃদয়ের সমূহ আবেগ,

সমূহ বাসনা কামনার জন্য বিশ্ব পালকের দরবারে প্রার্থনাই আজকের এবাদাত (আরাধনা)।

এই প্রান্তরেই ভুবন বিখ্যাত মসজিদ 'নামেরা'। এখান থেকে খোত্বা দেবেন ইমাম সাহেব। সম্ভব হলে এখানে এবাদাত করতে পারেন। মসজিদে গিয়ে অন্তত দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিৎ। এই ময়দানেই বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্বে মুসলমানদের জন্য যে উপদেশ বাণী উচ্চারণ করে গেছেন আজও যেন চার পাশের পাহাড়ে তারই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে। সে ধ্বনি স্তব্ধ হবেনা পৃথিবীর মহা প্রলয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত। জাবালে রহমতের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিদায় হজ্বে বিশ্বমুসলিমের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন সেই স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য জাবালে রহমতের সেই জায়গায় একটি সাদা উচ্চ স্তম্ভ করা হয়েছে। এটি একটি প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার স্থান। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর শেষ বাণী উচ্চারিত হওয়ার পর এই জাবালে রহমতের উপরই বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর উদাত্ত অভিনন্দন বাণী ঘোষিত হল : **"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।"** (—আল কোরআন)

৯ যিলহজ্ব দুপুরের পর থেকে ১০ যিলহজ্ব ফজরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। আর ৯ যিলহজ্ব দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতে থাকা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করলে একটি বকরা বা দুম্বা 'দম' (কোবরাণী) দেওয়া ওয়াজিব। ঐ সময়ের যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় এখানে উপস্থিত থাকলেই হজ্বের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। এমনকি আরাফাতের সীমানার মধ্যে পীড়িত, নিদ্রিত অথবা অজ্ঞান অবস্থায় থাকলেও হজ আদায় হয়ে যাবে। ঐ সময়ের মধ্যে আরাফাতের ময়দানের উপর থেকে হেঁটে গেলেও হজ আদায় হয়ে যাবে।

ছ. আরাফার ময়দানে হজের দিন যোহর ও আস্বরের নামাযের জামাআতের নিয়ম :

এই দিন মসজিদে নামেরায় বাদশাহ্ জামাতে নামায পড়বেন। যাঁরা এই মসজিদে নামায পড়তে আগ্রহী তাঁদের আগে ভাগে মসজিদে পৌঁছে

যাওয়া ভাল। এই মসজিদে প্রচণ্ড ভিড় হয়। ফলে পরবর্তী সময় কোথাও তিল ধারণের জায়গা থাকে না। মসজিদটি বিরাট এলাকা জুড়ে এক বিশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ। এই মসজিদের কিছু অংশ আরাফাতের এলাকার বাইরে পড়ে। তাই সাবধান থাকতে হবে নিজের অবস্থান যেন আরাফাতের ময়দান এলাকার বাইরে না হয়। মসজিদের মধ্যে নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত দরূদ এসতাগফার ইত্যাদি এবাদাত বন্দেগীতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা একান্ত কর্তব্য। এইদিন মানবের জন্য একটি নতুন নির্দ্দেশ আছে—তাহ'ল এই জামাআতে যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আস্বরের নামায একসঙ্গে পড়তে হবে। এটাই শরীয়তের নির্দ্দেশ। শর্ত হ'ল এই মসজিদে বাদশাহ বা তাঁর নিয়োজিত ইমামের সঙ্গে জামাআত করে এই দুই নামায একত্রে আদায় করতে হবে। নইলে দু'ওয়াক্ত একত্রে পড়া জায়েজ হবে না। যোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আস্বরের ওয়াক্তে আস্বরের নামায পড়তে হবে।

৯ তারিখ যখন সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে যাবে তখন ইমাম স্বয়ং বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত জনমণ্ডলীর জন্য সময়োপযোগী খোত্বা পড়বেন এবং হাজিদের জন্য ঐ দিন ও পরদিনের করণীয় বিষয়গুলির শরীয়ত সম্মত বিধান দেবেন ; আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলা ও তাওহীদ সম্পর্কীয় মাসলা মাসায়েল বর্ণনা করবেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে আরাধনা ও সৎ আমলের উপদেশ দেবেন এবং ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করবেন। ঐ খোত্বায় নবী (সাঃ)-এর সুন্নতকে সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে চলার জন্য অসিয়ত করবেন। নিজের সকল কাজ কোরআন হাদিস মোতাবেক সম্পন্ন করার উপদেশ দেবেন। সর্ববিষয় আল্লাহ্‌র কেতাব কোরআন ও রাসূলের বাণী হাদিসকে চূড়ান্ত মিমাংসাকারী রূপে গ্রহণ করার আহ্বান জানাবেন। এই খোত্বা আরবী ভাষায় পড়া হবে। না বুঝতে পারলেও একাগ্র হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে এ খোত্বা শুনতে হবে।

আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। তবে আরাফাতের মাঠে এখনও সর্বত্র যথেষ্ট পরিমাণ পানি পাওয়া যায়না। সরকার পানি ভর্তি বহু গাড়ী বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখেন। বালতি নিয়ে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। তাঁবুর ভিতরেও পানি পাওয়া যায়। কিন্তু বহু লোকের ভিড়ের জন্য তা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর হয়। তাই রাস্তায়

অপেক্ষারত গাড়ী থেকে বালতি ভরে পানি সংগ্রহ করা শ্রেয়। এই পানি এনে গোসল করা যায়। ভবিষ্যতের জন্য সমগ্র আরাফাতে যাতে কল খুলেই পানি পাওয়া যায় সেজন্য পাইপ লাইনের কাজ চলছে।

সূর্য হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেব মসজিদে নামেরা থেকে সংক্ষিপ্ত খোত্বা পড়ে বসবেন। এবার মোয়াজ্জেন আযান দেবেন এবং ইমাম দ্বিতীয় খোত্বা পড়া শেষ করলে মোয়াজ্জেন একামাত বলবেন। এবার ইমাম সাহেব যোহরের নামায আরম্ভ করবেন। এ নামায কসর নামায। যোহরের নামায শেষে মোয়াজ্জেন আবার একামাত বলবেন এবং আস্বরের নামায আরম্ভ করবেন। এটাও কসর নামায। এইভাবে যোহর ও আস্বরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও দুই একামাতে কসর সহ একত্রে পড়তে হবে।

এবার আরাফাতে অবস্থানের পালা। ওরনার অংশ ছাড়া সমগ্র আরাফাত প্রান্তরই অবস্থান স্থল। যদি সহজ ও সম্ভব হয় জাবালে রহমত পাহাড়কে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে বসা আর যদি জাবালে রহমত না জানার জন্য বা সামনে রাখার মত জায়গা না পাওয়ার জন্য অন্যত্র অবস্থান করতে হয় তাহলে কেবলামুখী হয়ে বসলেই চলবে। এখানে বসে আল্লাহ্‌র যেকের, প্রার্থনা দোওয়া দরূদ পড়া ও কাঁদাকাটা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। এখানে দোওয়ার সময় দুহাত তুলে দোওয়া চাইতে হয়। নিজের জন্য, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন, দেশবাসী ও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দুহাত তুলে দোওয়া চাইতে হবে। এছাড়া এই অবস্থানের সময় লাব্বায়েক পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা, অতি উত্তম। নিজের কৃত অপরাধ স্মরণ করে প্রার্থনা করা ও আল্লাহ্‌র কাছে তা মঞ্জুর হওয়ার আশা করতে হবে।

এই মহান মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিজেকে দোওয়া ও যেকেরের মধ্যে সর্বক্ষণ মশগুল রাখা বাঞ্ছনীয়। হযরতের উপর ও পূর্ববর্তী নবীগণের উপর দরূদ পড়া, বারবার আল্লাহ্‌র দরবারে বিনম্রভাবে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে চাওয়ায় নিজেকে আত্মস্থ রাখতে হবে। নবী সাল্লালাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দোওয়া করতেন প্রত্যেক দোওয়া তিনবার বলতেন।

হযরতের অনুকরণে একান্ত দীনহীনভাবে নিজের যাবতীয় প্রার্থনা আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করে আবেদন নিবেদন করতে হবে। তা যাতে কবুল হয় তার জন্য কাকুতি মিনতি করে অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে ফেলতে হবে।

আল্লাহ্‌র রহমত ও ক্ষমার আশায় অধীর হয়ে তাঁর গযব ও আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হবে ও সর্বক্ষণ নিজকৃত অন্যায় অপরাধ ও গোনাহের কথা স্মরণ করে এসতাগফার পড়ে তওবা করতে হবে। এই দিন বড়ই মর্যাদার। এই বিপুল সমাবেশে তওবা কবুল হওয়ার এক শুভ মুহূর্ত। এদিন আল্লাহ্‌তাআলা নিম্ন আসমানে অবতরণ করেন ও তাঁর অনুগ্রহের দরজা সমবেত জনমণ্ডলীর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ও অধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই করে দেন।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এইদিন অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যেকের ও দরূদ পাঠ করা এবং সর্বপ্রকার পাপমুক্তি ও কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এইভাবে হাজিগণের একান্ত বিনম্র ভাবে, একাগ্রতা সহকারে, আল্লাহ্‌র কাছে দুহাত তুলে প্রাণের আকুতি দুঃখবেদনা নিবেদন করা দরকার। এইভাবে প্রার্থনার মধ্যে আত্মস্থ থেকে সূর্যাস্তের পর-ধীর পদক্ষেপে প্রশান্ত হৃদয়ে, গম্ভীর ও শান্ত হয়ে আরাফাত থেকে মুযদালেফার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। যদি মোয়াসসেসার বাসে যাওয়ার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে থাকেন তাহলে তাঁবুর মধ্যেই বাস আসবে আর নইলে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে গাড়ী ভাড়া করে চলে যেতে হবে। প্রত্যেক মোয়াসসেসায় এদিন দুপুরে সৌদি সরকারের তরফ থেকে সকল হাজিকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। সূর্যাস্তের ঘন্টাখানেক আগে থেকে সমবেত প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া নিজেরাও দলবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করা যায় কিংবা একা একাও প্রার্থনা করা যায়।

জ. আরাফাতের মোনাজাত

আরাফার মাঠে অবস্থানের সময় আল্লাহ্‌র রহমত হৃদয়ঙ্গম করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠিয়ে দোওয়া চাওয়ার জন্য এখানে কোরআন শরীফে উল্লিখিত কিছু প্রার্থনামূলক আয়াত ও মাকবুল দোওয়া সমূহকে বাংলায় একত্রিত করা হলো। যাঁরা আরবীতে দোওয়া করতে পারবেন না তাঁরা বাংলাতেই এইভাবে দোওয়া করতে পারবেন। আল্লাহ পাক সকলের ভাষা, মনের আকুতি শুনে থাকেন। দুহাত তুলে দলবদ্ধ ভাবে বা একক-ভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করুন :

'ওগো দয়াময় প্রভু আল্লাহ্‌!' তুমিই তোমার কাছে প্রার্থনা করতে

বলেছ। আর তা কবুল করার ওয়াদা করেছ। তুমিই বলেছ "আমার কাছে চাও, আমি তা কবুল করব।"

"ওগো আমার প্রভু আল্লাহ্! আমার প্রার্থনা কবুল করো। তোমার অনুগ্রহ, তোমার রহমতে আমার সব কাজকে সহজ করে দাও! ওগো আল্লাহ্, আমি এই বরকতময় সফরে এই পবিত্র আরাফায় তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদের সকল প্রকার সৎ ও মহৎ কাজকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও। তুমিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী! তোমার সাহায্য, তোমার করুণা ছাড়া আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তুমি আমাদের ও আমাদের সন্তান সন্ততি, আত্মীয়, পরিবার, পরিজনদের রক্ষাকর্তা। তুমি তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তাদের রক্ষা করো! তাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিও। আমাদের এই মোবারক সফরে এই পুণ্যময় আরাফার ময়দানে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘোষণা করছি : তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, কোন প্রভু নেই, আর হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো ওয়ালায়হে অসালাম অবশ্যই তোমার নবী ও রসূল।

ওগো দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক! তোমার অপার করুণা ও অনুগ্রহে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমার এই উপস্থিতির ও সফরের সকলপ্রকার বেয়াদবি ও ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিও। হে রাহমানুর রাহীম! তুমি আমাকে গর্ব ও অহঙ্কারের হাত থেকে বাঁচিও! ঋণগ্রস্থ হওয়া থেকে বাঁচিও, শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করো, কুৎসাকারীর কুৎসার ক্ষতি থেকে রক্ষা করো, সবরকম কলহ বিবাদ বিসংবাদ থেকে রক্ষা করো। ইয়া আল্লাহ্, তুমি সমস্ত মুসলমানকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিও। দুনিয়ার মুসলমানের জানমাল হেফাজত করো।

হে আমার প্রভু আল্লাহ! আমাদের নামায, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্জ, আমাদের যাকাত, আমাদের কোরবানী, আমাদের জীবনমৃত্যু সবই তোমার জন্য। আমরা তোমার সন্তুষ্টি, তোমার অনুগ্রহ, তোমার রহমতের প্রার্থী। তুমি আমাদেরকে তোমার সমস্ত রকম নেয়ামত দান কর।

হে আল্লাহ্! তোমার এই পবিত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা তোমার দরবারে তোমার ক্ষমার আশায়, তোমার অনুগ্রহের আশায়, আমাদের তওবা কবুলের আশায় হাত উঠিয়েছি। তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনছ, আমাদের মনের কথা শুনছ। এই পবিত্রভূমির বরকতে আমাদের প্রার্থনা কবুল করে

নাও। এই পবিত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে সকলেই তোমার কাছে প্রার্থনা করছে। এ প্রার্থনা মঞ্জুর করার মালিক একমাত্র তুমিই। এই দিন তোমারই বরকত ও তোমারই খাস রহমতের দিন। আমাদের এখানকার এই অবস্থানকে জীবনের শেষ অবস্থান করোনা। বার বার তোমার এই খাস রহমতের জায়গায় হাজির হওয়ার তওফিক দান করো। হে আল্লাহ্! আমাদের বিশুদ্ধ জীবন দান করো এবং তোমার প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী করো। ইয়া আল্লাহ্, তুমি পরম করুণাময় ও পরম পবিত্র, তোমার পবিত্রতা ও অনুগ্রহের বিশালতা জানার ক্ষমতা আমার নেই। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ ও করুণা-দাতা, তুমিই প্রত্যাশাপূরণকারী। তুমি আমাদের শান্তি, স্থিতি ও ক্ষমা দান করো। আমার এ জীবন তোমারই আমানত, তোমারই হেফাজত প্রার্থী! তুমি আমাদের দ্বীন ইসলামের উপর কায়েম রেখো

ওগো আসমান জমিনের স্রষ্টা প্রভু আমার! তুমি আমার এ প্রার্থনা কবুল করো এবং আমাকে খাঁটি মুসলমান হিসাবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দান কর।

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের ইহকাল ও পরকালকে কল্যাণময় করে দিও। শান্তি ও স্বস্তিতে ভরিয়ে দিও, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সবরকম দুঃখ, বিপদ, অপমান, কষ্ট, অপদস্ততা, শত্রুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে রক্ষা করো। ওগো দয়াময় আল্লাহ! তুমি আমাকে দ্বীন-ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রেখো। আমার পার্থিব জীবনকে সঠিক পথে চালনা করো; বিশুদ্ধ হালাল রুজি দান করো। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো।

ওগো দয়াময় আল্লাহ্! আমাকে চিন্তা, উদ্বেগ, আলস্য ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে রক্ষা করো। সব রকম পাপ কাজ থেকে রক্ষা করো। সব রকম পাপকর্ম থেকে বাঁচিও; ঋণের ভার থেকে মুক্ত রেখো। হে আল্লাহ্! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি থেকে রক্ষা করো—তাদের ইহকাল ও পরকালের জীবনে সৌভাগ্য দান কর। ওগো পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ! আমি আমার সব অপরাধের ক্ষমা চাইছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি।

ওগো পরওয়ারদেগার আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষত্রুটিকে ক্ষমা করো, আমাকে ভয়ভীতি, শঙ্কা থেকে রক্ষা করো। আল্লাহ্ গো! চারপাশের বিপদাপদ, ভয়ভীতির ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

করছি। তুমি আমাকে তোমার দ্বীনে আশ্রয় দিও এবং ইমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও।

হে আল্লাহ! তুমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি, সব কাজে আমার অজ্ঞতা-জনিত অপরাধসমূহ, অন্যায় ভাবে সীমালংঘনমূলক কাজকে তোমার গাফুরুর রাহিম নামের গুনে মাফ করে দাও। ওগো আল্লাহ্! তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা! আমার ছোটবড় অপরাধ, অনাচার, পাপাচারকে ক্ষমা করে দিও। ওগো ওরওয়ারদেগার প্রভু! আমি যে সকল গোনাহ, পাপ, অন্যায় আগে ও পরে প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছি সবই তোমার জানা। প্রভুগো, সর্ববিষয় তোমার জানা—সর্ববিষয়ে তুমি ক্ষমতাবান, তুমি আমার ঐ সকল গোনাহ মাফ করে দিও। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে দ্বীনের কাজে অনড়, অবিচল রেখো—সৎপথে পরিচালিত করো। আমি তোমার দরবারে তোমার নেয়ামতের শোকর করছি। আমাকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সঠিকভাবে তোমার এবাদাত করার তাওফিক দান করো। তুমি আমাকে সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি দিও। হে আল্লাহ্! আমার সকল গোনাহ মাফ করে দাও—আমার অন্তর থেকে ক্রোধ দূর করে দাও।

হে আল্লাহ্! তুমিই পৃথিবী, নভোমণ্ডল ও মহান আরশের প্রভু! তুমিই মৃতকে জীবিত কর, জীবিতকে মৃত কর, তুমিই বীজ থেকে ফসলের উদ্ভব ঘটাও; তুমিই তো তাওরাত, ইনযিল, কোরআন নাযেল করেছ; তুমিই আদি অনন্ত; তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, পরেও কিছু থাকবে না; তুমি ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়া সম্ভব নয়; আমার যত ঋণ আছে তা আমাকে পরিশোধ করার ক্ষমতা দাও—দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে রক্ষা করো।

হে আল্লাহ্! আমি তোমারই আনুগত্য প্রকাশ করছি। তোমার প্রতি ঈমান আনছি, তোমারই উপর নির্ভর করছি আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। হে আল্লাহ্! আমি যেন কোনদিন পথভ্রষ্ট না হই। আল্লাহ্ গো, আমি তোমার কাছে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান আর সেই হৃদয় থেকে আশ্রয় চাইছি—যা কোন কাজে লাগে না। তুমি আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও প্রভু।

হে আল্লাহ্, আমাকে হেদায়েত দান কর। আমাকে কুস্বভাব, কুআচরণ ও কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করো। তোমার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে রেখো। হালাল রুজি আর হালাল বস্তুর মধ্যে অভাবমুক্ত রেখো। তোমার

করুণা ও অনুগ্রহে আমাকে সব অন্যায় অপরাধ ও পাপ থেকে রক্ষা কর। হে করুণাময় আল্লাহ্, আমাকে সঠিক ও সৎপথে চলার তওফিক দান কর। আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণ প্রার্থনা করছি আর সেই অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাইছি যা তোমার বান্দা তোমার নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহেস সাল্লাম চেয়েছেন।

ওগো আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে জান্নাতের প্রার্থনা জানাই আর সেই সব সৎকাজ ও বাক্যের প্রার্থনা জানাই যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। আমাকে সেই সব কাজ ও কথা থেকে বাঁচিও যা জাহান্নামের আগুনের কাছে নিয়ে যায়।

ওগো আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন ইলাহা নেই। তুমি একক ও তোমার কোন শরীক নেই। তুমি সকল প্রশংসার যোগ্য। তোমারই হাতে সব কল্যাণ নিহিত। ওগো আল্লাহ্ তুমি আমার হৃদয়ে আলো দাও, আমার শ্রবণে, আমার দৃষ্টিতে, আমার রাসনাতে আলো দাও, আমাকে সৎপথ দেখাও। হে আল্লাহ, আমার মনের সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কাজের বিশৃঙ্খলা ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। ওগো পরওয়ার-দেগার! এই বরকতময় সন্ধ্যায় আমাকে তোমার খাস রহমত, কল্যাণ ও করুণা দান কর।

হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য মঙ্গলময় বস্তু নির্ধারিত কর। ওগো আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন ইলাহা নেই, তুমি একক ও তোমার কোন শরীক নেই, সকল রাজত্ব তোমারই, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। ওগো আল্লাহ! তুমিই জীবন দান কর, তুমিই মৃত্যু দান কর, তোমারই হাতে সকল কল্যাণ নিহিত। তুমি সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কোন ইলাহা নেই, মহান ও মহীয়ান তুমি! তুমি ছাড়া কারো কোন কল্যাণ করার ক্ষমতা নেই, কারো কোন শক্তি নেই বিপদ-আপদ দূর করার।

ওগো দয়াময় আল্লাহ্! তোমাতে সকল মঙ্গল নিহিত! তুমি আমার হৃদয়ে আলো দাও, আমার শ্রবণে, আমার দৃষ্টিতে, আমার রসনাতে, আলো দাও! আমাকে সৎপথ দেখাও। হে আল্লাহ্, আমার বক্ষ সম্প্রসারিত কর, আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও! হে আল্লাহ্! আমার মনের সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কাজের বিশৃঙ্খলা এবং কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ্! দিন ও রাতের অমঙ্গল, বায়ু ও

আলোর অনিষ্ট, যুগের ও সময়ের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করো। ওগো পরওয়ার দেগার! এই বরকতময় সন্ধ্যায় আমাকে তোমার খাস রহমত কল্যাণ ও করুণা দান কর, হে পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্। ওগো পদমর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী, আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, সকল ভাষার স্বরই তুমি অবগত, সকলের আহ্বানই তোমার দরবারে পৌছায়! এই ভীষণ পরীক্ষার দিন তুমি আমাকে বিস্মৃত হয়ো না! তুমি আমার কথা শুনছ, আমার অবস্থান দেখছ, আমার প্রকাশ্য ও গোপন দোষত্রুটি জ্ঞাত আছ, আমার সবকিছুই তোমার জানা, আমি হতাশাগ্রস্ত দরিদ্র সাহায্য-প্রার্থী, আশ্রয় প্রার্থী, দয়াপ্রার্থী, আমার সকল পাপ, সকল গোনাহ স্বীকার করছি, আমি আমার নফসকে তিরস্কার করছি ; তুমি ছাড়া আমার আর কোন পরিত্রাণকারী নেই, আমি রসনার তাড়নায় গোনাহের ভারে জর্জ্জরিত ; ওগো এলাহী! তোমার অপরিসীম করুণা, ক্ষমা আর অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে, আমার পাপরাশিকে ক্ষমা করে জান্নাত নসীব কর আর তোমার প্রিয় হাবিবের শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য দান কর। তুমি ক্ষমাশীল প্রভু, তুমি ক্ষমা কর।

ওগো দয়াময় আল্লাহ্! তোমার সন্তুষ্টির আশায় তোমার দরবারে তোমার আঙ্গিনায় হাজির হয়েছি, আমার সকল আরজি সকল আশা, তোমার কাছে। তোমার শাস্তির ভয়ে, তোমার হুকুম পালনের জন্য গোনাহের বোঝা নিয়ে তোমার কাছে হাজির হয়েছি, তোমার ঘর যিয়ারাত করেছি, তোমার অতিথি হয়ে তোমার আহ্বানে এই বরকতময় ভূমিতে তোমার করুণার আশায় হাত উঠিয়ে অপেক্ষা করছি। আল্লাহগো! আমরা তোমার এই সম্মানিত স্থানে অপেক্ষারত ; প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য তোমার কাছে পুরস্কার আছে, ক্ষমা আছে, রহমত আছে, নৈকট্য আছে ; তুমি আমাদের উপস্থিতিকে গ্রহণ করে আমাদের ডাকে সাড়া দাও! আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দাও ; আমাদের সৎকাজে বরকত দাও, আমাদের অতীত পাপসমূহ ক্ষমা কর। ওগো আল্লাহ্! আমরা তোমার দাস, তুমি আমাদের অনুগ্রহ কর। আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি, তাই তুমিই দয়া করে আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের করুণা কর, আমাদের মাফ কর। তুমিই আমাদের প্রভু! ইহজগৎ ও পরজগতে মঙ্গল দাও! অনুগ্রহ করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

আমাদের পরিবার-পরিজন, আমাদের মা-বাবা, দাদা-দাদি, আত্মীয়-

স্বজন দূরের কাছের সকলকে : সকল দেশবাসীকে তুমি রক্ষা করো, ইসলামের পথে রেখো, তাঁদের গোনাহ সমূহকে মাফ করে দিও। আমাদের সন্তান সন্ততিকে সুপথ প্রদর্শন করো, অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে, কুমন্ত্রণা দাতার কুমন্ত্রণার ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। আমাদের পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিও। আমাদের হালাল আহার্য দিও।

তুনিয়ার তামাম মুসলমানকে শান্তিস্থিতি দিও। অসুস্থকে সুস্থ করো, অত্যাচারিতকে অত্যাচার মুক্ত করো। অভাবগ্রস্তকে অভাব মুক্ত করো, তোমার দ্বীনের পথে তোমার রাসূলের তরিকার পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি দিও। তুনিয়ার মুসলমানকে সুখী সমৃদ্ধি করো। বারে বারে তোমার এই বরকতময় পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিও—আমীন।”

আরাফার দিন সর্বক্ষণ দোওয়া ও মাগফেরাত চাওয়ায় ব্যস্ত থাকতে হয়। অতীব তুঃখের হলেও সত্য যে আমাদের দেশের বহুলোক এই সময় নানা গল্প-গুজব ও পার্থিব কথায় ব্যস্ত থাকেন। মনে রাখতে হবে আপনি আল্লাহ্‌র সামনে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার এ উপস্থিতি গৃহীত না হলে আপনার সব চেষ্টা অর্থকষ্ট, সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাছাড়া আর এতবড় পুণ্যময় জায়গায় উপস্থিত হতে পারার সৌভাগ্য নাও হতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে হওয়া কঠিনও। তাই মুহূর্ত বিফলে না যায় সে বিষয় সদাসতর্ক থাকতে হবে। সম্ভব হলে দোওয়া মাসুরা পড়ে যে কোন প্রার্থনা শুরু করা ভাল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই দোওয়া আরাফার মাঠে পড়েছিলেন :

(লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়া লাহুল হামদো ওয়া হোয়া আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদির। আল্লাহুম মাজআল ফী ক্বালবী নুরাওঁ ওয়া-ফী সাময়ী নুরাওঁ ওয়া ফী বাসরী নুরাওঁ, আল্লাহুম্মা শারহলী সাদরী ওয়া ইয়াসসেরলী আমরী ওয়া-আউজোবেকা মিনা ওয়াসা-বেসো সাদরী ওয়া সাতাতীল আমরে ফিতনতাল কাবরে ; আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজোবেকা মিন্-শারের মা-ফীল লাইলে ওয়া-শারের-মা-ইয়ালেজো-ফীন-নাহারে ওয়া-শারের-মা তা-হোবেবো বিহীর রিয়াহো, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ইন্নামাল খায়রো খায়রাল-আখেরাত।)

বাংলায় : আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সর্বশক্তিমান।

ওগো আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে, কর্ণকুহরে আর নয়নে আলো দাও। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও। মনের কু-চিন্তা, কাজের বিশৃঙ্খলা আর কবরের বিপদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ওগো প্রভু (আল্লাহ্)! দিন ও রাতের অনিষ্ট, বস্তু আর বায়ু দ্বারা আনীত ক্ষতিকর বস্তু থেকে তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। ওগো আল্লাহ্! আমি তোমারই উপাসনায় (এবাদাতে) উপস্থিত হয়েছি। ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল।"

ঝ. নবী (সাঃ) এর বিদায় হজের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

দশম হিজরীর যিলকাদ মাসে প্রচারিত হয়ে গেল যে নবী (সাঃ) এ বছর হজব্রত পালন করবেন। অমনি দিকে দিকে গোটা মুসলিম জাহানে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এই সজ্জা রণসজ্জা নয়, এ সজ্জা আত্মশুদ্ধির সজ্জা। নবীজীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে হজব্রত পালনের সজ্জা। চারিদিক থেকে অগণিত মুসলিম নর-নারী ছুটে চলেছেন প্রিয় নবীর দরবারে। উদ্দেশ্য একত্রে মদিনা থেকে নবীজীর সঙ্গে হজ করবেন, নবীজীর সঙ্গে হাজির হবেন আল্লাহ্‌র দরবারে।

যিলকাদ মাস শেষ হতে না হতেই সমর্পিত প্রাণ লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির হলেন মদিনায়। দেখতে দেখতে ভরে গেল মদিনার পথ প্রান্তর। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শুধু মানুষ আর মানুষ। সমগ্র মদিনাভূমি এক জনসমুদ্রে পরিণত হল। নবী (সাঃ) বজ্রগম্ভীর শান্ত কণ্ঠে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিশুদ্ধ নিয়ম শিখে নাও এবং তা গ্রহণ করো।"

হযরতের হজের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি ঃ

সেদিন ২৫ যিলকাদ (ইং ৬৩২ খ্রীঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী) শনিবার হযরত স্নান সেরে পরিপাটি করে কেশ বিন্যাস করলেন। পরিধেয় বস্ত্রাদি সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করলেন, শরীরের বিভিন্ন অংশে সুমিষ্ট সুগন্ধি (আতর?) লাগলেন। মদিনার মসজিদে নাবাবীতে বিশাল জামাআতে যোহরের নামায সম্পন্ন করলেন! এবার সমবেত ভক্তবৃন্দকে হজের জন্য এহরাম পরতে বলে নিজেও এহরাম পরে আল্লাহ্‌র ঘরের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। এই সফরের শুরুর সময় সমবেত ভাবে দোওয়া করলেন।

"আল্লাহুম্মা হাওয়্যেন আলাইনা হাযাস সাফরে ওয়াত বেঅনা বোআদাহু, আল্লাহুম্মা আনতাস সাহেবো ফিস সাফরে ওয়াল খালিফাতে ফিল মালে ওয়াল ওয়ালাদ।"

তাই যে কোন ভ্রমণের শুরুতে এই দোওয়া করা ভাল। আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গীকৃত লক্ষ লক্ষ প্রাণের লাব্বায়েক ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ বাতাস। পর্বত বেষ্টিত মরুপ্রান্তর লাব্বায়েকের মোহময় মূর্চ্ছনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বিশাল জনসমুদ্র। সম্মুখে হযরত তার প্রিয় উট আল-কাসওয়ায় উপবিষ্ট। হযরত এই বিশাল জনতার কাফেলা নিয়ে 'জুল হোলায়ফা'তে পৌঁছে যাহরের নামায পড়লেন। তিনি এই নামায কসর করলেন অর্থাৎ চার রাকাআতের পরিবর্তে ভ্রমণের নিয়মে দুরাকাত নামায আদায় করলেন এবং এহরামের নিয়ত করে তালাবিয়াহ (লাব্বায়েক) পড়লেন। এখন থেকে তিনি কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করলে বা উঁচু থেকে নিচে নামলে সর্বদা তালাবিয়াহ (লাব্বায়েক) পডতেন। আর সেই সঙ্গে বিশ্ব জনসমুদ্র থেকেও উত্থিত হতে থাকল সুমধুর সুরে তালবিয়াহর পবিত্র বাণী। এমনি করে এগোতে এগোতে ৪ঠা যিলহজ পবিত্র শহর মক্কার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হলেন। এই সেই মক্কা যার অধিকারের জন্য অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে মুসলমানদের, হযরতকে সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন অত্যাচার! আর আজ সেই মক্কার সবকিছুই হযরতের পদতলে এক আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত হচ্ছে। কি পরিপূর্ণ শান্তি! কি হৃদয় ভরা তৃপ্তি! হযরত এখানে এসে গোসল করলেন। এটা পবিত্র হেরেমের মদিনার দিকের সীমানা। এই দিন সকালে নবী (সাঃ) সমবেত জনমণ্ডলী সহ জান্নাতুল মাওলার (জাহুন সমাধিক্ষেত্র) পথ ধরে পবিত্র ভূমি মক্কা নগরে প্রবেশ করলেন। কাফেলা এগিয়ে গিয়ে হেরেমের সীমানায় পৌঁছল। হযরত বাবুস সালাম দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে আর অন্তরে আবেগময় প্রার্থনা। এইভাবে প্রার্থনা করতে এগিয়ে গেলেন হাজরে আসওয়াদের সামনে। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে সাতবার কাআবাঘরকে প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ করলেন। এটাই হল তাওয়াফে কদুম। আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহামের কাছে গিয়ে দুরাকাত ওয়াজেবুত তাওয়াফ নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে উঠে গিয়ে আবার হাজরুল আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করলেন। এবার সাফা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং

পাহাড়ের সর্বোচ্চ ধাপে উঠে কাআবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিমীলিত নেত্রে তাহলিল পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা শেষ করে সেখান থেকে নেমে মারওয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানেও পাহাড়ের উপর উঠে একই ভাবে দোওয়া করে নেমে আবার সাফার দিকে গেলেন। এইভাবে ৭ বার সাফা মারওয়া যাওয়া আসা করলেন। এটাকেই সায়ী বলা হয়। পর দিনও তিনি শিষ্যবৃন্দ সহ মক্কা শহরে অবস্থান করে মীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মীনায় পৌঁছে যোহর' আস্বরের নামায আদায় করে ঐদিন রাত্রি যাপন করলেন এবং মাগরেব, এশা ও পরদিন ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পর আরাফা রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে মীনার পথে অনেকে তালাবিয়া ও তাকবির পড়ছিলেন। হযরত তাদের কাউকে নিষেধ করেন নি। মীনাতে হযরত যেখানে তাঁবু ফেলে ছিলেন ও তিনি যেখানে অবস্থান করেছিলেন সেখানে মসজিদে খায়েফ নির্মিত হয়েছে। এবং মসজিদের মধ্যে হযরতের অবস্থান স্থল চিহ্নিত করা আছে। বর্তমানে এই মসজিদ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল হর্ম্যমালায় রূপান্তরিত হয়েছে।

হযরত এইদিন অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ সকালে তাঁর প্রিয় উট 'আল কাসওয়া'র উপর আরোহণ করে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সমবেত জনমণ্ডলী তাঁরই অনুকরণে তালবিয়াহ ও তাকবির পড়তে পড়তে এগিয়ে চললেন সেই মহাপ্রান্তরে যেখানে পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম থেকে সকল নবী রাসূল ও আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাগণ হাজির হয়ে প্রার্থনা করেছেন। হজ করেছেন। লক্ষ মানুষের মিছিল চলেছে আল্লাহ্‌র দরবারে। নবী (সাঃ) রয়েছেন তার পুরোভাগে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশায়, ক্ষমার আশায় সমগ্র জনমণ্ডলী লাব্বায়েক ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মরু-পর্বত মুখরিত করে ছুটে চলেছেন। অপূর্ব। অপূর্ব সে দৃশ্য!

হযরত আরাফাতে পৌঁছে জাবালে রহমতের কাছে তাঁবু পাতলেন। সমগ্র মুসলমান আরাফায় পৌঁছে নামেরা নামক জায়গায় তাঁবু পাতলেন। বর্তমানে এখানে নামেরা মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বিশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ। সুদৃশ্য মোজাইক করা নয়নাভিরাম সুসজ্জিত মসজিদ।

হযরত সেদিনে সমবেত প্রায় তুলক্ষ মানুষের সামনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক মূল্যবান বক্তৃতা দিলেন এটাই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের বাণী বলে খ্যাত :

ঞ. বিদায় হজ্জের বাণী

সেদিন দশম হিজরীর ৯ যিলহজ্জ। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ সাঃ প্রায় দু লক্ষ সাহাবী পরিবৃত্ত হয়ে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিত। তাঁরই প্রচারিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের সে এক চরম বহিঃপ্রকাশ। কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, নেই কোন ভাষা, বর্ণ আর গোষ্ঠিগত আঞ্চলিকতাবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ। লক্ষ মানুষ সব সীমারেখা বিসর্জন দিয়ে হযরতের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে ছুটে এসেছেন এই মহামিলন ক্ষেত্রে। সমগ্র প্রান্তর ভরে গেছে লাব্বায়েকের বাণীতে। এক অনাবিল আবেশ বিহ্বল স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে— "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা শরিকা লাকা লাব্বায়েক।" ৬৩ বছর বয়স্ক প্রৌঢ় হযরত অভিভূত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রার্থনা রত হলেন। এই সময় নেমে এলো আল্লাহ্‌র বাণী "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমার উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম।" প্রার্থনা শেষে হযরত সমবেত মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন :

"হে আমার অনুগামী ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ যে কথা তোমাদের বলব তা মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি আশঙ্কা করছি যে তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ হয়ত আমার জীবনে আর ঘটবে না।"

"হে মুসলমানগণ! অন্ধকার যুগের সকল ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ভুলে যাও। নতুন আলোকে ইসলামের বিশুদ্ধ পথে চলতে অভ্যস্ত হও। আজ থেকে অতীতের যাবতীয় মিথ্যা, অনাচার কুপ্রথা বাতিল হয়ে গেল। "তিনি তাঁর মর্মস্পর্শী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান ব্যক্ত করলেন :

তিনি বললেন :—"আপনারা জেনে রাখুন সকল মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নয়! আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সব দেশের সব মানুষই সমান। তোমরা প্রতিহিংসা ত্যাগ কর। হত্যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। প্রত্যেক মুসলমানদের ধন প্রাণ পবিত্র বলে জেনো। আপনাদের প্রত্যেকের জীবনই আজকের দিনের মত পবিত্র। সকল প্রকার সুদের ব্যবসা আজ থেকে নিষিদ্ধ। আজ থেকে সকল প্রকার প্রাপ্য সুদ ও রক্তের দাবী রহিত হয়ে গেল। সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির ফলে পৃথিবীর বহু জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কোন মুসলমানের সম্পত্তির, সম্মানের ও প্রাণের ক্ষতি সাধনকে হারাম বলে মনে করো।"

"হে আমার অনুগামী মুসলমানগণ! নারী জাতির কথা ভুলে যেও না। নারীদের উপর তোমাদের যতটা অধিকার আছে নারীদেরও তোমাদের উপর ঠিক ততটাই অধিকার আছে। তাদের উপর অত্যাচার করো না। মনে রেখো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ। তোমরা স্ত্রীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবে।"

"দাস দাসীর প্রতি কখনও নির্মম ব্যবহার করো না, তাদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করো, তাদের উপর অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে ও পরবে তাদেরকেও তাই খেতে ও পরতে দিও। ভুলে যেওনা তারাও তোমাদের মতই মানুষ।"

"বংশের গৌরব করো না। জেনে রেখো যারা নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর বংশের নামে পরিচয় দেয় তারা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত।"

"সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের তা স্পর্শ না করে। সকল প্রকার কলুষতা মুক্ত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করো! মনে রেখো তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। এবং পার্থিব জগতের সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে।"

তিনি আরও বললেন: "আমি আমার কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করেছি। তোমাদের কাছে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি একটি হল কোরআন আর একটি হল হাদিস। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র বাণী কোরআনকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর তাহলে কিছুতেই পথ ভ্রষ্ট হবে না।" আর জেনে রাখ! আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। আমিই শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"

এই বক্তৃতার পর হযরত শিষ্যগণকে আহ্বান করে বললেন, "আমি তোমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করেছি এই প্রশ্ন কেয়ামতের দিন তোমাদের করা হলে তোমরা কি উত্তর দিবে?" সমবেত জনমণ্ডলী বললেন, "হে রাসূল আমরা সাক্ষ্য দিব আপনি আমাদের আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, ধর্ম পথে থেকে সত্য ধর্ম প্রচারে বিশেষ যত্নবান হয়েছেন।" হযরত কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সম্মুখের জন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "বিদায়! বন্ধুগণ বিদায়!" হযরত নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুযদালেফায় পৌঁছে

রাত্রি যাপন করেন। বর্তমানে এখানে এক নয়নাভিরাম মসজিদ তৈরী হয়েছে। ঐ মসজিদটার নাম মসজিদে-মাশয়ারিল হারাম। পরদিন প্রভাতে ফজরের পর তিনি মীনায় এসে জামারাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করার পর কোরবাণী করেন ও এহরাম ছেড়ে মক্কা শরীফ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারাত করে সায়ী করেন। অতঃপর তিনি আবার মীনায় ফিরে তুদিন অবস্থান করে কাঁকর নিক্ষেপ ও শিষ্যগণকে বিদায় জানান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুযদালেফায় অবস্থান ও করণীয়

আরাফাত হতে ফেরার সময় পথে প্রচণ্ড ভিড় হয়। এই সময় ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ লোক আরাফাত থেকে মুযদালেফায় ফেরেন। তাই গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে সমগ্র এলাকা ও রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ থাকে। এই ভিড়ে ধৈর্যহারা না হয়ে সংযতভাবে অন্য কাউকে কষ্ট না দিয়ে অন্যের মনোকষ্টের কারণ না হয়ে, কোন তুর্বলকে পদদলিত না করে মুযদালেফার পথে এগিয়ে যেতে হবে। নবী (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং ভালভাবে সফর কর।" সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের কাফেলার সকলে একত্রিত হয়ে চলতে হবে। আরাফার মাঠে দলছুট হয়ে গেলে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। কারণ সন্ধ্যার পরই সমস্ত তাঁবু ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে যায়। তখন কোথায় কোন তাঁবু ছিল তা বোঝার উপায় থাকেনা। একান্ত যদি কেউ নিজ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাহলে ভারতের পতাকা লক্ষ্য করে সেখানে চলে যেতে হবে। আরবীতে ভারতীয় দূতাবাসকে বলে 'সাফারাতুল হিন্দ'। আবার এর সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন তাই 'মুসতাসফিল হিন্দ'ও বলে। যে কোন পুলিশকে ঐ নাম তুটি জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবেন। সেখানে গিয়ে নিজের অসুবিধার কথা জানালে অবশ্যই তাঁরা সাহায্য করবেন এবং তাঁরাই তাঁবুতে পৌঁছে দেবেন।

মুযদালেফায় পানির জন্য অসুবিধা হতে পারে। এখানে পানির ব্যবস্থা আছে কিন্তু গাড়ীর চালকগণ অনেক দূরে ছেড়ে দেন। তাছাড়া বিশাল প্রান্তরের পানি না থাকা জায়গাতেও নামিয়ে দিতে পারে। তাই সাবধান

থাকা ভাল। আরাফাতের মাঠে পানির কষ্ট নেই। সেখান থেকে অন্ততঃ চার-পাঁচ লিটারের মত পানি সঙ্গে নিয়ে নিলে নিশ্চিন্তে মুযদালেফায় সব কাজ করা যাবে। যেমন প্রস্রাব পায়খানা ওজু করতে পানির দরকার হবে। মুযদালেফা যাওয়ার সময় তালাবিয়াহ পড়তে হবে।

মুযদালেফায় পৌঁছে মাগরেবের তিন রাকাআত ও এশার দু রাকাআত কসর নামায একত্রে এক আযানে দুই একামাতে আদায় করতে হবে। নবী (সা:) এইভাবে করেছেন। তাই মুযদালেফায় যখনই পৌঁছান হোক এইভাবে তরতিব অনুযায়ী প্রথমে মাগরেবের ও পরে এশার দু রাকাআত কসর নামায পড়তে হবে। এই দুই ফরজ নামাযের মাঝে কোন অতিরিক্ত নামায বা মাগরেব ও এশার সুন্নত, নফল পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে অনেকে এইভাবে নামায আদায়ের পর বেতের পড়ে তারপর মাগরেব ও এশার সুন্নত আদায় করে থাকেন। তারপর এক দু'ঘন্টা বিশ্রামের জন্য আহার-নিদ্রা কোন দোষের নয়। এবার এই রাতে মুযদালেফাতেই অবস্থান করে এবাদাত বন্দেগীতে কাটাতে হবে। রাত অতিবাহিত না করে কেউ মুযদালেফা থেকে চলে গেলে তাঁকে দম দিতে হবে। কারণ ৯ যিলহজ্জ মুযদালেফায় অবস্থান করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

এইদিন যখনই পৌঁছান হোক তখনই মাগরেব ও এশার নামায একত্রে এক আযানে দু একামাতে কসর পড়তে হবে। আরাফাতে বা পথে মাগরেবের সময় হলেও সেখানে তা পড়া যাবেনা, মুযদালেফাতে পৌঁছে পড়তে হবে। সমগ্র রাত এবাদাতে অতিবাহিত করা উচিত। ভোর রাতে এশার বেতের পড়ে অন্যান্য সুন্নত নফল নামায তরতিব অনুযায়ী পড়া যেতে পারে। ভোরে সোবাহে সাদেক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ মোয়াল্লেমের লোকজন অনেক রাত থেকেই তাড়া দিতে থাকে ফলে অনেকে ভুলবশতঃ সময়ের আগে নামায পড়ে রওয়ানা হয়ে যান। তাই সাবধানতার জন্য ঐ লোকের সঙ্গে কোন বিতর্ক না করে চুপচাপ ঘড়ি দেখে ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষা করা। এখানে সরকারের তরফ থেকে কামান দেগে ফজরের ওয়াক্ত ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া নিজেদের ঘড়ি দেখে ঠিক সময়মত নামায আদায় করে সোবহে সাদেকের কিছু সময় মুযদালেফায় অবস্থান করা ওয়াজেব। অবশ্য সোবহে সাদেক হওয়ার পর নামায আদায় করলেই এই ওয়াজেব আদায় হয়ে যায়। আর সূর্যোদয়ের সামান্য আগে পর্যন্ত মুযদালেফায় অপেক্ষা করা সুন্নত।

ক. কাঁকর সংগ্রহ করা

প্রায়শঃই দেখা যায় মুযদালেফায় পৌঁছেই সকলে মীনায় শয়তানকে মারার জন্য কাঁকর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা এও মনে করেন এখান থেকে কাঁকর সংগ্রহ করাই শরীয়তের বিধান। আসলে কিন্তু তা নয় কাঁকরের সঙ্গে মুযদালেফার কোন সম্পর্কের বিষয় শরীয়তের কোন হুকুমে নেই। নবী (সাঃ) মাশআরুলহারাম থেকে মীনায় গমনকালে কাঁকর সংগ্রহের হুকুম দিয়েছিলেন তার আগে নয়। তাছাড়া কাঁকর যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক না কেন তা জায়েজ। বরং মুযদালেফা থেকেই সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক মনে না করা উচিৎ। কাঁকর মীনা থেকেও সংগ্রহ করা জায়েজ। আসলে এখানে সহজে কাঁকর পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। নবীজী এইদিন মীনা যাওয়ার সময় মাত্র সাতটি কাঁকর সংগ্রহ করেছিলেন অবশিষ্ট তিন দিন প্রতিদিন ২১টি করে কাঁকর মীনাতেই সংগ্রহ করছেন।

মীনা বর্তমানে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে সব সময় কাঁকর পাওয়া সম্ভব নয়, সেজন্যই এখান থেকে যথেষ্ট সংখ্যক কাঁকর সংগ্রহ করে নেওয়া যেতে পারে।

কাঁকর ছেলেদের খেলার মার্বেলের মত সাইজের বড় না হয় অর্থাৎ ছোলার থেকে বড় ও মার্বেলের সাইজের মত কাঁকর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাঁকর ধোয়া মুস্তাহাব নয়। অনেকে এই ধারণা করে কাঁকর ধুয়ে থাকেন। এটা শরীয়তের নিয়ম নয়। নবী (সাঃ) বা সাহাবীগণ কেউই কাঁকর ধোয়ার কোন রীতির প্রচলন করেননি। তবে কাঁকরে কোন নোংরা বা নাজাসাত কিছু লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করার জন্য ধোয়া যায়, কোনভাবেই কাঁকর ছোঁড়ার জন্য ধোয়ার কোন শর্ত নেই।

একবার যে কাঁকর ব্যবহার করা হয়ে যায় পুনরায় কোনভাবেই তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। অনেক সময় ছোড়ার সময় ধাক্কাধাক্কিতে কাঁকর পড়ে যায় সেজন্য কাঁকর প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশী সংগ্রহ করা ভাল। মোটামুটি ভাবে ৭০টির মত কাঁকর সংগ্রহ করে সুবিধা মত একটা ছোট থলিতে রাখা যায় বা কাগজে মুড়ে ব্যাগে রাখা যায়। সর্বমোট ৪৯টি কাঁকর ছুঁড়তে হবে।

আজ মীনায় পৌঁছে বড় শয়তানকে ৭টি কাঁকর মারতে হবে। বড় শয়তানকে আরবীতে 'জামারাতুল আকাবা' বলা হয়। ৭টির জায়গায় ৯/১০টি নিয়ে নেওয়া ভাল। কারণ কাঁকর ঠিক জায়গায় মারতে হয়। এক্ষেত্রে ছুঁড়তে গিয়ে অন্যত্র পড়ে যেতে পারে বা ধাক্কাধাক্কিতে হাত থেকেও

পড়ে যেতে পারে তাই অতিরিক্ত দু চারটে না রাখলে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে।

মুযদালেফা থেকে মীনা যাওয়ার সময় পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায়। খুব কষ্টকর কিছু নয়। তবে বৃদ্ধ শিশু ও নারীদের জন্য গাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়। এখান থেকে ফেরার সময় মহাস্‌সার উপত্যকার উপর দিয়ে না যাওয়া উচিৎ। আর যদি কোনভাবে এখান থেকেই যেতে হয় তবে দ্রুত দৌড়ে পার হয়ে যেতে হবে। কারণ এটি গজবের স্থান। এখানেই কাআবা ধ্বংসকারী উদ্ধত আব্রাহাকে আল্লাহ্ তাআলা স্বসৈন্যে ধ্বংস করেছিলেন। সে বর্ণনাই আল্লাহ্ কোরআনের সুরা ফীলে উল্লেখ করেছেন। এই উপত্যকাকে 'ওয়াদী নার' ও বলা হয়। সউদী সরকার এখানে চারদিকে চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন এবং পথচারী হাজিদের সুবিধার জন্য পুলিশও মোতায়েন থাকে। বর্তমানে পায়ে চলার জন্য মীনা পর্যন্ত যে সেড দেওয়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পথ ছিল তা মুযদালেফা পর্যন্ত বর্ধিত হচ্ছে।

খ. ১০ যিলহজ, হজের তৃতীয় দিন

আজ ১০ যিলহজ। হজের নানা কাজে হাজিদের ব্যাপৃত থাকতে হয় বলে তাদের ঈদুল আযহার নামায মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাজিদের আজ আর ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হবে না।

১. ১০ যিলহজের প্রথম ওয়াজেব হল মুযদালেফায় অবস্থান।

মুযদালেফায় ফরজ নামাযের পর সামান্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যায়। তাই সোবহে সাদেকে ফজরের নামাযের পর আদবের সঙ্গে একান্ত বিনয় ও বিনম্র ভাবে এসতেগফার পড়ে নিজের গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এবং সূর্য ওঠার কয়েক মিনিট পূর্বেই ওখান থেকে রওনা দিতে হবে। তবে যদি কেউ ফজরের নামাযের সময় মুযদালেফায় অবস্থানের নিয়ত করে এবং তসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তালাবিয়াহ পড়ে নেয় তবে তাঁরও এই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। এবার মীনা যাওয়ার পথে খুব বেশী করে তালাবিয়াহ পড়া প্রয়োজন।

২. ১০ যিলহজের দ্বিতীয় ওয়াজেব হল জামারাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে কাঁকর মারা বা রমি করা:

সূর্য পূর্ব গগনে নতুন ঊষার আলোক বয়ে এনেছে। তারই সঙ্গে চলেছে বিশাল জনস্রোত মীনার পথে। আজ মীনায় পৌঁছে কেবল মাত্র বড়

শয়তানকে রমী করতে হবে অর্থাৎ ৭টি কাঁকর মারতে হবে। এই কাঁকর মারা শুরু করার আগে তালাবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করে দিতে হবে, যদিও পূর্বেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তবুও এখানে একটু প্রাচীন স্মৃতিচারণ করে নেওয়া যাক।

নবী হযরত ইব্রাহিম স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে নিজের প্রিয় সন্তান ইসমাইলকে কোরবানীর জন্য মীনার দিকে নিয়ে চলেছেন। এখানে আসতেই শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে হযরত ইব্রাহিম (আ:)-কে বিভ্রান্ত করে মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। হযরত ইব্রাহিম সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন যে এ শয়তানের ধোঁকা। তাই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি সাতটি কাঁকর ছুড়ে শয়তানকে মারেন। আর সেই জায়গাতেই "জোমারাতুল আকাবা" চিহ্নিত করা আছে। সেই স্মৃতিচারণ করেই হাজিগণ শয়তানকে কাঁকর মেরে থাকেন। এবার নবী ইব্রাহিম (আ:) আরও একটু এগিয়েছেন আর শয়তান আবার ধোঁকা দিয়ে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তিনি আবার সাতটি কাঁকর ছুড়ে মারেন শয়তানকে আর শয়তান বিতাড়িত হয়। সেই জায়গাটি চিহ্নিত করা হয়েছে "জামারাতুল ওসত্বা" বা মেজ শয়তান বলে। এখানেও হাজিদের সাতটি কাঁকর মারতে হবে। তৃতীয় বার আবার যখন হযরত ইব্রাহিম ইসমাইলকে নিয়ে এগোচ্ছেন তখন তাঁকে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করে ও যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অমান্য করেন তার শেষ চেষ্টা করে। তিনিও যথারীতি বুঝতে পেরে আবার সাতটি কাঁকর ছুড়ে মারেন এবার শয়তান নিরুপায় হয়ে হযরতের পিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে জায়গাটাকে "জামারাতুল উলা" বা ছোট শয়তান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই ঘটনার স্মৃতিতেই তিন জামারায় কাঁকর মারার বিধান রয়েছে হাজিদের জন্য। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় বোর্ড দিয়ে ঐ জায়গা-গুলির দিক নির্দেশ করা আছে। ভিড়ের জন্য প্রচণ্ড অসুবিধা হয়, তবে এখন ফ্লাইওভার করেও ঐ জায়গায় রাস্তাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে নীচে বা উপর থেকে এখানে কাঁকর নিক্ষেপ করা যায়। মসজিদে খায়েফের কাছেই আছে জামারাতুল উলা আর তৃতীয় জামরা হল মীনার শেষ সীমা এটাকে জামারাতুল আকাবা বা বড় শয়তান বলা হয়। এই দুটির মাঝে আছে 'জামারাতুল ওস্বতা' বা মেজো শয়তান। আজ ১০ যিলহজ্জ শুধু মাত্র বড় শয়তানকেই কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। তাই মীনায় পৌঁছে

সোজা চলে যান মসজিদে খায়েফের দিক থেকে বা অন্য দিকের রাস্তা থেকেও যাওয়া যায়। বড় বোর্ডে তীর চিহ্ন দিয়ে দিক নির্দেশ করে লেখা আছে অথবা পুলিশকে জিজ্ঞেস করে ফ্লাইওভারের উপর থেকে বা নীচ থেকে এগিয়ে যান। প্রথমে 'ছোট শয়তান বা জামারাতুল উলা এবং তারপর জামারাতুল ওসত্বা বা মেজ শয়তানের জায়গা এ দুটির কাছে আজ দাঁড়ানর প্রয়োজন নেই। একেবারে শেষটা অর্থাৎ জামারাতুল আকাবার কাছে চলে যান। নিজে ছুঁড়তে পারবেন এমন দূরত্বের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান এবং সম্ভব হলে কাবাশরীফকে ডানদিকে আর মীনাকে বাম দিকে রেখে কাঁকর নিয়ে বৃদ্ধ ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ঠিক করে ধরে নিন। সামনে দেখুন কাঁকর মারার জায়গাটি একটি থামের দ্বারা চিহ্নিত করা। এই থামের গায়েই কাঁকর মারতে হবে। একটু আধটু পাশে পড়ে গাড়িয়ে গেলেও চলবে। যদি সম্ভব না হয় যে কোন দিকে দাঁড়িয়েই কাঁকর নিক্ষেপ করা যাবে। শর্ত হল কাঁকর নির্দিষ্ট জায়গায় পড়তে হবে। কাঁকর নিক্ষেপের সময় প্রত্যেক বার পরপর 'বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার' বলে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। এরপর এখানে না দাঁড়িয়ে চলে যেতে হবে।

একটা বিষয় এখানে সতর্ক হতে হবে। এখানে অসম্ভব ভিড়ে ও ধাক্কা-ধাক্কির ফলে সঙ্গী সাথীগণের কোন ভাবেই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে যেখানে সকলে পরপর মিলিত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে মসজিদে খায়েফকেও নির্দিষ্ট করে নেওয়া যায়। যিনি আগে আসবেন তিনি না আসা সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করবেন। কাউকেই ছেড়ে আসবেন না। কারণ অনেক বৃদ্ধ ও মহিলাগণ এক্ষেত্রে খুবই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। যথা সম্ভব যতজন পারা যায় একত্রে থাকার চেষ্টা করবেন ও পরস্পরকে লক্ষ্য রাখবেন। এবং যাকে পাবেন না তার জন্য অপেক্ষা করবেন ও অনুসন্ধান করবে৹ কিন্তু নির্দিষ্ট করা জায়গা ছেড়ে সকলে যাবেন না। মহিলা, বৃদ্ধ ও 'শিশুদের কোন ভাবেই নীচে থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাঁরা অবশ্যই ফ্লাই ওভারের উপর থেকে গিয়ে রমী করবেন। আর একটা কথা, কাঁকর মারার সময় যদি তা পড়ে যায় কোন ভাবেই তা উঠানর চেষ্টা করবেন না বা নীচু হবেন না, তাহলে অসংখ্য জনতার চাপে পদদলিত হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। এমনকি চপ্পল চলে গেলে বা খুলে গেলে তা ঠিক করার চেষ্টাও কেউ যেন

না করেন। একাজও ভীষনই বিপদজনক। জীবনের ঝুকি নেওয়ার সামিল।

আজ সূর্যোদয়ের থেকে যোহরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত 'জামারাতুল আকাবায়' রমী করার উপযুক্ত সময়। তবে জাওয়াল থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ। সূর্যাস্তের পর মাকরূহ। তবে অক্ষম বৃদ্ধ ও মহিলাদের জন্য সূর্যাস্তের পরও রমী করা জায়েজ। অসম্ভব ভিড়ের চাপে এখানে পদদলিত হয়ে মৃত্যু ঘটে তাই অসুস্থ মহিলা ও বৃদ্ধদের রমী করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে মাগরেবের পরেও রমী করে নেওয়া দরকার।

৩. ১০ যিলহজ তৃতীয় ওয়াজেব 'কোরবাণী'

জামারাতুল আকাবায় রমী করে সকলে একত্র হয়ে এবারে মীনায় কোরবানীর জন্য নির্দ্ধারিত জায়গার দিকে এগিয়ে যান। এবার কোরবাণী করতে হবে। কোরবাণী প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ের একাগ্রতার উৎসর্গ করা। আল্লাহ্ কোরআনের ৩৭ নং আয়াতে বলেছেন :—"আল্লাহ্‌র কাছে পৌছয় না ওদের (কোরবানীর প্রাণীর) মাংস এবং রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা"।

হযরত ইব্রাহিম নিজ পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর উপর এখানেই কোরবানীর জন্য ছুরি চালিয়েছিলেন। সেই একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের স্মৃতিই কোরবানী। তাই আল্লাহ্ শুধু নিয়ত বা উদ্দেশ্যকেই দেখে থাকেন। পুলিশকে জিজ্ঞেস করে কোরবানীর এলাকায় চলে যান। ওখানে অসংখ্য জানোয়ার আছে নিজের পছন্দ মত একটা ঠিক ঠাক করে দর দাম করে নিন তারপর নিজ হাতে কোরবানী করে দিন। না পারলে অন্যকে দিয়ে করে দিন। কোরবানীর আগে মাথা মুড়ান যাবে না। অনেকে ভুল করে রমী করে এসেই কোরবানী না করেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেন এটা ঠিক নয়। কোরবানী করে তবে মাথা মুড়াবেন বা চুল ছোট করবেন। তবে যাঁরা এফরাদ হজের নিয়ত করেছেন তাঁরা কোরবানী না করেও মাথা মুড়িয়ে ফেলতে বা চুল ছোট করতে পারেন। কারণ এফরাত হজের নিয়ত কারীর জন্য কোরবানী 'ওয়াজেব' নয় বরং মোস্তাহাব।

কোরবানীর নিয়ত :

"বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লেকা,

ওয়া এলাইকা, ওয়া তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাবালতা মিন খালিলেকা ইব্রাহিম।"

যদি নিজে না করে অন্য কারো জন্য করা হয় তাহলে মিন্নীর জায়গায় নাম ও বাপের নাম বলতে হবে।

কেরেবানীর অল্প মাংস নিয়ে এসে রান্না করে খাওয়া ভাল।

৪. ১০ যিলহজ চতুর্থ ওয়াজেব 'হালাক বা মাথা মুড়ান'

কোরবানী শেষ করে এসে পুরুষ হাজিদের মাথা মুড়ান বা চুল ছোট করা যায় তবে মাথা মুড়ানই উত্তম। মাথা মুড়ানর সময় ডান দিক থেকে শুরু করতে হয় আর যদি মাথা না মুড়িয়ে চুল কাটার ইচ্ছা করেন তবে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটলেও জায়েজ হবে। মহিলাদের মাথামুড়ান জায়েজ নয়। পর্দার সঙ্গে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুলের অগ্রভাগ কেটে দিলেই চলবে।

এবার এহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে নেওয়া যায়। হজের তিনটি ফরজ যথা (১) এহরাম বাঁধা (২) আরাফাতে অবস্থান করা (৩) তাওয়াফে যিয়ারাত করা। এই তিনটি ফরজের মধ্যে দুটি আদায় হয়ে গেল। এবার তাওয়াফে যিযারাত বাকি। এহরাম অবস্থার শেষ হলেও তাওয়াফে যিয়ারাতের আগে স্ত্রী সঙ্গ নিষিদ্ধই থাকবে।

কোরবানীর দিন হাজিদের চারটি কাজ নিম্ন তারতিব অনুযায়ী করতে হবে। যথা: (১) প্রথমে জামারাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা (২) অতঃপর কোরবানী করা (৩) কোরবানীর পর মাথা মুড়ান (০) এর-পর পবিত্র হয়ে তাওয়াফে যিয়ারাত করা। এই তরতিব অনুযায়ী ঠিক পরপর কাজগুলি করতে হবে।

৫. ১০ যিলহজের পঞ্চম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাওয়াফে যিয়ারাত

কোরবানীর পর মাথা মুড়িয়ে গোসল করে স্বাভাবিক কাপড় পরে বেরিয়ে পড়তে হবে মক্কা শরীফ গিয়ে পবিত্র কাআবা ঘরে তাওয়াফে করার জন্য। মীনা থেকে প্রচুর গাড়ী সর্বক্ষণ মক্কা যাতায়াত করছে তা ছাড়া ট্যাক্সী ও বাস আছে। খোঁজ করে জেনে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করুন। অথবা হেঁটেও যাওয়া যায়। নবী (সাঃ) এ পথ হেঁটে যাতায়াত করেছেন। তবে মহিলা, অসুস্থ বা বৃদ্ধ থাকলে গাড়ীতে চলে যাওয়াই ভাল। তাওয়াফে

যিয়ারাতের উত্তম দিন হল ১০ যিলহজ, আর ১২ তারিখ সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ। ১২ যিলহজ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যদি তাওয়াফ আদায় করে নেওয়া যায় তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারাত না করা হয় তাহলে আর ঐ তাওয়াফ করা যাবে না। দম দেওয়া ওয়াজেব হয়ে যাবে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতও ফরজ আকারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাকী থেকে যাবে। অর্থাৎ দম দিলেও এর সংশোধন হবে না। নিজের জীবনেই পুনরায় পরবর্তী কালে এই তাওয়াফ আদায় করে দিতে হবে নইলে জীবনভোর স্ত্রী সঙ্গ হারাম থেকে যাবে। এই তাওয়াফ আদায় না করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হারামই থাকবে।

"অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপবিত্রতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের"—(কোরআন—হজ ২৯)

তাওয়াফে যিয়ারাত আদায় করে নিলেই এবার হজের সকল কাজ শেষ হয়ে গেল। স্ত্রীও বৈধ হয়ে গেল এবং এহরাম অবস্থার সমাপ্তি ঘটল। এহরামের পূর্বে যা কিছু অবৈধ ছিল এখন তার সব কিছুই বৈধ হয়ে গেল।

হজের অবস্থায় কোন মহিলা ঋতুবতী হয়ে পড়লে তার জন্য নামায পড়া কোরআন তেলাওয়াত করা ও মসজিদে প্রবেশ ও তাওয়াফ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা দেখা দিলেও তিনি হজের সমুহ কাজ নিয়ম মত করবেন কেবলমাত্র তাওয়াফে যিয়ারাত বাকি থাকবে। এই অবস্থায় মক্কাশরীফে অপেক্ষা করে ঋতুর সময় কাল শেষ হলে তাওয়াফে যিয়ারাত আদায় করবেন। এর জন্য দম দিতে হবে না বা কোন গোনাহই হবে না।

গ. তাওয়াফে যিয়ারাত ও সাফা মারওয়ায় সায়ী

তাওয়াফে যিয়ারাত হজের শেষ ফরজ। আপনি তামাত্তো হজের নিয়ত করে থাকলে মক্কা শরীফ পৌঁছে কেবল মাত্র ওমরাহর তাওয়াফ করেছেন ও তার সঙ্গে সায়ী করেছেন যা ওমরাহর জন্যও ওয়াজেব। তাই আজ ১০ তারিখ মীনা থেকে এসে তাওয়াফে যিয়ারাতে পর সায়ী করতে হবে। তবে এখন এহরামের কাপড় পরে সায়ী করতে হবে না। সাধারণ ও সেলাই করা কাপড় পরেও তাওয়াফে যিয়ারাতের সায়ী করা যাবে। কারণ এহরাম

অবস্থা ইতিপূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। তবে যদি তাওয়াফে কুদুম বা হজ্জের এহরামের নিয়ত করার পর এহরাম অবস্থায় নফল তাওয়াফ করে সায়ী করা থাকে ও ঐ তাওয়াফে রমল এযতেবা করা থাকে তাহলে এখন সায়ী না করলেও তাওয়াফে যিয়ারাত জায়েজ হবে। তবে এহরাম অবস্থায় রমল এযতেবা সহ অতিরিক্ত নফল তাওয়াফ করে সায়ী করা না থাকলে তাওয়াফে যিয়ারাতের পর অবশ্যই সায়ী করতে হবে। এই তাওয়াফের সময় কয় চক্কর হল তা নিয়ে কোনরকম সন্দেহ দেখা দিলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। এই তাওয়াফ বিনা ওজুতে করলে দম দিতে হবে। নাপাক শরীরে বা মহিলাগণ হায়েজ অবস্থায় করলে পূর্ণ একটি উট বা গরু কোরবানী করে দম দিতে হবে।

আলহামদো লিল্লাহ্! ১০ যিলহজ্জের দিনের সব কাজ শেষ হল। এবার আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া আদায় করুন যে পরম করুণাময় আল্লাহ্ আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবাদাত সম্পন্ন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর ঘরে আপনাকে আহ্বান করেছেন তাঁর ঘরের দরজা স্পর্শ করার সৌভাগ্য দান করলেন, আরাফাতের পবিত্র বরকতময় ময়দানে উপস্থিত হওয়া ও অবস্থানের সুযোগ করে দিলেন। কতবড় সৌভাগ্য আজ আপনি অর্জন করলেন। এ সৌভাগ্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই অর্জন সম্ভব, নইলে কার সাধ্য এতবড় প্রাপ্তির অধিকারী হতে পারে! তাই কৃতজ্ঞতায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে আল্লাহ্‌র দরবারে। এবার এহরামের সকল প্রকার বিধিনিষেধ থেকে আপনি মুক্ত হলেন। এবার প্রাণভরে যমযমের পানি পান করুন।

তাওয়াফে যিয়ারাতের কাজ শেষ করে আবার মীনার তাঁবুতে ফিরে যেতে হবে। মীনাতে অবস্থানের সময়সীমা এখনও শেষ হয়নি। তাওয়াফে যিয়ারাতের পর দুরাত ও দুদিন মীনার তাঁবুতে থাকতে হবে। কারণ ১০, ১১, ১২ যিলহজ মীনাতে অবস্থান করা সুন্নত। এই সময় থেকে তালাবিয়াহ ও তাকবির পড়া বন্ধ। এখন থেকে তাশরিকের শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ যিলহজ মীনা থেকে চলে আসার পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ফরজ নামাযের পর তাকবির পড়তে হবে।

ঘ. ১১ যিলহজ হজের চতুর্থ দিনের করণীয়

যদি কেউ কোন কারণে ১০ যিলহজ্জ কোরবানী না করতে পারেন বা অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে আজ যোহরের আগেই

কোরবানীর কাজ শেষ করে ফেলা দরকার। সাধারণতঃ ১১, ১২, ১৩ যিলহজকে আইয়্যামে-রমী বা রমীর দিন বলে। এইজন্য এই তিন দিনে রমী করাও এবাদাত হিসাবে গণ্য। আর এই রমী-এবাদাত করার জন্যই তো এই তিন দিন মীনায় অবস্থান করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। কোন কোন আলেম ওয়াজেবও বলেছেন। এই তিন দিন মীনার বাইরে কোথাও এমনকি মক্কাতেও রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ।

আজকে অর্থাৎ ১১ যিলহজ মসজিদে খায়েফের জামাআতে অথবা নিজের তাঁবুতে যোহরের নামায আদায় করে তিন জামারাতেই কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। যাওয়াল এর ঠিক পরপরই যোহরের নামায আদায় করে রমী করার জন্য বেরিয়ে যেতে হবে। আজকে যাওয়ালের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় রমী করা যায়। তবে যোহরের পরেই করা ভাল। যাওয়ার পথে প্রথমেই পড়বে জামারাতুল উলা বা ছোট শয়তান। পূর্বে অর্থাৎ ১০ যিলহজে যেমন ভাবে জোমারাতুল আকাবয় কাঁকরা নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই একই নিয়মে 'বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার' বলে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। রমী শেষ করে ডানদিকে সরে গিয়ে কেবলা মুখী হয়ে দোওয়া চাওয়া ভাল। এসতাগফার পড়ে, দরূদশরীফ ও তসবিহ পড়ে ও পরিবাবর্গ, আত্মীয় বন্ধু সকলের জন্য মোনাজাত করুন। এরপর সামনের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেই জামারাতুল ওসতা বা মেজ শয়তান। জামারাতুল উলার মতই এতেও সাতটি কাঁকর একই নিয়মে নিক্ষেপ করতে হবে। এরপর একটু সরে গিয়ে দোওয়া চান যেমন যতক্ষণ জামারাতুল উলাতে চেয়েছেন। এরপর আরও একটু এগিয়ে গেলেই জামারাতুল আকাবা। এখানে আগের দিনও কাঁকর নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই একই ভাবে আজও আবার সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। এখানে কাঁকর নিক্ষেপ শেষ করে আর না দাঁড়িয়ে বা না দোওয়া চেয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে চলে যান। এখানে দোওয়া চাওয়ার বিধান নেই। নবী (সা:) তাই করেছেন। অত্যধিক ভিড়ে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য সব জামারা পর্যন্তই বিভিন্ন রাস্তা থেকে ফ্লাইওভার করে দিয়েছেন। ফলে হাজিগণ ফ্লাই-ওভারের উপর থেকে ও নীচের রাস্তা থেকে রমী বা কাঁকর নিক্ষেপ করতে পারেন। যে সকল কাঁকর একবার ছোড়া হয়েছে তা কুড়িয়ে বা ঐ জায়গায় পড়ে থাকা কাঁকর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনে

মীনাতেই অন্য জায়গা থেকে কাঁকর সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ বৈধ। যোহরের অর্থাৎ যাওয়ালের পূর্বে রমী করা যাবে না।

ঙ. ১২ যিলহজ্জ, হজ্জের পঞ্চম দিনের করণীয়

আগের দিনের মত একই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ যাওয়াল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় আগের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী তিনটি জামারাতেই রমী (কাঁকর নিক্ষেপ) করতে হবে। যদি কারও গত দুদিনে কোরবানী বা তাওয়াফে যিয়ারাত না করা হয়ে থাকে তাঁরা আজ তা করতে পারবেন। আগের দিনের নিয়মে আজও জাওয়ালের পূর্বে রমী করা যাবে না।

১২ যিলহজ্জ রমী করার পর চাইলে রমী করার জন্য তের যিলহজ্জ মিনায় থাকা যায়। আর চাইলে ১২ যিলহজ্জ রমী করার পরই মীনা থেকে মক্কা শরীফ চলে আসা যায়। তবে এদিনের যাওয়া সূর্যাস্তের পূর্বে হতে হবে। অর্থাৎ আজ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করা যায় কিন্তু যদি মীনাতে থাকতে থাকতে সূর্যাস্ত যায় তাহলে আর মীনা ছেড়ে যাওয়া যাবে না। পরের দিন অর্থাৎ ১৩ যিলহজ্জ আগের মতই রমী করতে হবে। কারণ, ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর মীনাতে থাকলেই পরের দিন রীম করা ওয়াজেব হয়ে যাবে। এদিনের রমী না করে আসা যাবে না। রমি না করে চলে এলে দম দেওয়া ওয়াজেব হয়ে যাবে। আসলে ১৩ তারিখে রমী করা ওয়াজেব নয় কিন্তু যেহেতু ১২ তারিখও রাত্রি মীনাতে অবস্থান করা হয়ে গেছে ও সকাল হয়ে গেছে সেহেতু এ দিন রমী করা ওয়াজেব হয়েছে। ১২ যিলহজ্জ যোহর ও আস্বরের মধ্যেই মীনার তাঁবু প্রায় ফাঁকা হতে শুরু করে। কারণ, প্রায় অধিকাংশ হাজিই আজ এই সময় মীনা ছেড়ে মক্কা শরীফ রওয়ানা হয়ে যান। আজ ঐ লোকের বড়ই আনন্দের, বড়ই তৃপ্তির, যিনি এ কদিন তাকওয়ায়ী সহকারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করেছেন। হজ্জের কোন কাজই আর বাকী নেই। এবার কেবল মাত্র মক্কা শরীফ ছেড়ে নিজ দেশে বা মদিনা মানাওয়ারায় যিয়ারাতে যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফে বেদা বাকী।

ঝ. মক্কা থেকে বিদায় পর্ব ও তাওয়াফে বেদা

হজ্জের পর যতদিন না দেশে ফেরা বা মদিনাশরীফ যাওয়ার ব্যবস্থা হয় ততদিন এই বরকতময় শহরেই অবস্থান করুন। এখানে থাকার সময় সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকর, তেলাওয়াত ও নানা সৎ অভ্যাসের মধ্যে মশগুল থাকা

বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বায়তুল্লাহ্‌র সামনে পবিত্র হেরেমে খুব বেশী করে নফল নামায ও খুব বেশী করে তাওয়াফ করা উচিত। এখানে প্রত্যেক ভাল কাজে লক্ষগুণ সওয়াব অর্জিত হয়। এছাড়া সর্বক্ষণ তাসবিহ তাহলিল ও নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লামের উপর দরূদ পড়া ও সালাম জানানো উত্তম কাজ।

মিকাতের বাইরের সকল হাজিকেই মক্কাশরীফ ত্যাগ করার আগে তাওয়াফে বেদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এঁদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজেব। তবে যদি কোন মহিলার ঋতু বা নেফাস অবস্থা হয় তাহলে তার উপর এই তাওয়াফ প্রযোজ্য নয়। হাদিস শরীফে আছে—"লোকদিগকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে তাদের শেষ সময়টি যেন বায়তুল্লা হতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঋতুবতী নারীদিগকে এ বিষয় অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।"—বোখারী-মোসলেম

তামাত্তো, এফরাদ বা কেরান যে কোন প্রকারের হজের নিয়ত হোক না কেন তাওয়াফে বেদা ওয়াজেব হবে। তবে যদি কেউ তাওয়াফে যিয়ারাতের পর নফল তাওয়াফ করে থাকেন তাহলে তাঁর তাওয়াফে বেদা আদায় হয়ে যাবে। তাওয়াফে যিয়ারাতের পর যদি কোন অসুবিধা বা প্রয়োজনে মক্কা-ত্যাগ করা না যায় তাহলে মক্কাশরীফ ত্যাগ করার পূর্বে পুনরায় এই তাওয়াফ করে নেওয়া মুস্তাহাব। এই তাওয়াফের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তাওয়াফে যিয়ারাতের পর মকাশরীফ অবস্থান কালে যে কোন দিন. যে কোন সময় নিয়ত করে এই তাওয়াফ করা যায়। (নিয়ত ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাওয়াফে বেদায় রমল করতে হবে না। কিন্তু তাওয়াফে বেদার পর যথারীতি দুরাকাত নামায পড়ে যে কোন জায়গায় গিয়ে প্রাণভরে যমযমের পানি করুন, বক্ষ ও শরীরে লাগিয়ে নিন। সম্ভব হলে তাওয়াফে বেদার পর কাআবা শরীফের দেওয়ালে বুক ও ডান গাল ঠেকিয়ে চৌকাঠ বা গেলাফ স্পর্শ করে একান্ত বিনয়, ভক্তিসহকারে কান্নাকাটি করে প্রাণভরে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন। এই শেষ তাওয়াফের সুযোগে প্রাণ খুলে সমস্ত আবেগ দিয়ে মনপ্রাণ ভরিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করুন। মক্কাশরীফে অবস্থানকালে যা বেয়াদবি হয়েছে, যা ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে সবকিছুর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। হজ কবুলের জন্য ও তার দোষত্রুটি ক্ষমার জন্য দোওয়া চেয়ে নিন। নিজ নিজ পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব, দেশবাসী ও মুসলিম জাহানের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা দরকার।

কে জানে এটাই হয়ত আপনার জীবনের শেষ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও দর্শন। তাই এই শেষ দর্শনে দোওয়া প্রার্থনা করে আল্লাহো আকবার বলে কাআবা শরীফের এই শেষ দর্শনকে হৃদয়ভরে অনুভব করবেন। হাজরে আসওয়াদকে শেষ বারের মত চুম্বন দেওয়া বা ইশারায় চুম্বন দিয়ে আল্লাহো আকবার বলে বাবুল বেদা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মক্কায় অবস্থান কালে আগে থেকেই বাবুল বেদা চিনে রাখতে হয়।

আমাদের দেশের অনেকে কাআবা শরীফের দিকে মুখ রেখে পিছন পায়ে হেঁটে বের হয়ে আসেন। এরকম কোন নিয়ম শরীয়তের বিধানে নেই। নবী (সা:) ও সাহাবীগণ এরকম করে বের হননি। তাঁরা সকলেই সোজা হেঁটে বের হয়েছেন। তাই হাদিসবিদগণ বলেছেন, "বায়তুল্লাহ্ কে বিদায় জানিয়ে যখন হাজিগণ মাসজিদুল হেরেম থেকে বের হতে চাইবেন, সোজা মুখেই হেঁটে বের হবেন। বায়তুল্লাহর দিকে মুখ রেখে কখনই উল্টো পায়ে হেঁটে বের হবেন না।" এই সকল হাদিসবিদগণের মতে উল্টো পায়ে হেঁটে বের হওয়া নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি বা সুস্পষ্ট বেদআত। নবী (সা:) বলেছেন, "সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমরা নবআবিষ্কৃত কাজ থেকে দূরে থেকো। কারণ প্রত্যেকটি নতুন কাজ বেদআত আর প্রতিটি বেদআতই পথভ্রষ্টতা।"

বিদায়ী তাওয়াফের পর বের হওয়ার সময় পড়ার দোওয়া : "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হযরত মোহাম্মাদ (সা:)-এর উপর দরূদ ও সালাম। হে পরওয়ার দেগার প্রভু আল্লাহ্। আমার সমুহ গোনাহকে মাফ করে দাও, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমার জন্য তোমার হালাল রুজি আর তোমার অনুগ্রহ ও বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। ওগো মাবুদ, তুমি আমার এই শেষ কামনা কবুল করে নিও।

এর পর হেরেম শরীফের দরজায় পৌঁছে শেষবারের মত কাআবা ঘরকে প্রাণভরে দেখে দৃষ্টি সার্থক করে নিন। এই সময় পড়ুন :

"আলহামদো লিল্লাহে হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যেবাম মোবারাকান ফীহ্, আল্লাহুম্মার যোক্বনীল আউদে বাআদাল আউদিল মার্‌রাতে এলা বায়তেকাল হারামে ওয়াজআল্নী মিনাল মোকাররাবিনা ইন্দাকা ইয়া যালজালালে ওয়াল একরাম।"

বাংলায় : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনিই এই নেয়ামাত ও বরকত দান করেছেন। ওগো আল্লাহ্। বারবার তোমার এই বরকতময় দরবারে

হাজির করো প্রভু! আবার তোমার এই পবিত্র ঘর দুচোখ ভরে দেখার সৌভাগ্য দান করো। ওগো আল্লাহ্ তুমি আমার হজকে কবুল করে নিও। আমাকে তোমার প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফিক দিও। আমার এই দেখা যেন কাআবা শরীফকে শেষ দেখা না হয়, আর যদি এই মহিমাময় ঘর দেখার সুযোগ না হয়, হে কৃপাময় আল্লাহ্ তাহলে আমাকে জান্নাত দান করো।" আমীন।

এবার বের হয়ে পরবর্তী কর্তব্যের বা মদিনা শরীফ যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদিনা শরীফ যিয়ারাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদিনা শরীফের গুরুত্ব

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যাঁর জ্যোতিতে আকাশ, মাটি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পাহাড়, ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ যাবতীয় সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের নেতা ও মহা মানবরূপে সকলের শেষে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আমাদেরকে পাপ পুণ্যের পার্থক্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোরআন মজীদ তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আমাদের ইহকালের পরিত্রাণের জন্য যাঁকে শাফীউল মুজনাবীন উপাধি প্রদান করেছেন, সেই হাবীবে আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মদীনা মানাওয়ারার মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যেখানে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরা ছিল সেই স্থানে মানবদৃষ্টির অগোচরে মাজার শরীফের মধ্যে অবস্থান করছেন।

হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা একটি বড় ফযীলতের কাজ। হজের আগে বা পরে মদিনা শরীফ তথা মসজিদে নাবাবী যিয়ারাত সুন্নত কাজ। একে সর্বশ্রেষ্ঠ মুস্তাহাব ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিবের নিকটবর্তী বলা হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) বলেছেন :

"মান যারা ক্বাবরী ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতী।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য সুপারিশ করা আমার পক্ষে ওয়াজিব হলো।

তিনি আরও বলেছেন :

"মান হাজ্জা ফাযারা ক্বাবরী বাআদা মাওতী কানা কামান জারানী ফি হায়ওয়াতী।"

"আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি হজ করে আমার কবর যিয়ারত করবে, সে যেন জীবিত অবস্থায়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।"

তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ করল অথচ আমার যিয়ারাত করল না, সে আমার প্রতি অসম্মান দেখাল।" আরও বলেছেন, "যে আমার যিয়ারত করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে।"

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি মক্কাশরীফে এসে হজ করবে এবং আমার মসজিদ যিয়ারাত করবার জন্য আসবে, তাঁর জন্য দুই হজ কবুল হবে।"

তিনি বলেছেন, "আমার মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায, মসজিদে হেরেম ব্যতীত, অন্যান্য মসজিদের এক হাজার (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

তিনি আরও বলেছেন, "মসজিদে হেরেম, আমার এই মসজিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য সফর করবে না।" আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার মসজিদে একাদিক্রমে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং তার মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দিবেনা তার জন্য দোযখ হতে মুক্তি লিখিত হবে।" মসজিদে নাবাবীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নত। মদিনা শরীফে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) যে মসজিদ প্রস্তুত করেছেন তাকে মসজিদে নাবাবী বলা হয়। পরে ঐ মসজিদ যতটা বড় করা হয়েছে তাও মসজিদে নাবাবী হিসাবেই পরিগণিত হবে। হযরত নিজেই বলেছেন, "আমার মসজিদকে ইয়েমেন পর্যন্ত বর্ধিত করলেও তা আমারই মসজিদ।"

ক. মদিনা শরীফ ভ্রমণ শুরু

আজকাল হাজিদের দুভাবে মদিনা শরীফ যেতে হয়। এই যাওয়ার বিষয় স্বেচ্ছাধীন নয়। সৌদি সরকার ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ভাবে ব্যবস্থা করেন। ফলে যাঁরা হজের যথেষ্ট আগে জেদ্দা পৌঁছান তাঁদের জেদ্দা থেকে সরাসরি মদিনা শরীফ যেতে হয়। আর যারা হজের কাছাকাছি সময় জেদ্দা পৌঁছুবেন তাদের সোজা মক্কা শরীফ যেতে হবে এবং মক্কা শরীফ থেকে হজের পরে মদিনা যেতে হবে। বর্তমানে এসবই ঠিক হয় সৌদি সরকারের হজ দপ্তরের নিয়মানুসারে।

যাঁরা হজের যথেষ্ট আগে পৌঁছুলেন তারা জিনিষপত্র সহ জেদ্দা থেকে সোজা মদিনা যাবেন। বাস এখান থেকে সোজা মদিনাতে নিয়ে যাবে। আর যদি মক্কা থেকে যাওয়ার ব্যাপার হয় তাহলে মোয়াসসেসা থেকেই আপনার মদিনা যাওয়ার দিন জানাবে। তবে যাঁদের নিজেদের কাছে পাসপোর্ট থাকবে তাঁরা অনেকেই নিজেদের উদ্যোগে গাড়ী ভাড়া করে মদিনা যেতে পারবেন। যেহেতু সরকারী ভাবে হাজিদের মদিনা যাওয়ার ব্যবস্থা করার দায় দায়িত্ব মোয়াসসেসার এবং পাসপোর্ট তাঁরা অফিসে জমা রাখার অনুমতি পেয়েছেন সেহেতু তাঁরা হাজিদের পাসপোর্ট ফেরত না দিয়ে মোয়াসসেসার তত্ত্বাবধানে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। এক্ষেত্রে নিজেদেরই উদ্যোগ নিয়ে মোয়াসসেসার লোকজনকে বুঝিয়ে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখতে হবে। যারা আগেই মক্কা শরীফ পৌঁছুবেন তাদের মক্কা-মদিনা, মক্কা-মীনা-আরাফার নির্দিষ্ট গাড়ীভাড়া জমা দেওয়ার জন্য মোয়াসসেসা কর্তৃপক্ষ নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। তবে আইনতঃ এটা বাধ্যতামূলক নয়। যাঁরা চাইবেন নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজেরা মদিনা শরীফ যেতে পারবেন। আপনার মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার জন্য সরকার যে সময় নির্দ্ধারণ করে থাকেন সেই মত মোয়াসসেসা প্রত্যেককে জানান এবং তাঁদের গাড়ীতে না গেলে নির্দিষ্ট দিনের আগে প্রত্যেকের পাসপোর্ট দিয়ে দেন। তাই এনিয়ে খুব অসুবিধায় পড়ার কারণ নেই। তবে যারা মদিনায় একটু বেশীদিন থাকতে চান তাদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়। এতে উৎকণ্ঠিত না হয়ে মক্কা শরীফে স্থির হয়ে অপেক্ষা করা ভাল যখন মদিনা যাওয়ার দিন নির্দ্ধারিত হবে সেই মত যাওয়াই শ্রেয়।

যাঁরা আগে মক্কা শরীফ যাবেন তাঁদের হজ্জের পর মদিনা শরীফ যাওয়ার সময় নিজের জিনিষপত্র গোছগাছ করে নিয়ে চলে যাওয়াই উত্তম, কারণ মদিনা থেকে আর মক্কায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। এবার দেশে ফেরার জন্য মদিনা থেকে সোজা জেদ্দা পৌঁছে যেতে হয়। তাই জিনিষপত্র কিছু মক্কায় রেখে যাওয়া যাবে না। তবে যদি কেউ মক্কার বাসায় থাকেন এবং তিনি যদি মক্কা থেকে সব জিনিষপত্র সোজা জেদ্দায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেন তাহলে হাল্কা জিনিষ পত্র নিয়ে মদিনা চলে যেতে পারা যায়। এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে কুলিদের লোকজন জিনিষপত্র মক্কা থেকে জেদ্দায় পৌঁছানর দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। তেমন হলে ওদের দায়িত্বেও জিনিষপত্র দিয়ে ১০/১২ দিন মদিনায় কাটানোর মত জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চলে যাওয়া যায়। ওঁরা সব জিনিষই গোছগাছ করে জেদ্দায় নিয়ে যাবেন আপনি জেদ্দায় গিয়ে মদিনাতুল হোজ্জাজে তা পেয়ে যাবেন।

আর যাঁরা জেদ্দা থেকে মদিনা যাবেন তাদের সব জিনিষই সঙ্গে নিয়ে মদিনা শরীফ চলে যেতে হবে আবার মদিনা শরীফ থেকে সব কিছু সঙ্গে নিয়ে মক্কা শরীফ যেতে হবে এবং ফেরার সময়ের ১/২ দিন আগেই মক্কা থেকে জেদ্দায় পৌঁছে যেতে হবে।

মদিনা শরীফ মক্কা শরীফের উত্তর দিকে। দূরত্ব ২৭৭ মাইল বা ৪৫০ কিলোমিটার। গাড়ীতে ৭/৮ ঘন্টা সময় লাগে। মক্কা থেকে প্রতিদিনই এশার পরে কিছু প্রাইভেট ও GMC গাড়ী যায়। তাছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাক্সারী বাসও চলাচল করে। মক্কাতেই মদিনাগামী বাসের গুমটি আছে সেখান থেকে বাস যায়। GMC গাড়ীতে মাথা পিছু ভাড়া ৫০ রিয়েলের কাছাকাছি। দরদাম করে নিতে হয়। একটা GMC গাড়ীতে ১৪/১৫ জন যাওয়া যায়। প্রাইভেট কারে ভাড়া ৮০ থেকে ১০০ রিয়েল। লাক্সারী বাসে ভাড়া ৬০/৬৫ রিয়েল। সাধারণ বাসও চলাচল করে ভাড়াও যথেষ্ট কম। তবে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করা কিছুটা অসুবিধা জনক। তবুও যাওয়া যায়। হেরেম শরীফের আশেপাশে এবং ভারতীয় এমব্যাসী অফিসের সামনে GMC ও প্রাইভেট গাড়ী পাওয়া যায়।

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে নিজেরা পরামর্শ করে অবস্থানুযায়ী কি ভাবে যাওয়া হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। সেইমত জিনিষপত্র ঠিক ঠাক করে নির্দিষ্ট দিনে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে। মদিনা শরীফ যাওয়ার গাড়ী ভাড়া করার সময় গাড়ীর চালকের সঙ্গে কথা বলে

নিতে হবে যে গাড়ী যেন বিখ্যাত বদর প্রান্তর হয়ে যায়। এখানে নেমে হুয়াকাআত নফল নামায আদায় করে শহিদানদের কবর যিয়ারাত করা বিশেষ পুণ্যের কাজ ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বদর ইসলামের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই মুসলমানদের সঙ্গে কোরায়েশ-দের বিশাল বাহিনীর যুদ্ধ-সংগঠিত হয়েছিল। সে এক সুগভীর সঙ্কটময় অবস্থা। আমরা এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্মৃতিচারণা করে নেব এখানেই।

খ. বদরের স্মৃতিচারণ

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কোরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় পৌঁছেছেন। এখানে মদিনাবাসীগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। হযরতের মদিনা আসার পর ইসলাম নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে একের পর এক মানুষের হৃদয় জয় করছে। মদিনাতে হযরত এক ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রেরও পত্তন করেছেন। এসব খবরই মক্কার কোরায়েশরা রাখত। হযরতের এই অগ্রগতিতে তারা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হচ্ছিল। এমনি করে দুটি বছর বেশ কেটে গেল। এবার এই শিশুরাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য কোরায়েশরা মরিয়া হয়ে উঠল; তারা চায় যেনতেন প্রকারে হযরত মোহাম্মাদ ও তাঁর সদ্যোজাত রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে। আবুযেহেল প্রমুখ কোরায়েশ নেতা মদিনার মুসলিম নিধনের দ্বারা এই শিশু রাষ্ট্রকে নির্মূল করার জন্য নানা ছল ছুতার আশ্রয় খুঁজতে থাকল।

সময় মত একটা সুযোগও তারা পেয়ে গেল, হযরত কোরেশদের চক্রান্তের বিষয় জানতে পেরে ৮ জনের একটা গোয়েন্দা দল তৈরী করে মক্কার উপকণ্ঠে পাঠালেন, এই গোয়েন্দা দলের নেতৃত্ব ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশ নামীয় এক প্রবাসী মুসলমানের উপর। গোয়েন্দা দল মক্কার উপকণ্ঠে 'নাখলা' নামক জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ কোরেশদের একটা বণিক দলের সামনা সামনি হয়ে পড়ে। এখানে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায় এবং কোরেশ দলের একজন নিহত হয়।

এই ঘটনায় কোরেশগণ মদিনা আক্রমণে বদ্ধ পরিকর হয়। চারিদিক থেকে অর্থ, রসদ ও অস্ত্র সংগৃহীত হতে থাকল। আল্লাহ্‌র নবী যথাসময় খবর পেয়ে গেলেন।

যুদ্ধের কালো মেঘ মদিনার আকাশে ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকল।

ইতিমধ্যেই মক্কা থেকে কোরেশরা কয়েকবারই মদিনায় হানা দিয়ে লুঠতরাজ করেছে। এবার আবুযেহেলের নেতৃত্বে একশত অশ্বারোহী ও আটশত পদাতিক বাহিনী প্রভৃত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকল। এবার মুসলমানদের এবং তাদের নবী মোহাম্মাদকে সা: তারা সমূলে ধ্বংস করে তবে ফিরবে এই প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে ছুটে চলল মদিনার পথে। সেদিন ৪ঠা জানুয়ারী ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ ৮ই রমজান দ্বিতীয় হিজরী।

আল্লাহ্‌র নবী এবার কিন্তু অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এতদিন তিনি মুসলমানদের উপর সব রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন, নিষ্ক্রিয় ভাবে প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। এবার তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন, আর নয়, আর এই ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়া নয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ হত্যার কথা ভেবে তিনি কাতর হলেন তবুও তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণই ঠিক করলেন। আর তাঁর এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে আল্লাহ্ অহি পাঠালেন: "আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে।" (কোরআন ২ : ১৯০)

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিল প্রেম-ক্ষমার যেমন প্রয়োজন, যুদ্ধ বিগ্রহেরও তেমনই প্রয়োজন। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, ধর্ম ও আদর্শ রক্ষা, পীড়িত ব্যথিতকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণও প্রেম-ক্ষমারই অঙ্গ।

যুদ্ধ আসন্ন দেখে হযরত সাহাবিদের সভা আহ্বান করলেন, করণীয় বিষয় কি হবে তা আলোচনা শুরু হল। নানা বাদানুবাদের পর ঠিক হয় কিছু সংখ্যক লোক মদিনায় থেকে নগরের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন আর কিছু সংখ্যক লোক শহর থেকে বাইরে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের বাধা দেবেন। কিন্তু হলে কি হয়! মুসলমানদেরতো কোন অস্ত্র নেই, এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার অভিজ্ঞতা নেই, তবু যৎসামান্য অস্ত্র নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে সেনাপতির বেশে আল্লাহ্‌র নবী রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন।

ইসলাম আজ সর্বপ্রথম দৃপ্ত তেজে আত্মরক্ষায় অস্ত্র ধারণ করল। ইসলাম জীবনের ধর্ম ; আত্মবিলুপ্তি ও ভীরু কাপুরুষতার মিনতি তার বাণী নয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নির্বিকার চিত্তে অন্যায় মেনে নেওয়া ইসলামের আদর্শ নয়। অত্যাচারীকে প্রতিরোধ কর অত্যাচারিতকে রক্ষা কর। প্রয়োজনে আঘাত কর, সত্যের প্রয়োজনে সংগ্রামে মৃত্যু বরণ কর।

এই সত্যকে রূপ দিতেই আজ হযরত দৃপ্ততেজে এগিয়ে চললেন।

সেদিন ৮ই জানুয়ারী ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই রমজান দ্বিতীয় হিজরী, সেনাপতি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আশি জন মোহাজের, দু'শজন আনসার সত্তরটি উট, দু'শ অশ্ব, ছ'খানি বর্ম ও মাত্র আটখানা তরবারী সঙ্গে নিয়ে মদিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে যাত্রা শুরু করলেন। দু'দিন পথ অতিক্রম করে তৃতীয় দিনে পৌঁছলেন বদর প্রান্তরে। সেদিন বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাস। বদরের পূর্বদিকের পাহাড়ে ঝরণার উৎসমুখে হযরত শিবির স্থাপন করলেন। ১৭ই রমজান কোরেশগণ বদর প্রান্তরে পৌঁছুল। অসংখ্য সৈন্য দর্শনে মুসলমানগণ একটু ভাবিত হলেন। তখন সেনাপতি হযরত দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে বললেন "ভয় করো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সহায়।" আরও বললেন আগে আক্রমণ করো না।

এখানেই সংঘটিত হল এই অসম যুদ্ধ। তখনকার দিনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। কোরায়েশদের মধ্য থেকে আতবা, ওয়ালীদ ও শায়বা এগিয়ে এসে মুসলমানদের যুদ্ধের আহ্বান জানালো। এবার রাসূলুল্লাহ্‌ হামযা, ওবায়দা ও আলীকে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিন বীরই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের উপর। মুহূর্তে হযরত আলী ওয়ালিদের শিরচ্ছেদ করলেন, হামজা আতবাকে আক্রমণ করে নিহত করলেন ওবায়দা শোয়াবাকে নিহত করলেন কিন্তু তিনিও এই যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। সামান্য সময় তিনজন বীরকে প্রাণ হারাতে দেখে ক্ষুব্ধ কোরায়েশগণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তারা নিয়ম ভেঙ্গে সমবেত ভাবে মুসলমানদের আক্রমণ করলেন।

তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকল, নব অস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার সঙ্গে মাত্র ৩১৩ জন মামুলি হাতিয়ার ধারীর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ মক্কা-মদিনার যুদ্ধ নয়, কোরেশ মুসলমানের যুদ্ধ নয় এ যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ, অন্ধকার আলোকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোরায়েশ বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধে কোরায়েশদের আবুযেহেল সহ ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হলো। মুসলিমগণ তাদের ১৬ জন সঙ্গীকে হারালেন। এই ১৬ জন মুসলিম যোদ্ধার কবর আছে এই প্রান্তরে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ কঙ্করময় মাঠের মাঝখানে ঘিরে রাখা আছে এঁদের কবরের জায়গা। সামনে রাস্তায় তাদের জন্য নির্মিত হয়েছে স্মৃতি ফলক।

বদর যুদ্ধে জয়লাভে মুসলমানদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেল। মুসলমানগণ যে আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিশালী তা এই যুদ্ধে স্পষ্ট

হয়ে উঠল। শত্রু সংখ্যা যে ভয়ের কারণ নয় তা মুসলিম বাহিনী প্রথম বারের যুদ্ধেই উপলব্ধি করল। মুসলমানগণ দৃঢ় প্রত্যয় ফিরে পেল, তারা বুঝল যে আল্লাহ্‌র শক্তিতেই তারা অজেয়, দুর্বার, দুর্দমনীয়। ইসলাম যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম আর হযরত যে আল্লাহ্‌র নবী তা সকলের কাছে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তাছাড়া জীবনযুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে তা এই যুদ্ধেই প্রথম বাস্তবায়িত হল।

বিজয়লব্ধ রণসম্ভার আর বন্দীদের নিয়ে হযরত মদিনায় ফিরে এলেন দুদিন পরে। মুসলিম মদিনা আবার আল্লাহ্‌র গুণকীর্তনে মুখর হয়ে উঠল। সংক্ষিপ্ত ভাবে বদরের ঘটনার উল্লেখ করা হল মাত্র। আগ্রহী পাঠকগণ ইতিহাস পাঠ করে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা করে নেবেন।

গ. মক্কা থেকে মদিনার ভ্রমণ পথ

মদিনা শরীফ যাওয়ার আগেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে ইসলাম ধর্মের মহান সংস্কারক আল্লাহ্‌র নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হতে চলেছেন। এমন একজন বিশ্ব নেতার দরবারে হাজির হতে চলেছেন যাঁর কাজে এবং কথায় কোথাও এতটুকু পার্থক্য নেই। যিনি যা করেন নি এমন একটি বিধানও মানবের পালনের জন্য নির্দ্ধারণ করেন নি। সেই একক একনিষ্ঠ আল্লাহ্‌ প্রেমী, বিশ্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক, বিশ্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, বিশ্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ মানবপ্রেমী মহানবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দরবারে চলেছেন। তাই রাস্তায় সর্বক্ষণ তাওবা আসতাগফের এবং তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়ায় নিজেকে তন্ময় করে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

পর্বত ঘেরা মরুভূমির বুক চিরে বেরিয়ে গেছে মসৃণ বিশাল চওড়া রাস্তা। রাতের যাত্রী হলে আধো আলো আঁধারীতে দূর দিগন্তের সব কিছু দেখা যাবে না। তবুও বিশাল ধূ ধূ মরুর নির্জনতা ভেদ করে ছুটে চলা গাড়ীর মধ্যেই অনুভূত হতে থাকবে নির্জন নিথর মরুর স্পন্দন। রাতের মরুভূমি ঠাণ্ডা। তাই গাড়ীর কাঁচ খুললেই এতদিনের অসহ্য গরমের দাবদাহ ভুলিয়ে দেবে নিমেষে। মৃদু শীত অনুভূত হয়ে আবেশে বিহ্বল হয়ে যাবে শরীর। দূরে দূরে আলো দেখা যাবে। তাছাড়া গাড়ীর ও যাত্রীর বিশ্রামের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চটি আছে সেখানে বিরাট ছাউনি আর অসংখ্য দড়ির খাটিয়া। এখানে চা নাস্তা খাবার সবই পাওয়া যাবে। আর আরবী গড়গড়া। প্রাস্ক

ড্রাইভারই এই সকল চটিতে যাত্রী নামিয়ে গড়গড়া টানতে বসে যায়। এই চটিগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো পাখা এয়ারকণ্ডিশনার, ফ্রীজ সবই আছে।

এই রাস্তা ধরেই গাড়ী দ্রুত এগিয়ে চলবে। এ পথের এক জায়গা থেকেই বেরিয়ে গেছে রাজধানী রিয়াদের পথ। দূরে রিয়াদ শহরের আশ-পাশের বৈদ্যুতিক আলোর মিটিমিটি রূপ রেখাও দৃষ্টি পথে পড়বে। এ সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে মানসিক দিক থেকে তৈরী করতে হবে হযরতের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তাঁর নির্দেশিত পথে চলার ত্রুটি বিচ্যুতি স্মরণ করে তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়তে হবে। চৌদ্দশত বছর পিছিয়ে একবার ভেবে নেওয়া যায়, হযরত নবী (সাঃ) অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা অসহ্য হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে হিযরত করেছিলেন মক্কা থেকে মদিনায়।

কোরায়েশ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিল যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে খুন করে ইসলামকে নির্মূল করবে। তাই তারা নানা পরামর্শের পর হযরতের গৃহ অবরোধ করল। উদ্দেশ্য পরদিন প্রভাতে তাঁকে খুন করা। আল্লাহ্‌র ফেরেশতা জিব্রাইল হযরতকে সব চক্রান্তের কথা অবগত করিয়ে মক্কা ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেইমত তিনি তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে স্থর পাহাড়ের গিরিগুহায় তাঁরা তিনদিন অতিবাহিত করলেন। চতুর্থ দিনে তারা গিরিগুহা থেকে বের হলেন। হযরত আবুব-করের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌ এবং ভৃত্য আমরও তাদের মদিনা যাত্রার সঙ্গী হলেন। দুটি উটের একটিতে আল্লাহ্‌র নবী অপরটিতে আব্দুল্লাহ্‌ ও তাঁর ভৃত্য। মোট বার জন যাত্রীর এই ক্ষুদ্র কাফেলা আল্লাহ্‌র নামে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

তখন না ছিল এমন মসৃণ পথঘাট আর না ছিল যানবাহন। উটের পিঠে বারজনের কাফেলা অতি সন্তর্পণে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে পাহাড়ী মরুপথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিলেন মদিনা। ইসলামের সে এক চমকপ্রদ সংকটময় ঘটনা। সে ঘটনা এখানে বিবৃত করে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। উৎসাহী পাঠকগণ ইসলামের ইতিহাসের হিযরতের অধ্যায় আগে থেকেই হৃদয়ঙ্গম করে রাখবেন।

রাস্তায় কোন না কোন চটিতে ড্রাইভার গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেখানে সকলে নেমে চা পান করতে পারেন। মরুভূমির বুকে চটি। এই সকল চটিতে পানির ব্যবস্থা আছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটান যায়।

ওজু নামায সবেরই ব্যবস্থা আছে। এখানে বিশ্রামের পর গাড়ী ছেড়ে সোজা বদর প্রান্তরে দাঁড়াবে। বদরে নেমে শহিদানদের কবর যিয়ারাত করে নামায আদায় করে আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করুন। দিনের বেলায় হলে বদরের প্রান্তরের প্রাচীর ঘেরার ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব। রাতের যাত্রী হলে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গাড়ী এখানে পৌঁছায় ফলে ভিতরে প্রবেশ সম্ভব হয় না। তবে পাশেই মসজিদ ও ওজু গোসলের, প্রস্রাব পায়খানার জন্য সব ব্যবস্থা করা আছে। প্রয়োজন হলে তা সেরে নেওয়া যায়।

এবার গাড়ী মদিনা শরীফের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে। ফজরের আগেই মদিনা শরীফ পৌঁছে যাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফজরের জামাআতের আগেই মদিনা পৌঁছান যায়। এই পথে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র নবীর উপর দরূদ শরীফ পড়তে থাকবেন। মনে রাখতে হবে এটাও আল্লাহরই নির্দেশ। আল্লাহ্ বলেছেন "হে মুমিন সমাজ! তোমরা নবী (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম জানাও।" (কোরআন)

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসবে। সোবহে সাদেকের আলো দিগন্তের আঁধার সরিয়ে দেবে, এরকম সময়ে মদিনা শরীফের এলাকায় গাড়ী প্রবেশ করবে।

মদিনা শহরে প্রবেশ করার সময় পড়ুন :

১. মদিনা শহরে প্রবেশের দোওয়া

বিসমিল্লাহ্ হির রাহমা নির রাহিম

"আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালামো ওয়া মিনকাস সালাম ওয়া এলাইকা ইয়ারজেউস সালাম, ফা হাইয়্যোনা রাব্বানা বিস সালাম ওয়াদখেলনা দারাস সালাম তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলায়তা ইয়া যাল জালালে ওয়াল একরাম, রাব্বে আদখেলনী মোদখালা স্বেদক্বিঁউ ওয়াখরেজনী মোখরাজা স্বেদকিউ ওয়াজআল্লী মিল্লা দুনকা সোলতানান নাস্বীরা, ওয়া কুল জায়াল-হাক্বো ওয়াজহাকাল বাত্বেলো ইন্নাল বাত্বেলা কানা যাহুকা; ওয়া নোনান যেলো মেনাল কোরআনে মা হোয়া শেফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমেনীনা ওয়ালা ইয়াযীদুজ জালেমীনা ইল্লা খাসারা।"

বাংলায় : করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্ তোমাতেই শান্তি আর তোমা হতেই শান্তি! তোমার কাছেই শান্তির প্রত্যাবর্তন, শান্তির সঙ্গেই জীবিত রাখ হে আমার পরওয়ার দেগার। তোমার শান্তির ঘরে প্রবেশ করিও যা তোমার শান্তির তোমার বরকতের

আধার। হে আমার প্রভু, তুমিই মহামহিম, শ্রেষ্ঠ মহানুভব প্রভু, তুমি আমাকে শান্তির সঙ্গে এই শহরে (মদিনায়) প্রবেশ করাও এবং শান্তির সঙ্গে সেখান থেকে বের হতে দিও। আর তোমার কাছ থেকে আমাকে তোমার সাহায্যের সঙ্গে প্রাধান্য দান কর।

এই পথে অনেক দূর থেকেই বিশ্ব নবীর সমাধির সবুজ গম্বুজ ও মিনার দৃষ্টি গোচর হবে। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত ন্যায়নীতি ও এক স্রানদিষ্ট জীবনধারার প্রতি নিবেদিত প্রাণ আবেগ বিহ্বল হাজার হাজার মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে চলেছে সেই মসজিদে নবাবী ও প্রিয় নবীর যিয়ারাতে।

২ মদিনা শরীফে পৌঁছে করণীয় ও মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশের নিয়ম

মদিনায় প্রবেশ করার আগে সম্ভব হলে গোসল বা ওজু করে নেওয়া দরকার। পরিষ্কার পবিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সুশোভিত হয়ে মদিনা শরীফ প্রবেশ করা উচিৎ।

দেখতে দেখতে পূর্বাকাশে ভোরের আভা দেখা যাবে, আর গাড়ী মদিনা শরীফের মসজিদে নাবাবীর কাছেই এক স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে। এই স্ট্যাণ্ডের সামনেই প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা আছে। এখানে ওজু গোসল সবই করা যাবে। তবে তা না ভেবে প্রথমেই প্রয়োজন বাসস্থানের। এখানে ১০ দিন থাকার জন্য একটা ঘর দেখে নিতে হবে। মক্কা শরীফের মত গরম এখানে নেই। তবুও শীতকাল না হলে বেশ গরম। শীতে ঠাণ্ডাও বেশী। ডিসেম্বর জানুয়ারীর দিকে কম্বল সঙ্গে নিতে হয়।

মদিনা শরীফে নেমে একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাসষ্ট্যাণ্ডে নানাধরনের লোক এসে বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলেন। এঁদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশের মানুষ থাকেন। বাক্যালাপে অসুবিধা হয় না। এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অনেক মুসাফির খানাও আছে। মালপত্র নামিয়ে রেখে দলের একজন বা দুজন গিয়ে থাকার একটা সুবিধামত জায়গা ঠিক করে নিতে হবে। এখানে ১০ দিনের জন্য মাথাপিছু ৫০-৬০ রিয়েলের মধ্যেই ঘর পাওয়া যায়। ক্ষেত্র বিশেষে বেশীও হয়। ঘর ঠিক করে জিনিষপত্র রেখে নিশ্চিন্তে পাকসাফ হয়ে গোসল করে সুগন্ধি লাগিয়ে বিনম্রচিত্তে মসজিদে নাবাবীর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মসজিদে নাবাবীর মধ্যেই আছে মহানবী হযরতের পবিত্র কবর শরীফ। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্‌র

রাসূল বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাঁর কবরের সামনে হাজির হল সে যেন নবীর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উপস্থিত হলো।" তাই পদব্রজে অত্যন্ত বিনম্রভাবে মদিনা শরীফের মাহাত্ম্য ধ্যান করে দরূদ পড়তে পড়তে মসজিদে নাবাবীর দিকে এগোতে হবে।

মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে অন্য কোন কাজে মগ্ন হওয়া উচিত নয়। সকল রকম মানসিক চাঞ্চল্য পরিহার করে অত্যন্ত বিনয়, ভক্তি ও আদবের সঙ্গে মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করা কর্তব্য। মসজিদে নাবাবীর দরজায় উপস্থিত হয়ে পড়তে হবে :

"বিসমিল্লাহে ওয়াস্‌সালাতো ওয়াস্‌সালামো আলা রাসূলিল্লাহে। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতেকা।"

বাংলায় : আল্লাহতাআলার নামে আরম্ভ করছি এবং হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ্‌ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

ঐ দোওয়া ও দরূদ পাঠ করে ডান পা প্রথম বাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। তারপর মসজিদের মধ্যে ঐ স্থানে যেতে হবে যাকে হযরত (সাঃ) বেহেশতের বাগান বলেছেন। আর যদি ভিড় থাকে যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে।

"মা বায়না কাবরী ওয়া মিম্বারী রাওদাতাম মিন রিয়াযুল জান্নাত।"

বাংলায় : আমার হুজুরা এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে জান্নাতের বাগিচা সমূহের একটি বাগিচা রয়েছে।"

হাদীসের এই বাণী ওখানে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

৩. মসজিতে নবাবীতে প্রবেশের দোওয়া

"রাব্বে আদ্‌খেলনী মুদ্‌খালা সিদ্‌কিওঁ ওয়া আখ্‌রেজ্‌নী মুখরাজা সিদ্‌কিওঁ ওয়াজআল্লী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা। আল্লাহুম্মাফ্‌-তাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতেকা ওয়ারযুক্বনী মিন যিয়ারাতে রাসূলেকা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামা মা রাজাক্বতা আওলিয়ায়েকা ওয়া আহলে ত্বাআতেকা ওয়াগ্‌ফেরলী ওয়ারহামনী ইয়া খায়রা মাস্‌উলিন্‌"

বাংলায় : হে প্রভু! আমাকে মঙ্গলের সঙ্গে প্রবেশ করতে ও মঙ্গলের সঙ্গে বের হতে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে তোমার সাহায্যের সঙ্গে প্রাধান্য প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের

দরজা খুলে দাও ও তোমার রাসূলের যিয়ারত নসীব কর, যেমন তোমার অলিগণ ও বাধ্য বান্দাগণের নসীব করেছ। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। আমাকে মাফ করে দাও এবং অনুগ্রহ কর।

মদিনায় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অন্তরে নবীর প্রতি একাগ্র ভালোবাসা জাগরূক রেখে দরুদ ও দোওয়া পাঠ করতে করতে চলাফেরা করা দরকার। সকল সময় মনে রাখতে হবে মদিনার ওলিগলি সব রাস্তাতেই মহানবী চলাফেরা করেছেন। এখানকার সব জায়গাতেই মহানবীর পবিত্র পদ স্পর্শ রয়েছে।

ঘ. যিয়ারাতুন নবী (সাঃ)

মসজিদে নাবাবীর সীমানার পূর্ব দিকে 'বাবে জিবরাঈল' থেকে মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করা উত্তম। সম্ভব না হলে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যাবে। প্রবেশ করে প্রথমে পবিত্র সমাধি ও মিম্বরের মাঝখানের রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেস্তের বাগানের মধ্যে দুরাকাত নফল নামায পড়তে সচেষ্ট হতে হবে। এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করা উচিত। এই নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পড়া উত্তম। ফরজ নামাযের ওয়াক্তে পৌঁছুলে ফরজ নামায আগে পড়তে হবে।

এ মসজিদে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান রাসূলে করিমের নিজস্ব বাস-ভবন। এখানে হযরত আয়েশার হুজরার মধ্যে আমাদের প্রিয় নবীর পবিত্র মাজার শরীফ রয়েছে। এরই পাশে রয়েছে হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের মাজার। মসজিদে নাবাবী ও রওজা মোবারকের দক্ষিণ দিকে বাবে জিব্রাঈল থেকে বাবুস সালাম পর্যন্ত দীর্ঘ কারুকার্যময় হল ঘর রয়েছে। এই অংশটি হযরত ওসমানের সময় নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদে নাবাবীতে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামায ও সেজদায় শুকরিয়া আদায় করে দোওয়া করার পর হযরতের রওজা মোবারক যিয়ারত করতে যেতে হবে। হযরতের রওজার দক্ষিণপশ্চিম কোণে দেওয়ালের সঙ্গে যে থাম আছে তার থেকে তিন চার হাত দূরে রওজার দক্ষিণে উত্তর দিকে মুখ করে বড় গোল কাটার সোজা দাঁড়াতে হয়—যেন হযরতের চেহারা মোবারক নিজের মুখের সোজা হয়। দেওয়ালের খুব কাছে যেতে নেই বা হাত

লাগাতে নেই। কারণ এটি অত্যন্ত সম্মানীয় স্থান। কোন রকম চুম্বন ইত্যাদি কঠিন বেদাআত। অত্যন্ত আদব বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে মনে বিশ্বাস জাগ্রত রাখতে হবে যে হযরত (সাঃ) রওজা মোবারকে কেবলা মুখে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি যিয়ারাতকারীকে দেখছেন, যিয়ারাতকারীর কথা শুনছেন, প্রত্যেকের সালামের উত্তর দিচ্ছেন। কারণ তিনি হায়াতুন নবী। এরপর বিনম্র চিত্তে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে নবীজীর চেহারা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাম পড়তে শুরু করতে হবে। সামনে বিরাট লোহার জাল ঘেরা বেষ্টনীর মধ্যে তিনটি কবর আছে।

প্রথমটি মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর দ্বিতীয়টি ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ) এবং তৃতীয়টি হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ)। সামনের লোহার জালিতে তিনটি গোলাকার ফাঁক রাখা আছে। প্রথমটি একটু বড়, বাকি দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই বড় ফাঁকটিই প্রিয় নবীর চেহারা বরাবর আছে। লোহার জালির গোলাকার ফাঁকটির সোজা দাঁড়িয়ে মহানবী (সাঃ) এর দিকে মুখ করে খানায়ে কাআবার দিকে পিঠ করে অর্থাৎ উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে অন্তরে ভয় জাগরূক রেখে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে তাহরিমা বেঁধে শ্রদ্ধার সঙ্গে সালাম পড়তে শুরু করতে হবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে যদি অতিরিক্ত ভিড় হয় তাহলে মসজিদে নাবাবীর ভিতরের সব জায়গাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা খুবই কষ্ট কর। এমনকি যিয়ারতও অনেক দূর থেকে করতে হতে পারে। বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে যেন কাউকে কষ্ট বা ধাক্কা দেওয়া না হয়। এরপর একটু পূর্বে অর্থাৎ ডান দিকে সরে দ্বিতীয় গোলাকৃতি ফাঁকেব সোজা দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর এর উপর সালাম পড়তে হবে। তারপর আরও একটু পূর্বে অর্থাৎ ডান দিকে তৃতীয় বৃত্তাকার ফাঁকটির সামনে দাঁড়িয়ে হযরত ওমরের উপর সালাম পড়ে বরাবর পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে 'মজুলে অহির' সামনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে দুরাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে হৃদয় ভরে প্রার্থনা ও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুপারিশের অধিকারী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

যদি কেউ তাঁর পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহে্‌র প্রতি সালাম পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করে থাকেন তাহলে নিজের তরফ থেকে সালাম পড়ার পর ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে সালাম পড়া বাঞ্ছনীয়।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর চেহারা বরাবর তাহরিমা বেঁধে দাঁড়িয়ে এই ভাবে সালাম পড়তে হবে :

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَفِيَّ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ وَلَدِ اٰدَمَ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ

… مُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

… مُ عَلَيْكَ يَارَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ
بَرَكَاتُهٗ ـ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ
اَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ
الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا ـ جَزَاكَ
اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ
لِسَيِّدِنَا عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدِ نِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ
وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ وَاَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ
الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়ারাসূলাল্লাহ্।
আসস্বালতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া নাবিআল্লাহ্।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ্।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া স্বাফিয়াল্লাহ্।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া খায়রে খালকিল্লাহ।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদা ওয়ালেদা আদাম।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদাল মুরসালীন।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া খাতামান নাবিয়্যিন।
আসস্বালাতো ওয়াস সালালো আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামীন।
আসস্বালাতো ওয়াস সালামো আলাইকা ইয়া আইয়্যোহান নবিয়্যো ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতোহু। ইয়া রসূলাল্লাহ ইন্নি আশহাদো আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়াশহাদো আন্নাকা আবদোহু ওয়া রাসূলোহু। আশহাদো আন্নাকা বাল্লাগতার রেসালাতা ওয়া আদ্দায়তাল আমানাতা, নাস্বাহতাল উম্মাতা ওয়া কাশ.ফতাল গোম্মাতা ফাজাযাকাল্লাহো খায়রান। জাযাকাল্লাহো আন্না আফদালা মা জামা নাবিয়্যান আন উম্মাতেহী। আল্লাহুম্মা য়াতে লে সাইয়্যেদেনা আবদেকা ওয়া রাসুলেকা মোহাম্মাদেনিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা ওয়াদ দারাজাতার রাফেআতা ওয়াব আসহুল মাকামাম মাহমুদানিল লাযি ওয়াদতাহু ইন্নাকা লা তোখলেফোল মিআদ। ওয়ানযেলাহুল মোনযেলাল মোকাররেবা ইনদাকা, ইন্নাকা সোবহানাকা যুল ফাদলিল আযীম।

বাংলায় ঃ "ওগো আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র নবী আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র বন্ধু, আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম সুপারিশকারী আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো আদম সন্তানদের সর্দার! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো রসূলগণের সর্দার! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো শেষ নবী, আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম, ওগো বিশ্বজগতের করুণা, আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত অবতীর্ণ হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহা (উপাস্য) নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর

কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি তার বান্দা ও তার প্রেরিত দূত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন, আমানাত আদায় করেছেন, অনুগামীদের সৎ উপদেশ দিয়েছেন আর তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করেছেন, আল্লাহ্ আপনাকে এজন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহ্ আপনাকে উম্মতের পক্ষ থেকে নবীর প্রাপ্য মঙ্গল দান করুন। ওগো আল্লাহ্! আমাদের নেতা, তোমার বান্দা ও রাসুল মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে তোমার কাছে মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অধিকারী কর। তাকে ঐ প্রশংসনীয় স্থানে পাঠাও যার আশ্বাস তুমি তাঁকে দিয়েছ, তুমি কখনও ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার। তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান দান কর। তুমি (আল্লাহ্) পবিত্র ও সর্বোচ্চ দানের অধিকারী।"

২. যিয়ারাতে আবুবাকার (রাঃ)

এবার একটু ডান দিকে সরে গেলেই দেখা যাবে সামনের লোহার জালিতে আরও একটি গোলাকার ফাঁকা জায়গা। এই সোজা হযরত আবুবকরের কবর আছে। এই সোজা দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহো আনহুর কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে পড়ুন :—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى التَّحْقِيْقِ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَنْفَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِيْ حُبِّ اللّٰهِ وَ
حُبِّ رَسُوْلِهِ حَتّٰى تَخَلَّلَ بِالْعَبَا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ
وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَ
مَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاْوٰكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ
الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ

আসসালামো আলাইকা ইয়া সাইয়্যাদানা আবা বাকারে নিস স্বিদ্দিক। আসসালামো আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহিত তাহকীক। আস-সালামো আলাইকা ইয়া সাহেবা রাসূলিল্লাহ্ সানিয়া এসনাইনে ইযহোমা ফিল গারে, আসসালামো আলাইকা ইয়ামান আনফাকা মা লাহু কুল্লাহু ফী হোব্বিল্লাহে ওয়া হোব্বে রাসূলেহী-হাত্তা তাখাল্লালা বিলআবা রাদিয়াল্লাহো তাআলা আনকা ওয়ারদাকা আহসানার-রেদা ওয়া জাআলাল জান্নাতা মানযেলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহাল্লাক ওয়া মা-উকা, আসসালামো আলাইকা ইয়া আওয়ালাল খোলাফায়ে ওয়া তাজাল ওলামায়ে ওয়া স্বেহ-রান নাবীয়িল মোস্তাফা ওয়া রাহ মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতোহু।

বাংলায়ঃ "ওগো আমাদের নেতা আবুবাকার সিদ্দিক আপনার প্রতি সালাম। ওগো আল্লাহ্‌র রাসূলের অন্তরঙ্গ খালিফা আপনার প্রতি সালাম। ওগো রাসূলের সঙ্গী, ওগো রাসূলের পর্বতগুহার সাথী আপনার প্রতি সালাম। ওগো সেই দাতা যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগকারী আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ও আপনার কাছ থেকে সেই শ্রেষ্ঠ সন্তুষ্টি দান করুন যা আপনার অবস্থান আপনার গৃহ ও আপনার মহল্লাকে জান্নাতে পরিণত করে দেয়। ওগো প্রথম খলিফা, ওগো বিজ্ঞজন শ্রেষ্ঠ, ওগো নবীমুস্তাফার সেরতাজ আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

৩. যিয়ারাতে ওমর (রাঃ)

মসজিদে নাবাবীতে সর্ব্বমোট এই তিনটি কবর আছে। প্রত্যেকের উচিৎ তিনটি কবর পরপর পৃথক ভাবে যিয়ারাত করে প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট দোওয়া পড়া কর্তব্য।

এবার আরও একটু ডান দিকে সরে গেলেই সামনের জালির যে গোলাকার ফাঁক আছে তার সোজা পৌঁছে যাবেন। এখানে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবর। এখানেও তাহরিমা বেঁধে দাঁড়িয়ে যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে পড়ুনঃ

হযরত ওমরের (রাঃ)-প্রতি সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَنَفِيَّ الْمِحْرَابِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ، اَنْتَ الَّذِىْ قَالَ فِىْ حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ لَوْ كَانَ نَبِىٌّ مِّنْ بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاْوٰكَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَانِىَ الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرَ النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আসসালামো আলাইকা ইয়া ওমারাবনাল খাত্তাবে, আসসালামো আলাইকা ইয়া নাত্বেকাম বিল আদলে ওয়াস স্বাওয়াব, আসসালামো আলাইকা ইয়া হানফিয়্যাল মেহরাব, আসসালামো আলাইকা ইয়ামোকাস-সেরাল আস্বনাম, আসসালামো আলাইকা ইয়া আবাল ফোকারায়ে ওয়াদ দোয়াফায়ে ওয়াল আরামেলে ওয়াল আইতাম, আনতাল লাযি কালা ফী হাক্কেকা সাইয়্যেদুল বাশারে লাও কানা নাবিউম মিম বাআদী লাকানা ওমারাবনাল খাত্তাবে রাদি আল্লাহো তাআলা আনকা ওয়ারদাকা আহসানার রেদা ওয়া জাআলাল জান্নাতা মানবেলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা উকা, আসসালামো আলাইকা ইয়া সানেয়াল খোলাফায়ে ওয়া তাজুল ওলামায়ে ওয়া স্বেহরান নাবিয়ে ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতোহু।

বাংলায়ঃ "ওগো হযরত ওমর রাদিআল্লাহ্ আনহু, আপনার প্রতি সালাম; ওগো সঠিক, ন্যায় ও হকের প্রতিষ্ঠাতা, আপনার প্রতি সালাম;

ওগো মেহরাবের শোভাবর্দ্ধনকারী, আপনার প্রতি সালাম; ওগো দীন ইসলামের গৌরব বর্দ্ধনকারী, আপনার প্রতি সালাম; ওগো দরিদ্রের সেবক, ওগো দুর্বলের সহায়, ওগো এতিমের রক্ষক, ওগো জীবের রক্ষক, আপনার প্রতি সালাম; আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁর ন্যায়নিষ্ঠার জন্য বিশ্বমানবের নেতা হযরত বলেছেন যদি আমার পরে কেউ নবী হতেন তবে হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু হতেন সেই ব্যক্তি। আল্লাহ্ আপনাকে শ্রেষ্ঠ সন্তুষ্টি দান করুন, আর আপনার অবস্থান, বাসস্থান, ঘর ও মহাল্লাকে জান্নাতে পরিণত করুন। ওগো দ্বিতীয় খলিফা, বিজ্ঞজন শ্রেষ্ঠ ও নবী মোস্তাফা সাল্লাহো আলাইহেস সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী আপনার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত অবতীর্ণ হোক।"

এখান থেকে একটু ডান দিকে এগিয়ে গেলেই নজুলে ওহি। এটা ওহি নাজেল হওয়ার জায়গা। এখানে কেবলামুখী হয়ে অন্তত তুরাকাআত নফল নামায আদায় করুন। এটিও দোওয়া কবুলের জায়গা।

এবার যিয়ারাত শেষ হল। তবে যদি অন্য কেউ তার তরফ থেকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলে থাকেন তবে তাঁর তরফ থেকে তাঁর নাম করে সে কাজ করে নেবেন। তারপর অনেকেই ভুল করে মাযারের দিকে মুখ করেই প্রার্থনা শুরু করেন এটা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে এখানে আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সঙ্গীগণের কাছে চাওয়ার কিছু নেই। মৃতের কাছে কিছু চাওয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। তাই পিছন ফিরে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে তুহাত উঠিয়ে প্রাণ ভরে প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। প্রতিদিন প্রত্যেক নামাযের পরে এই ভাবে হযরতের কবর শরীফ যিয়ারাত করা ও বিনম্রভাবে মদিনায় হযরতের জীবনের, কর্তব্যের, কর্মের, নীতির ও নিষ্ঠার স্মৃতিচারণা ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

৬. মসজিদে নাবাবীর বর্ণনা

মসজিদে নাবাবী অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বিশ্ব মুসলিমের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই স্থান থেকে ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তাঁর সময় ও পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই মসজিদই ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রথমে এ মসজিদ ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি। এর দৈর্ঘ-প্রস্থ ছিল ১০০ হাত করে। খর্জুর-বৃক্ষের খুঁটির উপর তক্তা এঁটে ছাদ নির্মিত হয়েছিল। এর সর্বপ্রথম কেবলা ছিল জেরুজালেম। হযরত উমরের সময় এখানকার

রাষ্ট্রীয় আদেশেই মুসলিম সেনাদল পারস্য সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। এইখানে দাঁড়িয়েই আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন হযরত বেলাল।

বর্তমানে মসজিদে নাবাবীর অভ্যন্তরীণ বিবরণ দিচ্ছি। দক্ষিণ পশ্চিম কোণের বিশালকায় দরজাটি বাবুসসালাম। এ মসজিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য স্থান রাসুলে করিম (সাঃ)-এর নিজস্ব বাসভবন। এখানে হযরত আয়েশার হুজরার সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রিয় নবীর কবর শরীফ। এরই পাশে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের কবর।

রওজা শরীফের পাশে মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেওয়াল ঘেরা ক্ষুদ্র কামরা 'নজুলে অহি' নামে পরিচিত। এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অহি নাজেল করতেন।

রওজা শরীফের কাছেই রাসুলে করিমের নিজস্ব মিম্বর। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, রসুলে করিম (সাঃ) বলেছেন, "আমার রওজা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশতের একটি বাগিচা বিদ্যমান।" রিয়াজুল জান্নাত হল আসলে আদিকালের মসজিদে নাবাবীর বেশীর ভাগ অংশ। এই অংশে সাদা রং-এর কার্পেট বিছান আছে। অবশিষ্ট অংশে লাল রং-এর কার্পেট থাকে তাই কার্পেটের রং দিয়ে এটা সহজে বোঝা যায়।

বিশ্বনবীর যে সব শিষ্য ঘরসংসার ত্যাগ করে শুধুমাত্র ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা যেখানে অবস্থান করতেন সে স্থানকে বলে 'আসহাবে সোফ্ফা'। রাসুলে করিম (সাঃ) যে স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন সে স্থানটিকে বলা হয় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মেহরাব। একই ভাবে হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময় যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন সে স্থানকে বলা হয় হযরত উসমানের মেহরাব। বর্তমান ইমামের দাঁড়াবার স্থানও এটি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন সে স্থানটিকে বলে জিবরাঈল (আঃ)-এর মেহরাব।

মসজিদে নাবাবীর মধ্যে দু জায়গায় কিছু অংশ ছাদবিহীন অবস্থায় আছে। মসজিদে নাবাবীর নিকটস্থ ছাদবিহীন অংশটি হযরত উসমানের অফিস ও বাড়ী ছিল। এখানেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হযরত উমর (রাঃ)-র অফিস ও বাড়ী ছিল। তিনি নামাজের কাতার সোজা করার সময় এই মসজিদে শহিদ হন। তুর্কী সরকারের শাসনাধীন

থাকার সময় ও তৎ পরবর্তীকালেও এই ছাদবিহীন অংশগুলি কঙ্করময় ছিল। বর্তমানে এটি শ্বেত পাথরে ঢাকা।

মসজিদের পশ্চিম দিকে 'বাবে ইবনে সউদ' বাবে রহমত ও বাবে অবুবকর অবস্থিত। পূর্বদিকে বাবে নিসা, বাবে জিবরাঈল (আঃ) এবং বাবে আব্দুল আজীজ। উত্তরদিকে বাবুল মজিদ, বাবুল ওসমান এবং বাবুল ওমর।

রওজা মোবারকের পাশ দিয়ে আরও কয়েকটি অভ্যন্তরীণ দরওয়াজা আছে। সেগুলি বাবে হুজরায়ে ফাতিমা, হুজরায়ে আয়েশা নামে পরিচিত।

সর্ব দক্ষিণে ইমামের দাঁড়াবার স্থান। তাই দক্ষিণ দিকে কোন দরজা নেই। কারণ এখান থেকে দক্ষিণ দিকই হল কেবলার দিক।

চ. মসজিদে নাবাবীর থাম

থামকে আরবীতে বলে ওস্তোয়ানা। মসজিদে নাবাবীর রিয়াজুল জান্নাত অংশে কয়েকটি থাম দ্বারা হযরতের সময়ের স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয়েছে। এই সমস্ত থামের নিকট বরকত হাসেল ও দোওয়া কবুল হওয়ার জন্য নফল নামায পড়া ভাল। প্রত্যেকটি থামের উপরের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে প্রত্যেক থামের উপরই আরবীতে ঐ থামের নাম লেখা আছে। থামগুলি শ্বেত পাথরের তৈরী সুন্দর নক্সা করা। থামগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

১। ওস্তোয়ানা হান্নানা বা মোখাল্লাকা— হাদীসে বর্ণিত আছে একটি খেজুর বৃক্ষের থামের কাছে দাঁড়িয়ে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) জুমআর দিন খোতবা পাঠ করতেন। পরে যখন মিম্বার তৈরী হয় তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবা পাঠ করেন। ঐ সময় খেজুর বৃক্ষের থামটি হযরতের বিচ্ছেদের দরুণ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) মিম্বার থেকে নেমে এসে থামের গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন ও জিজ্ঞাসা করেন তোমার কি ইচ্ছা তুমি পৃথিবীর বাগানে থাকবে—ফল ধরবে—মানুষ ভক্ষণ করবে, না বেহেশতের বাগানে যেতে চাও। সেখানে আল্লাহ্‌র আউলিয়াগণ চিরকাল তোমার ফল ভক্ষণ করবেন। থাম উত্তর দেয়—সে বেহেশতে নবীর সঙ্গে থাকতে চায়। তখন থামটিকে মিম্বারের নীচে দাফন করে দেওয়া হয়। ওস্তোয়ানা হান্নানা যে জায়গায় ছিল সেখানে বর্তমানে ওস্তোয়ানা মোখাল্লাকা নামের থাম আছে।

তারই সংলগ্ন স্থানে মেহরাব বানানো আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হযরত নামায পড়তেন। বরকত অর্জনের জন্য এখানে নফল নামায পড়া উত্তম।

২। ওস্তোয়ানা তাওবা বা ওস্তোয়ানা আবি লোবাবা—হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) কে বনি কোরায়জার ইহুদীরা খুব বিশ্বাস করত। তারা এক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করায় মুসলমানগণ তাদের বন্দী করে রাখেন। ইহুদীরা তখন হযরত আবু লোবাবার পরামর্শ মেনে নিতে রাজী হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবু লোবাবাকে তাদের দুর্গের মধ্যে পাঠানো হয়। তারা তাঁর কাছে জানতে চায় দুর্গের দরজা ভেঙ্গে বার হবে কিনা। তিনি মুখে বের হতে বললেন না কিন্তু হাতের দ্বারা নিজের গলার দিকে ইশারা করেন যার অর্থ তোমাদের গলা কাটা হবে।

মুসলিম জাতির এতটুকু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার দরুণ তৎক্ষণাৎ তিনি সতর্ক, দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন ও নিজেকে মসজিদের এক থামের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। তিনি বলেন তাঁর পাপ মোচন ও তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) স্বয়ং বাঁধন না খুললে মরে গেলেও বাঁধন খুলবেন না। তিনি আরও বলেন আত্মীয় স্বজনের আকর্ষণে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসুল এবং মুসলিম জাতির আমানত নষ্ট করেছি। সেই আত্মীয়দের বাড়ী কখনও যাবনা। পানাহার ত্যাগ করে ক্রমাগত সাত দিন আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করেন। সাতদিন পর আবু লোবাবার তওবা কবুল হয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই স্তম্ভের নিকট প্রায় সময় নফল নামায পড়তেন। তাই এখানে নফল নামায ও তওবা ইস্তেগফার পড়া ভাল।

৩। ওস্তোয়ানা আয়েশা : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন মসজিদের মধ্যে একটি থাম আছে তার নিকট দোওয়া কবুল হয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই থামের কাছে দশ ওয়াক্ত নামায পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই থামটি যদি লোকে চিনত তবে এর কাছে এত ভিড় জমত যে, এখানে নামায পড়বার জন্য লটারী করার প্রয়োজন হত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের-এর পীড়াপীড়িতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এটি দেখিয়ে দেন।

৪। ওস্তোয়ানা সরির : এতেকাফের সময় যে থামটির নিকট হযরতের পালঙ্ক রাখা হতো তাকে বলা হয় ওস্তোয়ানা সরির। এখানে হযরত বিশ্রাম করেছেন।

৫। ওস্তোয়ানা আলী : শত্রুদের ভয়ে সাহাবাগণ হযরত মোহাম্মদ

মোস্তাফা (সাঃ) কে পালা করে পাহারা দিতেন। হযরত আলী (রাঃ) যে থামের নিকট দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেন সেই থামকে ওস্তোয়ানা আলী বলা হয়।

৬। ওস্তোয়ানা ওফুদ : যে থামের নিকট বসে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন তাকে ওস্তোয়ানা ওফুদ বলা হয়।

ছ. নকসার সাহায্যে মসজিদে নাবাবীর দৃশ্য
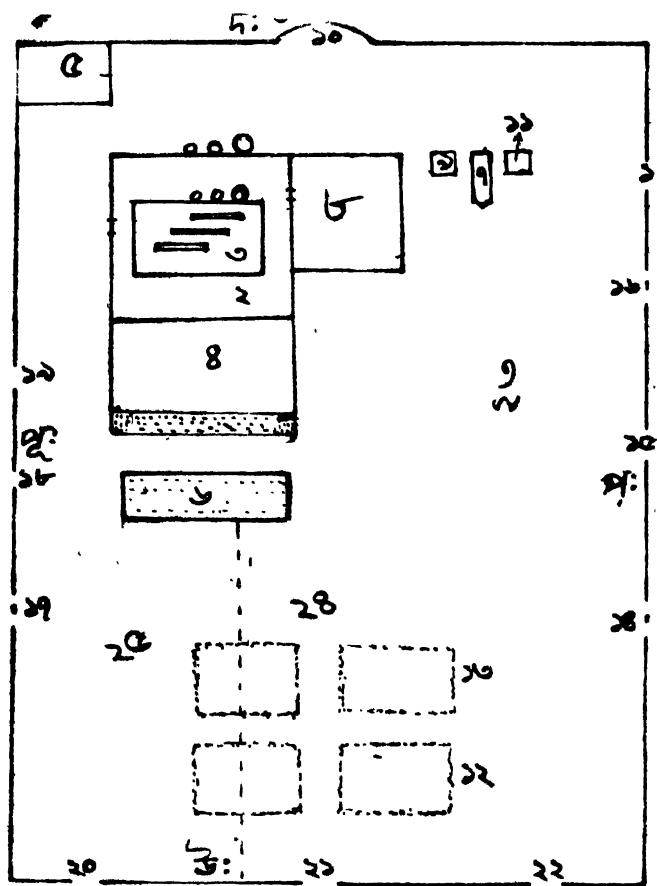
বর্তমানে এই বিশাল মসজিদটির একটি আভ্যন্তরিণ নকসা ও পরপর তার ক্রমিক বর্ণনা দেওয়া হল :

১. বাবুস সালাম—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড় দরজা।

২. হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাড়ী।

৩. হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাড়ীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবর শরীফ বর্তমান।

৪. হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর হুজরা।

৫. নযুলে অহি—রওজা শরীফের সংলগ্ন মসজিদে নাবাবীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ছোট একটি কামরা আছে তাকে নযুলে অহি বলা হয়। এখানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অহি নাযিল করতেন বলে একে নযুল অহি বলা হয়।

৬ আস্‌হাবে সোফ্‌ফা—অনেক সাহাবী বিদেশ থেকে ঘরবাড়ী ত্যাগ করে হযরতের সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী স্বাধীন রাষ্ট্র বিস্তৃত করার জন্য মসজিদে বাস করতেন। এঁদের আস্‌হাবে সোফ্‌ফা বলা হয়। সোফ্‌ফা অর্থ ছাদ ছাড়া চাতাল। মসজিদের সংলগ্ন চার কোণ বিশিষ্ট একটি চাতাল ছিল। এখানেই ঐ সাহাবাগণ ওঠাবসা করতেন। তাই তাঁদের আসহাবে সোফ্‌ফা বলা হয়। এটি বর্তমানে মসজিদে নাবাবীর অংশে পরিণত হয়েছে। তবে ঐ স্থানটুকু এখনও উঁচু রাখা হয়েছে।

৭. হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মিম্বার।

৮. বেহেশতের বাগিচার টুকরা—হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রওজা ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান রিয়াজুল জান্নাত।

৯. হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মেহরাব। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামাযের ইমামতী করতেন।

১০. হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মেহরাব। হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফতের সময় মসজিদে নাবাবী বর্দ্ধিত হলে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে নামাযের ইমামতী করতেন।

১১. হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মেহরাব। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।

১২. পাশাপাশি দুটি কঙ্করময় স্থানে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর অফিস ও বাড়ী ছিল। এই স্থানে তিনি শহীদ হয়েছেন। এই স্থানটি তাঁর স্মৃতিস্বরূপ ছাদবিহীন রাখা হয়েছে। বর্তমানে মেঝে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধান হয়েছে এবং মসজিদে নাবাবীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

১৩. এই দুটি ছাদবিহীন স্থানে ওমর (রাঃ)-এর অফিস ও বাড়ী ছিল। তিনি এ স্থানে শহীদ হয়েছিলেন। পূর্বে কঙ্করময় ছিল বর্তমানে ঐ অংশটিও শ্বেত পাথরে বাঁধান এবং মসজিদে নাবাবীর সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন দরজার নাম :

১৪. বাবে ইবনে সউদ

১৫. বাবে রহমত

১৬. বাবে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)

১৭. বাবে আব্দুল আজীজ

১৮. বাবুন নেসা

১৯. বাবে জিব্রাইল (আঃ)

২০. বাবে ওসমান

২১. বাবে আব্দুল মজিদী

২২. বাবে ওমর

যিয়ারাতের নিশানা :

O. হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর চেহারা বরাবর গোলাকার ফাঁক।

O. হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর চেহারা বরাবর গোলাকার ফাঁক।

O. হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেহারা বরাবর গোলাকার ফাঁক।

২৩. সৌদি আরব তুর্কী শাসনাধীন থাকার সময় তুর্কী সরকারের তৈরী অংশ।

২৪. এবনে সৌদের তৈরী অংশ

২৫. মহিলাদের নামাযের নির্দ্ধারিত এলাকা একই এমামের একতেদা করে একত্রে জামাআত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কা ও মদিনার দর্শনীয় স্থান সমূহ

১. মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থান

মক্কা শরীফের করণীয় কাজগুলি শেষ করে পবিত্রভূমি ছেড়ে আসার আগে কয়েকটি বিশিষ্ট জায়গা দর্শন করা উচিৎ।

জান্নাতুল মোয়াল্লা : মক্কা শরীফের ঐতিহাসিক করবস্থান। এটি আরবের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী কবরস্থান। এখানে রাসুলে করীমের পূর্বপুরুষ, কিছু সাহাবী ও বুজরগানে দ্বীনের কবর আছে। এখানেই উম্মুল মুমেনীন বিবি খাদিজার কবর আছে। বিবি খাদিজাই রাসুলের প্রথমা স্ত্রী। রাসুলে করীমের ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত আর কোন স্ত্রী ছিলেন না। এখানের কবরগুলোতে কোন চাকচিক্য নেই, নেই কোন ফলক বা পরিচয়পত্র, সব কবরই মাটিতে মিশে আছে। কবর এলাকাটিই মাত্র চিহ্নিত আছে। তাছাড়া আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের, বিবি আসমা, রাসুলে করিমের চাচা আবুতালেব, দাদা আব্দুল মোত্তালেব পরদাদা আবদে মানাফ প্রভৃতি বিখ্যাত কোরায়েশ নেতাদের কবর আছে। এখানে গিয়ে অবশ্যই যিয়ারাত করা দরকার।

মসজিদে বেলাল : হেরেম শরীফের কাছেই জাবালে আবু কোবায়েস পাহাড়ের শীর্ষস্থানে চোদ্দ শত বৎসর পূর্বের নির্মিত একটি পুরাতন মসজিদ। হজরত বেলাল এই মসজিদে আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন সেই কোন সুদূর অতীতে। এই জাবালে কোবায়েসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কাবা ঘর পুনঃ নির্মাণ করে হযরত ইব্রাহিম আঃ সালাম এখান থেকেই বিশ্ববাসীর প্রতি হজের আহ্বান জানিয়েছিলেন। নূহ নবীর প্লাবনের সময় এই পাহাড়ে বেহেশতী পাথর হজরুল আসওয়াদকে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ র ইচ্ছায় অঙ্গুলী নির্দেশে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।

মাওলুদুন নবী : নবীজীর জন্মস্থান, এটাই মা আমিনা আর আব্দুল্লাহ্ র ঘর। এদেশে প্রাচীন কীর্তি রক্ষার কোন আইন ও ব্যবস্থা নেই। তাই অতীতের কোরায়েশদের ঘর বাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। এই

জায়গায় ও বাড়ীতে কোন ফলক বা পরিচয় পত্র নেই। বাড়ীটি বর্তমানে একটি দোতালা লাইব্রেরী ঘর। সামনে আরবীতে সেই নাম লেখা একটা সাইনবোর্ড লাগান আছে। আশপাশে কোথাও বসার জায়গাও নেই, বাড়ীর দরজা প্রায় সময় বন্ধ থাকে।

হযরত আবুবকরের বাড়ী : মিসফালা মহল্লার এই জায়গাটিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এখানে ওজুরও ব্যবস্থা আছে।

এছাড়া মক্কা শহরের আশপাশে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যেমন—গারে হেরা এটাকে জাবালে নূর বলে, গারে সুর এটাকে জাবালে সুর বলে। এই পাহাড়দ্বয়ের প্রথমটিতে প্রিয় নবী আরাধনা করতেন। এখানেই তাঁর নবুয়তের ঘটনা ঘটে। এখানেই কোরআনের প্রথম সুরা 'একরাবেইসমে' নাজেল (অবতীর্ণ) হয়। দ্বিতীয়টিতে হিজরতের সময় হযরত আবুবকর সহ নবীকরিম (সাঃ) আত্মগোপন করেছিলেন। এছাড়া হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের স্থান দারে আরকান, মসজিদে মাজতাবা, মসজিদে রায়া, মসজিদে জীন ইত্যাদি। মক্কা শরীফের কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান।

হেরা পাহাড় ও সুর পাহাড়ে যাওয়ার জন্য হেরেমের সামনেই বাস পাওয়া যায়, অথবা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়।

২. মদিনার দর্শনীয় স্থান :

মদিনার মসজিদে হেরেমের সামনে প্রতিদিনই অসংখ্য ট্যাক্সি যিয়ারাহ্ যিয়ারাহ বলে হাঁকতে থাকে। সকলে মিলে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে বেরিয়ে পড়ুন। ওরা যোহরের আগেই সব জায়গা দেখিয়ে দেবেন দর দাম করে ভাড়া করে নিতে হবে।

জান্নাতুল বাকী : মদিনার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কবর স্থান। সকালে এ কবরস্থান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই কবরস্থানে সমস্ত সাহাবী থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবারের সকলের কবর এখানে আছে। প্রধান ফটকের ডানদিকে আছে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-র কবর। ইমামদের মধ্যে মহাত্মা জাফর সাদেক, ইমাম মালেক ইবনে আনাস, ইমাম বাকী ও ইমাম ইসমাইল প্রমুখের কবর আছে"। হুযরতের দুধমা হালিমার কবরও এখানে আছে। কবরস্থানের জালিতে হাত স্পর্শ করা, ফুল, আলো, ধূপ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

বেদআত থেকে কবরস্থানকে মুক্ত রাখার জন্য বর্তমানে হজ মরশুমে সর্ব-সাধারণের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদে কেবলাতায়েন : হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্-র নির্দেশে প্রথম দিকে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়তেন। একদিন জোহরের নামাজের এই মসজিদে রাসুলুল্লাহ্-র প্রতি অহি নাযেল হয় কাবার দিকে কেবলা করে নামায পড়ার জন্য। তাই মসজিদে কেবলা-তায়েনে ইমামের দুটি মিম্বরের চিহ্ন আছে।

খন্দকের যুদ্ধক্ষেত্র : ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ বা পরিখা যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পরিখার কোন চিহ্ন নেই। এখন এই জায়গায় কয়েকটি মসজিদ আছে। তাকে মসজিদে খামসা বা পাঁচ মসজিদ বলে। বস্তুতপক্ষে সেখানে সাতটি মসজিদের চিহ্ন বিদ্যমান। রাসুলে করিম যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যেখানে দোওয়া চেয়েছিলেন সেখানে একটি মসজিদ আছে। একে মসজিদে ফাতহা বলে। অদূরে মসজিদে আবু বকর, মসজিদে উমর, মসজিদে আলী ও মসজিদে উসমান রয়েছে। উল্লিখিত আছে যে যে জায়গা থেকে এঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এই মসজিদগুলি সেই সেই স্থানে রয়েছে। আরও দুটি মসজিদ আছে সেদুটি হলো মসজিদে ফাতেমা ও মসজিদে সালমান ফার্সি।

মসজিদে কোবা : মদিনার উপকণ্ঠে মসজিদে নাবাবী থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এ মসজিদ। মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকদিন কোবা পল্লীতে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। রাসুলুল্লাহ্ প্রত্যেক শনিবার এ মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। মসজিদে হারাম, মসজিদে নবাবী ও মসজিদে আকসার পরই মসজিদে কোবা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই মসজিদ রাসুলে করিমের নিজের হাতে তৈরী।

পাঁচ মসজিদ : সুগ-আল-আইআস মহল্লায় একত্রে পাঁচটি মসজিদ আছে। মসজিদগুলি পাশাপাশি বিদ্যমান। এখানকার বড় মসজিদটির নাম মসজিদে গামামা। কথিত আছে রাসুলেকরীম (সাঃ) একবার এখানকার ময়দানে জোহরের নামায আদায় করেছিলেন। এই সময় মেঘের ছায়া পড়ে। পরে ঐ জায়গায় মসজিদ নির্মিত হলে এর নাম হয় মসজিদে গামামা (মেঘ)। মসজিদে নাবাবী থেকে এর দূরত্ব আধমাইল। এর

পাশের মসজিদটি হযরত আবুবকরের নামীয়। তার পরের মসজিদটি নাম মসজিদে ফাতেমা। অপর দুটি মসজিদ হযরত আলী ও হযরত উমরের নামীয়।

বেঅরে আলী : বেঅরে আলীকে জুল হুলায়ফাও বলে। বেঅর শব্দের অর্থ কূয়া। এখন এসকল জায়গা প্রায় শহর। এটাই মদিনার লোকেদের জন্য মক্কার মিকাত। মদিনা থেকে হজ যাত্রীগণকে এখান থেকে এহরাম বাঁধতে হয়। এখানে একটি মসজিদ আছে।

বদর : মুসলিম ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর প্রান্তরে। চারদিকে অসংখ্য পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা এটি। বর্তমানে বদর প্রান্তর উন্মুক্ত মরুপ্রান্তর নয়। সেখানে গড়ে উঠেছে একটি জনবহুল শহর। এই যুদ্ধেই মুসলিমগণ প্রথম জয়লাভ করেছিলেন। এটাই ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রথম যুদ্ধ। ১৬ জন মুসলিম বীর এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এখানে তাঁদের দাফন করা হয়। রাস্তায় তীর চিহ্ন দিয়ে দিক নির্দেশ করে লেখা শোহাদায়ে বদর বা বদরের শহীদগণ। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে অথবা মদিনা থেকে ফেরার পথে এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি পরিদর্শনের চেষ্টা করা উচিত।

ওহোদ প্রান্তর : মদিনা শহরের মাইলচারেক উত্তরের একটি পাহাড়। এই পাহাড়ের নামই ওহোদ পাহাড়। এরই সংলগ্ন প্রান্তরে মুসলিম সৈন্যগণ দ্বিতীয়বার কোরায়েশদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে প্রথমে মুসলিম সৈন্যগণ জয়লাভ করেন। কিন্তু গিরিপথের রক্ষক তাঁর কর্তব্য ভুলে বিজয় উৎসবে যোগ দিতে চলে আসার ফলে পরাজিত কোরায়েশ সৈন্যগণ পুন: আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম বীর নিহত হন এবং হযরত নিজেও আহত হন। হযরত হামজার মত বুদ্ধিদীপ্ত বীর যোদ্ধাও এই অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। এদের সকলের কবর আছে এই ওহোদ প্রান্তরে। এই জায়গা পর্যন্তও শহর বেড়ে গেছে। চমৎকার রাস্তাঘাট। কবরখানা ঘিরে রাখা আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে যিয়ারাত করা একান্ত কর্তব্য কাজ। মদিনার হেরেম শরীফের সামনে থেকেই ট্যাক্সী পাওয়া যাবে ঐ ট্যাক্সী সবকটি দর্শনীয় স্থানই দেখিয়ে দেয়। পায়ে হেঁটেও এখানে যাওয়া যায়।

৩. মদিনা শরীফ থেকে বিদায়

যারা হজের পরে মক্কা থেকে মদিনা গেছেন তাঁরা মদিনা থেকে সরাসরি

জেদ্দা ফিরবেন। আর যারা হজের আগে মদিনা পৌঁছেছেন তারা মদিনা থেকে মক্কা শরীফ যাবেন। যেখানেই যাওয়ার ব্যবস্থা হোক না কেন মদিনা শরীফ থেকে বিদায়ের সময় হলে প্রথমে মসজিদেনাবাবীতে গিয়ে দুরাকাআত নামায আদায় করে হযরতে কবর যিয়ারাত করুন। তারপর নিজের নিজের পরিবারবর্গের আত্মীয় স্বজনের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মদিনার বরকতময় জায়গায় দাঁড়িয়ে শেষ প্রার্থনা করুন। এবং এই দোওয়া পড়ে আদবের সঙ্গে নবীজীর প্রতি দরূদ ও সালাম বলে মসজিদে নাবাবী থেকে বের হওয়া উচিৎ।

মদিনা শরীফ থেকে বিদায়ের দোওয়া

اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلْفِرَاقُ يَانَبِيَّ اللهِ اَلْاَمَانُ
يَاحَبِيْبَ اللهِ لَاجَعَلَهُ اللهُ تَعَالٰى اٰخِرَ الْعَهْدِ لَا
مِنْكَ وَلَامِنْ زِيَارَتِكَ وَلَامِنَ الْوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَيْكَ
اِلَّامِنْ خَيْرٍ وَّعَافِيَةٍ وَّصِحَّةٍ وَّسَلَامَةٍ اِنْ عِشْتُ
اِنْشَاءَ اللهُ تَعَالٰى جِئْتُكَ وَاِنْ مُتُّ فَاَوْدَعْتُ عِنْدَكَ
شَهَادَتِىْ وَاَمَانَتِىْ وَعَهْدِىْ وَمِيْثَاقِىْ مِنْ يَوْمِنَا
هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهِىَ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَاَنَّمَا
زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

(আলবেদাও ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল ফেরাকো ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ, আলআমানো ইয়া হাবিবাল্লাহ্ লা জাআলাহুল্লাহো তাআলা আখেরাল আহদে লা মিনকা ওয়ালা মিন যিয়ারাতেকা ওয়ালা মিনাল ওকুফে বায়না ইয়াদায়কা ইল্লা মিন খায়রিউ ওয়া আফিয়াতেঁও ওয়া স্বেহহাতিও ওয়া সালামাত্তিন ইন এশতো ইনশায়াল্লাহো তাআলা জেয়তোকা ওয়া ইন মুত্তো ফআওদাআতো ইনদাকা শাহাদাতি ওয়া আমানাতিওয়া আহদী ওয়া মিসাকী মিঁই ইয়াওমেনা হাযা এলা ইয়াওমিল কেয়ামাতে ওয়াহেয়া শাহাদাতো আন লা এলাহা ইল্লাল্লোহো ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়াশ হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু সোবহানা রাব্বেকা রাব্বিল ইয্যাতে আম্মা ইয়াস্বেফুন। ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। কালা রাসূলুল্লাহো সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামা, মান যারা কাবরী লাহু ওয়াজাবাত শাফাআতী ওয়াকালান নাবিয়্যো সাল্লাল্লাহো তাআলা আলাইহে ওয়া সাল্লামা মান যারানী বাআদা মামাতী ফা কায়াননামা যারানী ফী হায়াতী।)

বাংলায়ঃ বিদায় হে রাসূলাল্লাহ্! হে নবী আপনার কাছ থেকে বিদায়! ওগো আল্লাহ্র হাবীব আপনার কাছেই নিরাপত্তা! আল্লাহ্ যেন আমার এই যিয়ারাতকে শেষ যিয়ারাত না করেন, আমাকে যেন আপনার যিয়ারাত আর সামনে উপস্থিত হওয়াকে শেষবারের মত না করেন। বরং মঙ্গল, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে হাজির করো। আমি যদি জীবিত থাকি ইনশআল্লাহ্ আবার আপনার সামনে উপস্থিত হব আর যদি মারা যাই তাহলে আপনার কাছেই আমার সাক্ষী আমানত রাখছি, আর আমানত রাখছি আমার ওয়াদহী মীশাকীকে আমার আজকের দিন থেকে কেয়ামাতের দিন পর্যন্ত। আর সে সাক্ষী হল আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি অদ্বিতীয়, যাঁর কোন শরীক নেই, আর আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত দূত। আপনার প্রভু পবিত্র সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। আর রসূলের প্রতি সালাম, আর সকল গুনগান আল্লাহ্র জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রশংসনীয় প্রভু। রাসূলআল্লাহ্ সাল্লাহো আলাইহে অসাল্লাম বলেছেন যিনি আমার কবর যিয়ারাত করলেন আল্লাহ্র কাছে তাঁর সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজেব হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লাম আরও বলেছেন যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারাত করলেন তিনি যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন।"

এরপর আরও দোওয়া করুন : "আয় আল্লাহ্ আমি আপনার নূরের আপনার নবী মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সা:) এর, আপনার কোরআনের, আপনার নবীর তারিকার ওসিলায় এই প্রার্থনা করছি যে আমার সন্তান সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজন দেশবাসী মুমেন মুমেনাতর সকলের পাপকে ক্ষমা করে দিও, সকলকে বেহিসাব জান্নাতে প্রবেশ করিও। ওগো আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, আমাদের সকলকে ইমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও আর আমাদিগকে তোমার দীনের তোমার রাসুলের প্রদর্শিত পথে চলতে পারার ক্ষমতা দান করো। আমীন।

৪. মক্কা ও মদিনা শরীফের তাবাররোক

মক্কা ও মদিনা থেকে বাড়ী ফেরার সময় যমযমের পানি আর মদিনার খেজুর সঙ্গে আনা যায়। আর সবকিছুর মধ্যে এই দুটি জিনিষই মূল্যবান। এছাড়া জায়নামায, তসবীহ, সুরমা এখানে আনা যায়। মদিনা শরীফে নানা রকম সুমিষ্ট খেজুর পাওয়া যায়। হাজিগণ সঙ্গে আনেন। এখানের কিছু কিছু খেজুর অমৃত সদৃশ্য অপূর্ব সুস্বাদু। মদিনা শরীফ থেকে খাকে শেফা বলে এক ধরনের মাটিও অনেকে আনেন। এ ছাড়া এদেশে বহিবিশ্বের নানা জিনিষে ভরে আছে। কারও ঐ সকল প্রলোভনের জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ নয়।

যমযমের পানি আনার জন্য অনেকে দেশ থেকে ১৫/২০ লিটারের টিন নিয়ে যান। তবে এর বিশেষ প্রয়োজন নেই। ওখানে খুবই সুন্দর সুন্দর প্লাস্টিকের ক্যান পাওয়া যায়। যেমন ইচ্ছা ক্যান কিনে ১৫/২০ লিটার পানি নিয়ে আসা ভাল। বিমানের যাত্রীর ক্ষেত্রে কিছু কম পানি নেওয়া উচিৎ।

মদিনার মসজিদে নাবাবীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বরাবর একটু এগিয়ে গেলেই খেজুরের আড়ত। সেখানে দামও কম আর অনেক রকমের খেজুর পাওয়া যায়। পায়ে হেঁটে সামান্য সময়ই লাগে। ওখানে গিয়ে পছন্দমত ও সঙ্গতির মধ্যে খেজুর কিনে দোকানদারকে বললেই ওরা টিনে ভর্তি করে দেবেন। সব সময় মনে রাখতে হবে আনার জিনিষপত্র পরিমাণে অনেক বেশী হয়ে গেলে সব জায়গাতেই মাল টানাটানিতে অসুবিধায় পড়তে হয়।

তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ ○

"আমি উপস্থিত, আয় আল্লাহ্, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত, অবশ্যই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই জন্য, সমগ্র রাজ্যই তোমার, তোমার কোন শরীক নেই"

মক্কা ও মদিনায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় হেজাজী বাক্য ও শব্দ

কথাবার্তা

বাংলা	আরবী
আপনার দেশ কোথায় ?—	মিন আইয়্যে বিলাদ আন্তা।
আমি ভারতীয়—	আনা ফিল হিন্দী।
আপনার মুয়াল্লেম কে ?—	মান মুয়াল্লিমুক ?
আমার মুয়াল্লেম আব্দুর রাজ্জাক মাহবুব সিদ্দিকী—	এসমো মুয়াল্লিমী আব্দুর রাজ্জাক মাহবুব সিদ্দিকী।
আপনি কোথায় থাকেন ?	আয়না তাসকোনো ?
আমি জিয়াদ মহল্লায় থাকি—	আছকোনো ফি মহাল্লা জিয়াদ।
ষ্টিমারে না উড়ো জাহাজে এসেছেন ?—	হালজেত্তা বিসসাফিনাতে আম বিত্যাইয়ারাহ ?
আমি জল জাহাজে এসেছি—	জেওতো বিলমারকাবে।
আমি উড়ো জাহাজে এসেছি—	বোখারিয়াহ জেওতো বিত্যাইয়ারাহ।

কথোপকথন

বাংলা	আরবী
সুপ্রভাত।	সাবাহাল খায়ের।
আপনি কি চান ?	মাবা তুরীদু ?
আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।	আনা ফাগাদ্‌তু তরীগ।
আপনি কোথায় যাবেন ?	আইনা তাজাহাব ?
আমি ভারতীয় হজ্জ মিশন অফিসে যেতে চাই।	উরীদু আন্‌ আরুহ ইলা মাকতাব বে'সাতিল হাজ্জাল হিন্দ।
ভারতীয় ডিস্পেনসারী কোথায় ?	আইনা মুসতাসফিল হিন্দ ?
ভারতীয় এমব্যাসী অফিস কোথায় ?	আইনা সাফারাতুল হিন্দ ?
বাজারের রাস্তা কোনটি ?	আইয়ো হোয়াত তারিকু ইলাস সুক ?
এইতো ফলের দোকান	হুনা দোকানুল ফাকেহাতু

বাংলা	আরবী
এস আগে আমরা কিছু ফল কিনি।	লেনাসতার বাআদাল ফাকেহাতু আউয়ালুন।
আমি আঙ্গুর চাই	আনা উরিদো আনাবান
দশ রিয়েল কিলো	কীলু আশারা রিয়েল
এটা অনেক বেশী	হাজা কাভীর (কাসীর)
না জনাব এটা সস্তা	লা সাইয়্যেদী হাজা বাখীস
আমি খেজুর চাই	আনা উরিদো তামার
এর দাম কত ?	কাম হাজা ?
আমি বাজারে যেতে চাই	উরীদু আন্ আজহাবা ইলাস্ সূক
উকায বাজার কোন দিকে ?	ইলা আইনাল উকাযুছ্ সূক ?
মক্কা হতে উত্তর দিকে--	ইলাস শিমালি মিন মক্কাতা
এটা কি উকায বাজার ?	হাল হাবা উকাযুছ সূক ?
আপনি কি দোকানদার ?	য়া আনতা দাকুনী ?
হাঁ আল্লাহর ফজলে—	না-আম বি ফাদলিল্লাহ।
কি চান আপনি ?	মা তাব্গী ?
আলুর দর কত ?	মা সি'রুল বাতাতেস ?
আমার কাছে নাই—	লাইসা ইনদি
আমি কোথা পাব ?	আইনা আজিদু ?
আমার পাশের দোকানে—	মুতুজারী
নুনের মূল্য কত ?	কাম সামানুল মিলাহ ?
এক রিয়াল	অহেদ রিয়াল
প্রতি কিলো ?	ফী কুল্লে কীলু ?
হাঁ	না'আম
ধন্যবাদ !	শুকরান লাক !
এই কুলি এদিকে এস—	তাআল ইয়া হাম্মাল।
আমার মালপত্র উঠাও—	হাম্মিল বিজরী।
ড্রাইভার তুমি কি মদিনা যাবে ?	ইয়া সাওয়াগ হাল তারুহ ইলা মাদিনা ?
কত ভাড়ায় ?	বেকাম ?
কুরবানী করার জায়গা কোথায় ?	আয়না ফিন মাজ্বাহ ?
আমাকে জুমরার রাস্তা বলুন—	দুল্লানী তরীগ জুমরা।

বাংলা	আরবী
হাজী সাহেব আস্থন।	তাফাদ্দাল ইয়া হাজ।
আপনি কি মসজিদে নামেরা যেতে চান ?	আতুরীদু ইলা মাসজিদে নিমরা ?

ডাক বিভাগ

পোষ্ট অফিস কোথায় ?	আয়নাল বারিদ ?
পোষ্ট অফিস যাওয়ার রাস্তা কোনটি ?	আইয়ো তারিগ এলাল বারিদ ?
আমি এই চিঠি কোথায় পোষ্ট করব ?	আইনা ইয়োমকিনানি আন আরসেলার রেসালাত ?
আমি এটা এয়ারমেল করে পাঠাতে চাই—	আনা ওরিদু ইরসালার রেসালাত বিল বারিদ।
আমাকে টিকিট দিন—	ইতিত আওয়াবাহ।
আমাকে পাঁচটি খাম দিন—	আতিনি খামসাতু যারফুন।

এস আমরা টেলিফোন অফিস যাই।— লে নাজহাব এলা মাকতাবিল হাতুফ।

ডাকঘর—বুস্তাত	চিঠি—মাকতুব
ডাকটিকিট—তারাউল বারীদ	ডাকপিয়ন—সাসীল বারীদ
ডাকবাক্স—ছুন্দকুল বারীদ	ডাক মাস্থল—উজরাতুল বারীদ
টেলিগ্রাম—বারকিয়াত	খাম—লিফাফাত
পোষ্টকার্ড—বিতাকাতুল বারীদিয়াত	রেজিষ্টারী—তাব্জিল
মনিওয়ার্ডার ফরম—ইস্তিমারাতুল হাওয়ালাত,	রশিদ—ইস্তিলাম
টেলিগ্রাম ফরম—ইস্তিমারাতুল বারকিয়াত	কাগজ—ফেরতাস
টেলিফোন—তিলিফোন, হাতিফ	টেলিফোন কল—তালাবু হতিফী

খাদ্য ও পানায়

হোটেল কি এখান থেকে অনেক দূরে ?	হাল ওতেলু বাইদো মিন হোনা ?
দুপুরের খাবার কি তৈরী ?	হাল আলগাযাউ জাহায ?
আগে আমাকে ঠাণ্ডা পানি দিন	হাতিল মুইয়া বারিদ আউয়াল
কিছু রুটি এবং মুরগীর গোসত দিন	হাতে কালীলান মিন খোবজে ওয়াদ দাজাজা
আমি আইসক্রিম চাই	উরিদু বাউযাহ

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পানি	মুইয়া	নাস্তা	ফুতুর
মিষ্টি পানি	মুইয়া হেলু	দুপুরের খাবার	গাদা
কলের পানি	মুইয়া মাকিনা	রাতের খাবার	আশা
বৃষ্টির পানি	মুইয়া মাতার	ডিম	বয়জা
বরফের পানি	মুইয়া মুতাল্লায	সিগারেট	সিজারা
চাউল/ভাত	রুয	চিনি	সুগগার
গোস্ত	লাহাম	চা	শাই
গরুর গোস্ত	লাহাম বাকার	কফি	গাহ্ওয়া
মুরগীর গোস্ত	লাহাম দাজাজ	পরটা	মোতাব্বাখ
খাসীর গোস্ত	লাহাম মায়েয	মাখন	যেরদা
উটের গোস্ত	লাহাম জামালী	পনির	জবুন্
দুম্বার গোস্ত	লাহাম গানাম	তৈল	জেত
ভুনা গোস্ত	লাহাম মাশবী	সালুন, তরকারি	ইদাম
বিরিয়ানী	রুয্ মাসবী	আটা	দাগিগ
সাদা ভাত	রুয্ সবলুল	কিমা	মাফরুম
পোলাও	রুয্ বোখারী	ডাইল	আদাস
দুধ	হালিব	কলিজা	কবদা
দধি	লাবান	পান	তাম্বুল
রুটি	খব্য	চুন	নুরা
হাঁ	না' আম	আগুন	নার

আলো—নুর। আধার—জুলমাত অমাবস্যা—হিলাল।

পাহাড়—জাবাল। পাথর—হাজার। পৃথিবী—অরদ্।

আকাশ—শামা। তারা—নজম। বিদ্যুৎ—বার্ক।

বৃষ্টি—মাতার। ইঞ্চি—কীরাত। ফুট—কাদাম।

দর—সি'র। খুচরা—বিলমুকাররাক। দাম—কীমাত।

পূর্ণিমা—বাদ্র। সূর্য—শামছ। মেঘ—সাহাব।

মাইল—মীল। বিক্রয়—বাইউ। চাঁদ—কামার

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পাইকারী—	বিলজুমলাত	ফল বিক্রেতা—	ফাকিহী
চুলা—	তান্নুর	রান্না ঘর—	মাতবাল
বিস্কুট—	বাকসামাত	বস্ত্র বিক্রেতা—	বায্যায
তেল বিক্রেতা—	যাইয়াত	ব্যবসা—	তেজারত
ব্যবসায়ী—	তাজীর	ক্রয়—	শিরাউ
ঘড়ি মেরামতকারী—	সা'আতী	খরিদ্দার—	যাবুন

ব্যবহার্য দ্রব্যাদি

চায়ের কাপ	ফিনজান	ট্রে	তিফ্‌সি
চামচ	মিলাগা	পাখা	মের্‌ওয়াহা
মগ	মোগ্‌বার	গ্লাস	কাসা
পাতিল	গেদের	বালতি	সতিল
সাবান	সাবুল	ছাতা	শামছিয়া
আয়না	মেরাআ	চিরুণী	মিশ্‌ত
বাক্স	সুনদুক	তালা	গোফল
সুরমা	কুহল	চাবি	মিফতাহ
স্যুটকেশ	শানতা	ছুরি	সিক্‌কিন
টেপরেকর্ডার	মোসাজ্জাল	রেডিও	রাদিও
টেলিভিশন	তিলফিজিউন	টেলিফোন	তিলফুন
রেফ্রিজারেটর	তাল্লাজা	ব্যাটারী	বাতারী
কাগজ	ওয়ারাগ	কলম	গলম
চিঠি	কিতাব	ম্যাপ	খারিতা

মাছ তরিতরকারী, মসলা ও ফল বিষয়ক

মাছ	হুত	ছোট মাছ	সামাক
সমুদ্রের মাছ	হুতুল বাহার	নদীর মাছ	হুতুল নাহার
লবণ	মিলাহ	আদা	জানজাবিল
পিঁয়াজ	বাসাল	এলাচী	হেল
দারুচিনি	গেরফা	হলুদ	হোর্‌দ
সরিষার তৈল	যায়ত্‌ খারদাল	মরিচ	ফিল্‌ফিল

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
রসুন	ম	লবঙ্গ	গোরন ফুল
বেগুন	বাদিন্জান	মুলা	ফিজিল
গোল আলু	বাতাতেস্	মুদী দোকান	বাকালা
আম	মাংগা	খেজুর	তামুর
মলটা	বোর্‌ত	আপেল	তোফ্‌ফা
আনারস	আনানাস	কলা	মওয্‌
কমলালেবু	বুরতুগা	তরমুজ	হাব্‌হাব
টমেটো	তুমাতুম	আঙ্গুর	এনাব্‌

আত্মীয় পরিজন

পিতা	আবুইয়া		আম্মাতি
মা	উম্মি	মামা	খালি
বোন	উখতি	দাদা	জাদ্দি
ভাই	আখুইয়া	দাদী	জাদ্দাতি
বন্ধু	রফিগ	মেয়ে	বিন্ত
চাচা	আম্মি	ছেলে	ওয়ালাদ

সংখ্যা গননা

এক	ওয়াহিদ	উনিশ	তিসআতাশারা
দুই	ইসনানে	বিশ	এশরিন
তিন	তালাতা	ত্রিশ	তালাতিন
চার	আরবা	চল্লিশ	আরবাঈন
পাঁচ	খাম্‌ছা	পঞ্চাশ	খামছিন
ছয়	সিত্তা	ষাট	সিত্তিন
সাত	সাবআ	সত্তর	সাবঈন
আট	সামানিয়া	আশি	সামানিন্
নয়	তিস্আ	নব্বই	তিস্ঈন
দশ	আশারা	একশত	মিয়াহ্‌
এগার	আহাদাশারা	হাজার	আল্‌ফ
বার	ইসনাশারা	দুইশত	মিয়াতাইন
তের	তালাতাশারা	দুই হাজার	আলফাইন
চৌদ্দ	আরবাতাশারা	তিন শত	তালাতা মিয়াহ

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পনের	খামসাতায়াশারা	তিন হাজার	ছালাতাত আলফ
ষোল	ছিত্তাতায়াশারা	প্রথম	আওয়াল
সতের	সাবআতায়াশারা	শেষ	আখের
আঠার	সামানিয়াতায়াশারা	মধ্যে	ওয়াসাত

পোষাক পরিচ্ছেদ বিষয়ক

কাপড়	ক্বমাশ	স্যাণ্ডেল	শিব শিব
পাজামা	সরওয়াল	বালিশ	মোখাদ
জায়নামাজ	ছুজ্জাদা	মশারী	নামুসীয়া
জামা	কামীস	খাটিয়া	খাশাব
প্যান্ট	বানতালুন	গেঞ্জি	ফানিল্লা
তোয়ালে	ফুতা	রুমাল	মিন্দিল

ভ্রমণ বিষয়ক

ভ্রমণ	সিয়াহা, সফর	কাষ্টম	জুমরুক
বিমানবন্দর	মাতার	মোটর বাস	সাইয়ারা
লাউঞ্জ/কাউন্টার	সালাহ	মোটরগাড়ী	হাফেলা/নাকেলা
অনুসন্ধান	ইস্তিলামাত	ট্যাক্সী	তাকসী
ব্যাংক	মাসরাফ	ড্রাইভার	সাওয়াগ
বিমান	তাইয়ারা	রাস্তা	তরিগ
পাসপোর্ট	জাওয়ায	ওভার ব্রীজ	কুবরী
ভিসা	তাশিরা	টাকার ভাঙ্গানি	তকরীগ

সময় : দিক : দিনের নাম :

পূর্ব	মাশরেক	সোমবার	ইয়াওমুল ইসনাইন
পশ্চিম	মাগরেব	মঙ্গলবার	ইয়াওমুল তালাতা
উত্তর	শিমাল	বুধবার	ইয়াওমুল আরবাআ
দক্ষিণ	জুনুব	বৃহঃ বার	ইয়াওমুল খামীস
এখানে	হিনা	শুক্রবার	ইয়াওমুল জুমআ
ওখানে	হিনাক	শনিবার	ইয়াওমুস সাবত
দূরে	বাঈদ	রবিবার	ইয়াওমুল আহাদ
কাছে	কারিব	দিন	ইয়াওম/নাহার

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
রাত্রি	লাইল	আগামীকাল	বুকরা
গতকল্য	আমছ্‌	মাস	শাহ্‌র
বৎসর	সানা, আম	সপ্তাহ	ওসবু

বিভিন্ন পেশার লোকের নাম সম্পর্কীয়

ঝাড়ুদার	কান্নাস,	কসাই	খাস্‌সাব
চিকিৎসক	তাবিব	কেরানী	কাতিব
বেয়ারা	খাদিম	বিক্রেতা	বায়ীউন
ভিক্ষুক	সায়ীল	মুদী	সাম্মান,
ডাক্তার	দাক্তুর	মুচি	খাস্‌সাক
বাবুর্চি	তাববাখ	পুলিশ	শারতী
সের	কীলু	একসের	ওহেদকিলু।
বাদশা	মালিক	প্রাথমিক চিকিৎসা	ইসআফ
বিচারক	কাযী	হাসপাতাল	মুস্তাশফা
দর্জি	খাইয়াত	ক্লিনিক	মস্তাউসিফ
কর্মচারী	মুআযযফ	ফার্মেসী	সাইদালা
দারোয়ান	বাওয়াব	ঔষধ	দাওয়া
চৌকিদার	হারিছ	বড়ি	হুবুর
শ্রমিক	উম্মাল	ব্যথা	আলাম
ডাক্তার	তবীব	রোগী	মরীদ
নার্স	মুমাররিদা	আরোগ্য	শেফা

সর্বনাম

আমি	আনা	তোমরা (স্ত্রী)	আনতুন্না
আমরা	নেহনা	সে (পুং)	হুয়া
তুমি (পুং)	এনতা	সে (স্ত্রী)	হিয়া
তুমি (স্ত্রী)	এন্‌তি	তাহারা (পুং)	হুম
তোমরা (পুং)	আনতুম	তাহারা (স্ত্রী)	হুন্না
তোমার কাছে	এন্‌দাক	আমার কাছে	ইন্‌দি
আমার থেকে	মিন্নি	আমার	লী

—: সমাপ্ত :—